অন্ধ উদ্ভিদ

শরীফুল হাসান

প্রারম্ভ

আজ অমাবস্যা। ঘোর অন্ধকার চারদিকে। এরমধ্যে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। লোকটা দরজা খুলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে। মাথা ভর্তি চুল, গোঁফটা ঝুলে আছে ঠোঁটের দুই পাশে। তীক্ষ্ণ টানা চোখ, খাড়া নাক। অনেকগুলো লোকের মাঝ থেকেই এই লোকটাকে আলাদা করা চেনা যাবে ওর এই চোখগুলোর কারনে। চোখ দুটোর দৃষ্টি এমন যে মনে হয় মানুষের ভেতরটা দেখে নিচ্ছে।

ছোট একটা ঘর, সামনে অল্প একটু উঠোন। ঘরের চারপাশে গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়। এই অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে সেদিকে তাকিয়ে কিছুই চোখে পড়ল না তার। কিন্তু মন বলছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে। মানসিকভাবে একটা প্রস্তুতি সবসময়ই ছিল, কিন্তু সেই সময়টা এতো দ্রুত চলে আসবে সেটা বুঝতে পারেনি। এই সময়টা খুব অনুকূল নয় তার জন্য, বিশেষ করে ঘরে যখন নবজাতক শিশু আর স্ত্রী ঘুমাচ্ছে।

কোথাও কোন নাড়াচাড়া নেই, বৃষ্টি পড়ার শব্দের বাইরে কোন শব্দ নেই। তবু মনে দারুন অস্বস্তি নিয়ে দরজা লাগিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল সে। হ্যারিকেনের আলো নামানো ছিল, একদম নিভিয়ে দিলো। পুরো ঘরে এখন অন্ধকার। স্ত্রী আর সন্তানকে এই অন্ধকারের মাঝে জাগানোর প্রয়োজনবোধ করল না। খাটের নীচ থেকে একটা ট্রাঙ্ক বের করে আনল। ট্রাঙ্কটা খুলে হাতড়ে একটা খাতা বের করলো। শার্টের পকেটে দেয়াশলাই আছে, একটা কাঠি জ্বালাল। কাঠির আগুনটা ধরল খাতার দিকে। দূরে তখন প্রচন্ড শব্দে বাজ পড়ল।

এতো দুর্বল আগে কখনো লাগেনি। বাজ পড়ার শব্দে হাত থেকে জ্বলন্ত কাঠিটা মেঝেতে পড়ে গিয়ে নিভে গেল। দ্রুত আরেকটা কাঠি জ্বালাল সে, ঘরের ভেতর কোন বাতাস না থাকলেও সেটাও নিভে গেল।

কাঠির আগুনের কাছে খাতাটা আনতেই টের পেল দরজার সামনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। এবার আর দেরি না করে আরো কয়েকটা কাঠি জ্বালাল দ্রুত। খাতাটায় আগুন ধরিয়ে দিল। আগুনে পুড়ছে খাতাটা, খুব খারাপ

লাগছে। কিন্তু কিছু করার নেই। এই জিনিস ওদের হাতে পড়তে দেয়া যাবে না।

দরজার ঠিক বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছে অনুমান করতে সমস্যা হচ্ছে না। বন্ধুত্বের আগে দায়িত্ব। ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। খাতাটা পুড়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল জিনিসটা।

দরজার সামনেই শত্রু দাঁড়িয়ে আছে। যেকোন সময় দরজা ভেঙে ঢুকে পড়তে পারে। এতো সময় নিচ্ছে কেন?

যতো কিছুই হোক, স্ত্রী আর নবজাতককে বিপদে ফেলতে রাজি নয়। স্ত্রী একটু আগেই ঘুমিয়েছে। ওকে ঘুম থেকে উঠাল সে। হাত দিয়ে ইশারা করল। তারপর ঘরের কোণ থেকে বড় একটা লাঠি নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। সন্দেহ নেই দরজা খোলার সাথে সাথে আক্রমন হবে। আক্রমনের জন্য প্রস্তুত।

দরজা খুলেই তৈরি ছিল সে। কিন্তু বাইরে কেউ নেই। চারপাশে তাকাল। অথচ একটু আগেও কেউ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৃষ্টির গতি আরো বেড়েছে। সেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে লম্বা একজন মানুষ উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটার বয়স অনেক, এই বয়সেও গায়ে এবং মনে অনেক জোর। কালো আলখেল্লা পরা এই লোকটাকে চেনে সে। এখানে আসার উদ্দেশ্যেও অজানা নয়।

'আত্মসমর্পণ করো।' বয়স্ক লোকটা বলল। কণ্ঠস্বর বেশ নমনীয়। তবে এই মানুষটার নমনীয়তা কতোটুকু সে সম্পর্কে খুব ভালো ধারনা আছে।

'আপনি আমাকে চেনেন।'

'তুমিও আমাকে চেনো।'

সে প্রস্তুত হলো। যেকোন সময় যেকোন কিছু ঘটতে পারে। গ্রাম থেকে একটু দূরে এইখানে ঘর তুলে থেকে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য ছিল। নিজেকে আড়াল রাখা এবং বিপদের সময় পরিবারকে রক্ষা করা। বোঝাই যাচ্ছে নিজেকে আড়াল করার কাজে সফলতা আসেনি। তবে পরিবারকে রক্ষা করার জন্য যে হিসেব করা আছে সেটা কাজ করবে বলে সে আশাবাদি।

আক্রমনটা সামনে দিক থেকে এলো ভালো হতো। কিন্তু জাদুকর কী সোজা পথে এসব কখনো!

পাশ থেকে আচমকা আঘাতে চমকে গেল সে। এক ধাক্কায় উঠোনে গিয়ে পড়ল। ঘরের একপাশে অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল একজন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে উঠে দাঁড়াল। যে বন্ধুকে আশা করেছিল, সে এখন ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই বন্ধুটিই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে নীচে।

তার মুখে কোন হাসি নেই। রাগ, ক্ষোভ কিছু নেই। পাথরের মতো মুখ করে তাকিয়ে আছে বয়স্ক লোকটার দিকে।

'আমি অবাধ্যতা পছন্দ করিনা,' বয়স্ক লোকটা বলল।

'আমি অবাধ্য নই। আমার কাছে যেটা ভালো মনে হয়েছে সেটা করেছি।'

'তোমার এতো লোভ কেন?'

'লোভ না। আমাদের আবার নতুন করে সব শুরু করতে হবে।'

'তুমি নিজেকে খুব বড় কিছু ভাবো?'

'ভাবি না। আমি আসলে বড় কিছুই। নইলে এই রাত-বিরেতে আপনাদের আসতে হতো না।'

'আমি তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি।'

'আমি সুযোগ চাই না,' বলল সে। হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে দিল বয়স্ক লোকটার দিকে। ছুঁড়ে দেয়া লাঠিটা বর্শার মতো এগিয়ে গেল বয়স্ক লোকটার বুকের দিকে। বয়স হলেও শারীরিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী বয়স্ক লোকটা লাঠিটাকে শূন্যেই ধরে ফেলল।

'তোমাকে আমি সাবধান করেছিলাম, তুমি কথা শোনোনি।'

'আমি কেন শুনবো? আপনি কে?'

'আমি কেউ না। বলতে পারো আমি প্রকৃতির একটা অংশ। প্রকৃতিতে ভারসাম্য দরকার। তুমি ভারসাম্য নষ্ট করেছো।'

বয়স্ক লোকটার কথায় কান দিলো না সে। দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে গলা টিপে ধরল। সর্বশক্তিতে গলা চেপে ধরে আছে। কিন্তু বয়স্ক লোকটার মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বন্ধুর মতো যে মানুষটা সে এগিয়ে আসতে চাইছিল সাহায্য করতে বয়স্ক লোকটা তাকে ওখানেই থেমে যেতে বলল ইশারায়।

বয়স্ক লোকটা গলা থেকে এক ঝটকায় তার হাত সরাল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে বয়স্ক লোকটার দিকে। এই বয়সেও এতো শক্তি ধরে কিভাবে? নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনমতে নিজেকে সামলাল সে।

'আমি ওকে নিতে এসেছি।'

'আপনি জানেন সেটা সম্ভব না।'

'তুমি আমাকে বাঁধা দিতে পারবে না।'

বয়স্ক লোকটা এ কথা বলার সাথে সাথে পেছন থেকে তার সহকারী ঝাঁপিয়ে পড়ল। বন্ধুর সাথে এভাবে লড়াইয়ে নামতে হবে কোনদিন ভাবেনি। কিন্তু বন্ধু যখন শত্রু হয়ে যায় তখন কিছু করার থাকেনা। ওর শক্তি সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আক্রমনকারীর। ওকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে মুখ বরাবর একটা ঘুষি বসাল। এই এক ঘুষিতেই জ্ঞান হারাল। এবার বয়স্ক লোকটার পালা। ওর সাথে হাতাহাতি মারামারিতে পেরে উঠা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। তাই অন্য পথ অবলম্বন করল সে।

দৌড় দিল। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। কাদাময় উঠোন পেরিয়ে বাজারের দিকে যাওয়ার সরু পথে চলে এলো দ্রুত। সে জানে পেছনে কেউ আসছে না। বয়স্ক লোকটা এখন ঘরে ঢুকবে, তার স্ত্রী আর নবজাতককে খুঁজবে। কিন্তু কাউকেও পাবে না। কারন ঐ ঘরের পেছন দিকে একটা গোপন দরজা আছে, সেই দরজা দিয়ে বের হয়ে ওরা এখন বাজারের কাছাকাছি একটা জায়গায় অবস্থান করছে। এভাবেই স্ত্রীকে বলা আছে। বিপদ আসলে কী করতে হবে সে ব্যাপারে আগে থেকেই প্ল্যান করা ছিল। ঐ ঘরে ঢুকে কোনভাবেই সেই গোপন দরজা খুঁজে বের করতে পারবে না কেউ। এমনকি এই বয়স্ক লোকটাও না। সমস্যা হচ্ছে এই বৃষ্টিতে নবজাতক সন্তানকে কোলে নিয়ে খুব দ্রুত চলতে পারবে না তার স্ত্রী। এক্ষেত্রে করণীয় একটাই। বয়স্ক লোকটাকে নিজের দিকে নিয়ে আসা। যাতে ওরা পালানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়।

বৃষ্টিতে ভিজে গেছে পুরো শরীর। পায়ের স্যান্ডেল জোড়া খুলে গেছে। খালি পায়ে ভেজা কাদাময় পথে হাঁটতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছিল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

বড় করে শ্বাস নিলো। তারপর চিৎকার করে উঠল। সে জানে এই চিৎকারের শব্দে বয়স্ক লোকটা দ্বিধায় পড়বে। ঐ ঘর থেকে বের হয়ে তার খোঁজে আসবে।

তাই হলো। এবার বয়স্ক লোকটা একা আসছে না। সাথে আসছে তার সাগরেদও। হয়তো জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। ওদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত সে। কিন্তু সে সুযোগ পেল না। বয়স্ক লোকটার ইশারায় চারপাশের ক্ষেত থেকে উঠে এসেছে অজস্র ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ, শেয়াল এই ধরনের নানা জন্তু। খাদ্য আর খাদকের ব্যবধান ভুলে ওদের সবার হিংস্র দৃষ্টি এখন তার দিকে। একটু নড়লেই আঘাত করবে, শুধু একটা ইশারার অপেক্ষা।

বয়স্ক লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল। বৃষ্টিতে ভিজে লম্বা চুল-দাড়ি সব লেপ্টে আছে চোখে-মুখে। অন্তিম সময়ের অপেক্ষা করতে করতে হাসল সে। জীবন দিতে কোন সমস্যা নেই, নিজের উত্তরাধিকার আর ভালোবাসাকে নিরাপদ রাখতে পেরেছে এটাই শান্তি।

বয়স্ক লোকটা তার হাত দোলাল। চোখ বন্ধ করলো সে। হিংস্র নখ, দাঁতের আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে ভাবল এর প্রতিশোধ সে নেবে। যেভাবেই হোক, নেবে।

অধ্যায় ১

চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। সো সো বাতাসের শব্দ, ঝি ঝি পোকা, ব্যাঙের ডাকের সাথে সারি বেঁধে দাঁড়ানো গাছগুলোর ফিসফিসানি অদ্ভুত এক আলোড়ন তৈরি করেছে চারপাশে। বিশাল বড় এক মাঠের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ানো কিশোর ছেলেটা, তার চোখের দৃষ্টি ঘোলা, অদৃশ্য কোন সম্মোহনে। অনেক অনেক দূর হেঁটে এসেছে এখানে, কেন এসেছে, কিভাবে এসেছে কিছুই জানে না। এই গভীর রাতে চারপাশের প্রকৃতি তাকে ডেকেছে 'আয় আয়' বলে, এই ডাকেই সে চলে এসেছে নাকি অন্য কিছু? মাঠের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন সংবিত ফিরল, ছেলেটা নিজের পা দুটোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। পা দুটো মাটির ভেতর ঢুকে গেছে যেন, সেখান থেকে শেকড় বেরিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরেছে মাটির সাথে। গলা ছেড়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু মনে হচ্ছে গলা চেপে ধরেছে কেউ, পেছন থেকে, শক্ত হাতে। দু'হাতে নিজেকে মুক্ত করার প্রানপন চেষ্টা করছে কিশোর, পারছে না।

চারপাশ অন্ধকার, পূর্নিমা রাতের চাঁদও এই অন্ধকার দূর করতে পারছে না যেন। দূরে, মাঠের প্রান্তে সারি বেঁধে দাঁড়ানো গাছ আর ঝোপঝাড়ে, অদ্ভুত এক নড়াচড়া লক্ষ্য করলো কিশোর, যেন কেউ সেখান থেকে তাকিয়ে আছে তার দিকে, এক দৃষ্টিতে দেখছে।

আমি এখানে কেন, নিজেকেই জিজ্ঞেস করল কিশোর, নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি বলে নিজের হাতে চিমটি কাঁটার চেষ্টা করল। বা হাত তুলে চোখের সামনে ধরতেই চমকে গেল। হাতের বদলে চোখের সামনে দেখতে পেল কাঁকড়ার দাঁড়ের মতো কিছু, ধারালো।

ধীরে ধীরে মাটিতে দেবে যাচ্ছে কিশোর, প্রানপন শক্তিতে চেষ্টা করেও নড়তে পারছে না একচুল। পেছন থেকে কেউ যেন টেনে ধরেছে তাকে, ভয়ে পেছনে তাকানোর সাহস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু দেখে ফেলতে পারে, যা দেখা উচিত হবে না কোনমতেই।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, মনে মনে পরিচিত মানুষগুলোকে মনে করার চেষ্টা করল, কারো চেহারা মনে পড়ছে না। এই পৃথিবীতে সে একা নয়, তার নিশ্চয়ই পরিবার আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে। কিন্তু তাদের কারো চেহারাই মনে পড়ছে না, তার বদলে বিশাল আকৃতির লাল লাল কিছু কাঁকড়ার ছবি ভেসে উঠছে।

এসবই দুঃস্বপ্ন, ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন, নিজেকেই প্রবোধ দিল কিশোর। তবে যতোই সান্ত্বনা দিক, ধীরে ধীরে মাটিতে দেবে যাওয়া থামাতে পারেনি সে। এখন প্রায় কোমর সমান তার মাটির নীচে চলে গেছে।

অনেক দূরে কালো একটা অবয়ব চোখে পড়ল কিশোরের, লম্বা, শীর্নকায় একজন মানুষের মতো। সার বেঁধে দাঁড়ানো গাছপালা আর ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে মানুষটা খুব ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। পরনে কালো আলখেল্লা, সে আলখেল্লা বাতাসে উড়ছে। চারপাশে থেকে বোবা ভাষায় পুরো প্রকৃতি যেন আর্তনাদ করে উঠছে বারবার, আতংকে অস্থির হয়ে আছে কিশোর। মাথার পেছনের চুল সব দাঁড়িয়ে গেছে সরসর করে।

লোকটা যেন হাঁটছে না, মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে আসছে। হাতে লম্বা কালো একটা লাঠি। চোখ বন্ধ করলো কিশোর, এসবই দুঃস্বপ্ন, সে এখন শুয়ে আছে তার বিছানায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছে। ভালো কিছু ভাবার চেষ্টা করল, সুখকর কোন কিছু, কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই মাথায় আসছে না।

কতোক্ষণ চোখ বন্ধ করে রেখেছে মনে নেই, সময় এখানে থমকে গেছে, আশপাশে কোন শব্দ নেই, বাতাসও চুপ মেরে আছে অজানা কোন ভয়ে। ধীরে ধীরে চোখ খুলল কিশোর।

বুক থেকে বেরিয়ে আসা চিৎকার বেরুনোর সুযোগ পেল না, তার মুখের সামনেই ঈষত লম্বাটে চেহারার একজন বয়স্ক মানুষ তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয়ংকর ব্যাপার হলো, লোকটার অক্ষিকোটরে কোন চোখ নেই, তার বদলে দুটো কালো সাপ লিকলিক করছে। লম্বা নাকের নীচে বাঁকানো ঠোঁট দুটো ফাঁক করার জিভ দেখা যাচ্ছে না, বরং ভেতরটা মনে হচ্ছে কালো অন্ধকার এক গহ্বর।

বাক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে কিশোর। নিশ্বাস থমকে গেছে, এক দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছে ভয়ংকর চেহারাটার দিকে। লোকটার গা থেকে যে অদ্ভুত বোটকা গন্ধ বের হচ্ছে তাতে শ্বাস নেয়া কঠিন।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এভাবে মুখোমুখি থাকার পর সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা. কালো আলখেল্লাটা এবার বেগুনি রঙ ধারন করেছে, চারপাশে ঘুরল কয়েকবার।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় অদ্ভুত কিছু শব্দ উচ্চারণ করল লোকটা. হাতের লম্বা কালো লাঠিটা তাক করল কিশোরের মাথা বরাবর।

চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার নেই কিশোরের। লাঠিটা শক্ত, বেশ মোটা, মাথায় গিল্টি করা একটা সাপের ব্যাদান করা মুখ, দু'পাশে শদন্ত বেরিয়ে এসেছে। এই লাঠিটা কিছুক্ষনের মধ্যেই তার মাথায় নেমে আসতে যাচ্ছে। নিশ্চিত মৃত্যুকে সামনে রেখে হঠাৎ করেই বুকটা খালি খালি অনুভব করছে কিশোর। ভয় লাগছে না একটুও, বরং মনে হচ্ছে, যা হবার ভালোর জন্যই হবে।

এই ক্রুর, অস্থির পৃথিবীতে প্রানপন যুদ্ধ করে টিকে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। তাতে একবারই যন্ত্রনা হবে, তিলে তিলে প্রতিদিন মরে যাওয়ার চেয়ে সেটা অনেক ভালো।

পূর্নিমা রাতের আকাশ মুহূর্তেই কালো মেঘে ঢেকে গেছে, বাজ পড়েছে কাছাকাছি কোথাও, বিদ্যুৎ চমকের সামান্য ঐ আলোয় আলখেল্লাধারি বয়স্ক লোকটাকে একনজর দেখার চেষ্টা করল কিশোর। না, এই লোকটাকে আগে কখনো দেখেনি সে। এই মানুষের মতো মানুষও তার চোখে পড়েনি, তার মতো অল্পবয়স্ক এক কিশোরের ওপর এমন কী আক্রোশ লোকটার কে জানে।

মাথার ওপর লম্বা লাঠিটা এখনো তাক করা আছে, চোখ বুজে অন্তিম সময়ের অপেক্ষা করছে কিশোর।

দূরে কোথাও বিকট শব্দে বিদ্যুৎ চমকালো। সর্বশক্তিতে মাথার ওপর লাঠি চালাল লোকটা।

ঘুম ভাঙলে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলো কিশোর। বুঝতে পারছে এতোক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখছিল। ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেছে। পরনের গেঞ্জিটা ভিজে লেপ্টে আছে শরীরের সাথে। উঠে পানি খাবে না ঘুমানোর চেষ্টা করবে বুঝতে পারছিল না। এই ঘরটাতে সে একাই ঘুমায়। সবচেয়ে

কোণার দিকের এই ঘরটায় আসবাব বলতে একটা চৌকি আর ছোট একটা কাঠের আলমারী।

এরবেশি কোন কিছুর প্রয়োজনই নেই কিশোরের। সে এই বাড়ির আশ্রিত। মামা বাড়ি হলেও অনাথ একজন কিশোরকে কেই বা বিনা কাজে রাখবে। এই বাড়িতে সে থাকে, সারাদিন মাঠে কাজ করে, কিংবা গরু চড়ায়। সন্ধ্যায় গরুগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরে কিছু একটা খেয়ে এই ঘরে চলে আসে।

মামা আব্দুর রউফ চুপচাপ ধার্মিক মানুষ। কথা কম বলেন। তবে মামী মুখরা। সন্ধ্যার পর এই ঘর থেকে তার বেরুনো নিষেধ। মামাতো বোনগুলো কাছাকাছি বয়সের। ওদের ধারে-কাছে যেন যেতে না পারে সেজন্য এ ব্যবস্থা। সে সব বুঝতে পারে। মেয়েদের প্রতি তার আলাদা কোন আকর্ষণ নেই। শুধু মামাতো বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে, পরী, ওর সাথে কথা বলতে ভালো লাগে। এই ভালো লাগাকে আড়াল করতে মেয়েটার সাথে কথা বলার সময় মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলে। এতে পরী তাকে ভীতু ভাবে। খোঁচায়। তবে ঝামেলা এড়ানোর জন্য এসব খোঁচাকে পাত্তা দেয় না।

পরীর কথা ভাবতেই মনটা ভালো হয়ে গেল। সে পড়াশোনা করেছিল ক্লাস ফোর পর্যন্ত। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর আর পড়াশোনা হয়নি। মামা এখানকার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু টানাটানির সংসারে বাড়তি খরচের ঝামেলায় যেতে দেয়নি মামী। কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।

এখানে কাজ করে খুব যে কষ্ট তা না। কিন্তু বারবার বাবা আর মা'র কথা মনে পড়ে। মনে পড়লেই চোখে পানি চলে আসে। এতো আদর-ভালোবাসা আর কোনদিন পাওয়া যাবে না। এই পৃথিবীতে তার কেউ নেই।

গলা শুকিয়ে কাঠ। বিছানা ছেড়ে উঠলো কিশোর। জানালাটা খোলা। সেই খোলা জানালা দিয়ে বাইরের উঠোনটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় উঠোনটা ঝকঝক করছে। কিশোর পরিস্কার দেখতে পেল উঠোনের মাঝখানে একটা মেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। মেয়েটার মুখ সাদা উড়নায় ঢাকা। জানালার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর।

মেয়েটা কে?

নাচতে নাচতে মেয়েটা একবার পূব দিকের ঘরগুলোর দিকে যাচ্ছে,

আরেকবার পশ্চিমদিকে। মেয়েটার চেহারা দেখার জন্য মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। আবার ভেতর থেকে কে যেন বলছে বাইরে না যেতে। সেখানে অনেক বড় বিপদ।

বিপদটা কিসের বুঝতে পারছে না কিশোর। কিন্তু হাত-পা ঠিক সাড়া দিচ্ছে না। মনে হচ্ছে জানালার পাশে সে স্থির হয়ে গেছে। মেয়েটা নিজের মনে ঘন্টার পর ঘন্টা নেচে যাচ্ছে আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে সে। এই মেয়ে কে? এখানে কী চায়?

কিশোর দেখল অনেকক্ষণ পর নাচ থামিয়ে মেয়েটা এগিয়ে আসছে ঘরের দিকে। সাদা উড়নায় মুখ ঢাকা থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না মেয়েটা তাকিয়ে আছে তার দিকে। হঠাৎ দমকা বাতাসে উড়নাটা উড়ে গেল।

পরম বিস্ময়ে কিশোর দেখল মেয়েটা আর কেউ না, পরী। পরীবানু! তার তিন মামাতো বোনের মধ্যে ছোটজন। কিন্তু ওকে আজ এমন দেখাচ্ছে কেন? অন্য সময় তো ওকে এতো সুন্দর লাগে না। গায়ের রঙ অতিরিক্ত সাদা, চোখে কালো কাজল। ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক। মেয়েটা এতো সুন্দর নাচতে পারে সেটাও জানা ছিল না। কী অদ্ভুত! রাত-বিরেতে পরী এভাবেই নাচবেই বা কেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো কিশোর। পরী আসছে ধীর পায়ে। তার পেছনে কালো একটা ছায়াও আসছে। ছায়াটা দেখে আতংকে দম আটকে এলো কিশোরের। স্বপ্নে দেখা কালো আলখেল্লা পড়া সেই লোকটা। হাতে বড় একটা লাঠি।

পরীকে বাঁচাতে হবে। আর কিছু মাথায় নেই কিশোরের। কোনমতে দরজা খুলে ঘর থেকে বের হলো।

বাইরে পা দিয়েই দেখল ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলো মুহূর্তেই মিলিয়ে গেছে নিকষ অন্ধকারে। চারপাশ থেকে অনেক কণ্ঠ ডেকে বলছে 'আয় আয়'। হাত ধরে কে যেন টান দিয়ে নিয়ে গেল আরো গভীর অন্ধকারে।

অধ্যায় ২

ভোরে নামাজ পড়তে পাশের মসজিদে যান আব্দুর রউফ। আজকেও বের হয়েছেন। আলো ফোটেনি সেভাবে। ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া ভালো লাগে, যদিও আজ বাতাস থমকে আছে যেন। উঠোন পার হয়ে ডানদিকে পুকুরটা রেখে সোজা পথ ধরে গেলেই মসজিদ। ফজরের ওয়াক্তে লোক কম হয়। মাত্র চার-পাঁচজন। সবাই এলাকায় বয়স্ক ধার্মিক ব্যক্তি।

তিনি হাঁটছিলেন আর মনে মনে সুরা ফাতিহা পাঠ করছিলেন। কেন জানি বুকের মধ্যে চাপা একটা ভয় কাজ করছিল। এরকম কখনো হয় না। মনে হচ্ছে পেছন পেছন কেউ আসছে। পা টিপে টিপে। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে গিয়েও তাকালেন না। হুজুর নিষেধ করেছিলেন। কখনো এরকম কিছু মনে হলে যেন পেছন ফিরে না তাকায়। এবার তিনি জোরে জোরে আয়াতুল কুরসী পড়া শুরু করলেন। অল্প পথটুকু হাঁটতে গিয়েই টপটপ করে ঘাম ঝরছিল কপাল থেকে। সামনেই মসজিদ দেখে হাঁপ ছাড়লেন। আর দুমিনিটেই পৌঁছে যাবেন মসজিদের নিরাপদ আশ্রয়ে। সূর্য উঠি উঠি করছে। ভয়ের কিছু নেই।

তবে আর কয়েকটা পা দিতেই তিনি অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখলেন। মসজিদের ডানদিকে যে ঘনঝোপটা তার পেছন থেকেই কেউ একজন উঁকি দিচ্ছে। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনে যাবেন না পেছনে, বুঝতে পারছেন না। উঁকি দেয়া মানুষটা ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। চার হাতপায়ে। জিভ বের করে আছে অনেকটা কুকুরের মতো। আধো অন্ধকারেও সাদা দাঁতগুলো পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। চার হাত পায়েই দ্রুত গতিতে আসতে শুরু করেছে তার দিকে। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শরীরের সব শক্তি কেউ যেন শুষে নিয়েছে। চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করছেন মারাত্মক কোন পরিণতির। তিনি জানতেন, ছেলেটাকে নিয়ে সমস্যা আছে। কিন্তু এমন কিছু হবে তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। ভেবেছিলেন, বাবা-মা হারা ছেলেটা থাকুক তার কাছে। কিন্তু ভাবনায় ভুল ছিল। সবাই নিষেধ

করেছিল, তিনি শোনেননি। বলেছিল, এই ছেলে অভিশাপগ্রস্ত। তিনি পাত্তা দেননি। এখন বোঝা যাচ্ছে, সবাই ঠিক কথাই বলেছিল।

তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এখনো। বড় করে একটা নিশ্বাস নিলেন।

***

গ্রামের সব লোক জমা হয়েছে আব্দুর রউফের বাসার উঠোনে। অনেকদিন পর চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটেছে। ঠিক মাঝখানে একটা খাটিয়ায় আব্দুর রউফকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার চারপাশ ঘিরে আছে এলাকার সব মানুষজন। বাসার মেয়েরা সব বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে আব্দুর রউফের তিন মেয়ে আর স্ত্রীর কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মেয়েদের কাউকে কাছে আসতে দেয়া হচ্ছে না।

মসজিদের হুজুর সাহেব, রহমত আলী, একমনে বসে সুরা পড়ে ফুঁ দিচ্ছেন আব্দুর রউফের বুকের ওপর। উপস্থিত সকলের মধ্যে ফিসফাস চলছে। উঠোনের এক কোণায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে কিশোর সালামকে। তাকে দেখতেও জড়ো হয়েছে কিছু লোকজন। ধুলো কাদাময় সালাম চুপচাপ বসে আছে। কী হচ্ছে কেন হচ্ছে সম্ভবত এসব কিছুই বুঝতে পারছে না। চোখের দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে সে এখন ঠিক তার নিজের মধ্যে নেই। ঘোর লাগা দৃষ্টিতে উপস্থিত মানুষজনের দিকে তাকাচ্ছে।

হুজুর আরো অনেকক্ষণ ধরে সুরা পড়লেন, পড়া পানি ছিটালেন আব্দুর রউফের ওপর। আরো অনেকক্ষণ পর যখন হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলেন, চোখ খুললেন আব্দুর রউফ। অস্ফুট কণ্ঠে কিছু বললেন। দ্রুত এক গ্লাস পানি খাওয়ানো হলো তাকে।

হুজুর রহমত আলী এলাকায় আছেন প্রায় ত্রিশ বছর হলো। সবাই তাকে খুব মান্য করে। পানি পড়া থেকে শুরু করে যাবতীয় ধর্মীয় কাজে আমডাঙ্গা গ্রামে তিনিই ভরসা। গোলাকার মুখমন্ডল হুজুরের, বুক পর্যন্ত শ্বেতশুভ্র দাঁড়ি। কথায় কথায় আরবি বলেন। এরকম লোকের ওপর ভরসা করাই যায়।

'মন দিয়া শোনেন,' উঁচু গলায় বললেন রহমত আলী, 'এই পোলার ওপর জ্বিনের আছর আছে।'

'জ্বিনের আছর' কথাটা শোনার পরই সালামকে ঘিরে থাকা লোকজন একটু দূরে সরে গেল। উঠোনের বাকি লোকজনের মধ্যে ফিসফাস শুরু হলো।

'আমি রউফ সাহেবের বাড়ি বন্ধন দিয়া যাচ্ছি,' রহমত আলী বললেন,'আর এই পোলারে ঐ ঘরে আটকা রাখতে হইবো। যতোদিন ঐ জ্বিনের আছর না যায়।'

'আমি সকালে কী দেখছিলাম?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করলেন আব্দুর রউফ।

'ভোরবেলা ওর ওপর ভর করছিল। এখনো ভর কইরা আছে,' রহমত আলী বললেন, 'তবে চিন্তার কিছু নাই। জ্বিন কেমন তাড়াইতে হয় আমি জানি।'

উপস্থিত জনগনের মধ্যে স্বস্তি দেখা গেল।

'আপনারা যারা আসছেন, তারা জায়গা খালি করেন। নাইলে আপনাদের ক্ষতি হইতে পারে।'

রহমত আলীর এই ঘোষণায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপস্থিত জনগন এক এক করে চলে যেতে থাকলো। সবাই যখন চলে গেল উঠোনে শুধু রহমত আলী রইলো আব্দুর রউফের সাথে। বাড়ির মেয়েরা বারান্দায় দাঁড়ানো। কান্না থেমেছে তাদের।

'সত্যিই জ্বিনে ধরছে ওরে?' জিজ্ঞেস করলেন আব্দুর রউফ।

'হ। তা ধরছে। ভোর বেলা ওজু করতে গিয়া দেখি সে দাঁত মুখ খিচ্যা আপনের দিকে দৌড় দিতাছে। তাও কুত্তার মতো কইরা। আমি না ঠেকাইলে খবর ছিল।'

দৃশ্যটা মনে পড়তেই কেঁপে উঠলেন আব্দুর রউফ। সত্যিই সে সময় রহমত আলী হুজুর উপস্থিত না হলে কী যে হতো! তিনি তো ওর ওভাবে দৌড়ে আসা দেখেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রায়।

'এখন করনীয় কী?'

'ওর বাপে কী করতো, আপনে কোনদিন এই জিনিসটা আমারে ভাইঙ্গা বলেন নাই।'

'ওর বাপ সুবিধার লোক ছিল না। এই অঞ্চলে আসছিল জাদু দেখাইতে। কেমনে কেমনে আমার বইনরে বশ কইরা নিয়া পলায়া যায়। তারপর কতো বছর কোন যোগাযোগ নাই। আমি তো ভাবছিলাম বইন

মইরা গেছে। কিন্তু..'

'কিন্তু কী?'

'থাক।'

'ওর বাপে জাদুকর ছিল? কেমন জাদুকর?'

'আমি নিজে জাদু দেখি নাই। কিন্তু শুনছিলাম খুব মারাত্মক জাদু দেখাইতো।'

'কি রকম?'

'তাসের জাদু দেখাইতো, তারপর মানুষরে দুইভাগ কইরা আবার জোড়া লাগাইতো।'

'এইগুলা তো সব জাদুকরই দেখায়।'

'কিন্তু সে আরো কিছু বিশেষ জাদু দেখাইতো।'

'কিরকম?'

'যেমন আপনাআপনি নাকি বাতাসে ভাসতো। তারপর ধরেন, চেহারা বদলাইতে পারতো চোখের নিমিষে।'

'বলেন কী? এইসব তো সাধারন কিছু না। কুফুরিবিদ্যা।'

'তাই তো তারে কোনদিন আপন বইলা মানি নাই। সে নাকি কামরুপ কামাখ্যা থাইকা এসব শিখছিল।'

'মুসলমানের পোলার এইসব কী কাজ কারকারবার! আস্তাগফিরুল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ।'

'এজন্যই তো তারে মানি নাই। বইনরেও স্বীকার করি নাই। শেষে এই লোক মারা যাওয়ার পর বইন আইসা উঠল বাড়িতে। সাথে সালাম। ওর বয়স তখন এক না দুই বছর। ওর যখন তিন-চার বছর বয়স তখন বইনও মারা গেল। ও সারাক্ষণ ডরাইতো, কইতো কে জানি ওরে মারতে আসবে।'

'বইন জামাই কেমনে মরছিল?'

'সেইটা বইন কোনদিন বলে নাই। শুধু কইছে মইরা গেছে।'

'সালাম এরপর থেইকাই তো এইখানে মানুষ, তাই না?'

'হ, অরে আর কই পাঠামু। আত্মীয়স্বজন বলতে তো আমিই আছি।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন আব্দুর রউফ। এক ফাঁকে তাকালেন সালামের দিকে। ছেলেটাকে দেখে মায়া লাগলো। দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। খুব অসহায় দেখাচ্ছে।

'চিন্তার কিছু নাই,' রহমত আলী বললেন। 'ওর উপরে আছর আছে এই আছর ছাড়াইতে হইবো।'

'আপনি পারবেন?'

হুজুর হাসলেন।

'এইটা আমার কাম না, তবু করুম,' বললেন তিনি। 'বাকি সব আল্লাহ মালিকের হাতে।'

পুরো বাড়ি বন্ধক দিয়ে দুপুরের দিকে খাওয়া দাওয়া করে রহমত আলী হুজুর চলে গেলেন। সালামকে তার ঘরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। দরজায় বড় তালা ঝোলানো হয়েছে যাতে বের হতে না পারে। শান্ত ছেলের মতো চুপচাপ ঘরে ঢুকে বসে আছে সালাম।

আব্দুর রউফ উঠোনে বসে আছেন। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ। মারা যাওয়ার আগে বোন কিছু কথা বলেছিল, অস্পষ্ট সেসব কথা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, পনেরো বছর পার হওয়ার পর থেকেই সালামের সামনে মহা বিপদ। সেই বিপদটা কেমন হতে পারে, তার একটা নমুনা চাক্ষুষ করেছেন। রহমত আলী হুজুরের ওপর তার বিশ্বাস আছে। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, দরজায় বড় তালা লাগিয়ে সালামকে সামলানো যাবে না। সত্যিই যদি ঝামেলার কোন ব্যাপার থাকে, তাহলে তালা দিয়ে ওকে আটকানো যাবে না। কিন্তু বিকল্প কিছু মাথায় আসছে না।

বাড়িতে যে লোকগুলো কামলা খাটে, ওদের মধ্যে নজরুল আর জামালকে আজ এই বাড়িতেই থাকতে বলেছেন। পাহারায়। ওরা দুজনই বিশ্বস্ত। তার সব কাজে লাগে। গ্রামে-গঞ্জে মারামারি, কাটাকাটি লেগে থাকে। জামাল আর নজরুল তার লোক হওয়ায় কেউ ঝামেলা করার সাহস পায় না।

এশার নামাজ মসজিদ থেকে পড়ে এসে আবার উঠোনে বসেছেন আব্দুর রউফ। মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়া বারন। তিনি হুক্কা টানলেন কিছুক্ষণ। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মৃত বোনের চেহারাটা বার বার চোখের সামনে ভাসছিল। সালামের প্রতি তার মায়ার কারন একটাই। বোনের চেহারার সাথে খুব মিল ছেলেটার।

সন্ধ্যার পরপর নজরুল আর জামাল দুজন এসেছে। ওদেরকে সালামের ঘরের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। দুজনের হাতেই মোটা লাঠি। সাথে

হ্যারিকেন, কয়েক প্যাকেট বিড়ি। জামাল লুকিয়ে গঞ্জ থেকে এক বোতল মদও নিয়ে এসেছে, তিনি জানেন। পুরো একটা রাত কাটাতে ওদের কাজে লাগবে। তিনি বাঁধা দিলেন না। এগারোটার দিকে ঘুম পাওয়ায় ঘরে ঢুকে গেলেন।

সারারাত চমৎকার ঘুমালেন। এমনকি ফজরের ওয়াক্তেও তার ঘুম ভাঙল না। ভোরের আলো যখন ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে, তিনি ধরমড় করে উঠে বসলেন বিছানায়। তাকিয়ে দেখলেন, স্ত্রী আর মেয়েরা কেউ নেই ঘরে। দরজা হাট করে খোলা। চারপাশ দারুন নীরব। মনে হচ্ছে এই ঘরের বাইরের পৃথিবীতে কেউ নেই।

তিনি শঙ্কিত পায়ে দরজার বাইরে পা রাখলেন।

তিন মেয়ে আর ওদের মা উঠোনে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দৃষ্টি সালামের ঘরের দিকে। তিনিও তাকালেন।

নজরুল আর জামাল, দুজনেই পড়ে আছে বারান্দার একপাশে। নজরুলের মাথাটা দেখে মনে হচ্ছে, কেউ দুমড়ে মুচড়ে বাঁকিয়ে রেখেছে। চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। ওর পাশে জামালের দেহটার দুটো হাত নেই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে উঠোনের ঐপাশটা। জমাট রক্তে একপাদা মাছি এসে ভিড় জমিয়েছে।

দৃশ্যটা দেখে আব্দুর রউফের মাথায় একটা কথাই ঘুরছিল, সালাম কোথায়?

সালাম তখন অনেক দূরে। দৌড়ে যাচ্ছে। এই গ্রাম, এখানকার মানুষজন, এই পরিবেশ, সব ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে। এমন কোথাও, যেখানে অতীত তার পিছু নেবে না। নতুন করে শুরু করা যাবে সব কিছু।

উনিশশো নব্বই সালের শুরুর দিকে সালামের বয়স প্রায় পনেরো। তখনও সবকিছুতে প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। মানুষের জীবন-যাপন তখনও অনেক সহজ। রাজনীতিতে যদিও গনতন্ত্র বলে তখনো কিছু আসেনি। তবে দেশের মানুষ আশাবাদী, পরিবর্তন আসবে।

সামনে পনেরোয় পা দেবে সালাম। এই বয়সটা ওর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ন অধ্যায়। সেটা সে নিজেই জানে না।

অধ্যায় ৩

কমলাপুর রেলস্টেশনে নেমে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরলো সালাম। খুব খিদে পেয়েছে। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। কারো কাছে হাত পেতে কিছু চাইবে সেটা চিন্তাও করা যায় না। হাঁটতে থাকল।

হাঁটতে হাঁটতে কতোদূর গেল জানে না সালাম। আশপাশের সাইনবোর্ডগুলো পড়ল। তাতে বোঝা যাচ্ছে সে এখনো মতিঝিল এলাকায় আছে। মতিঝিলে শাপলা চত্বরের নাম বইয়ে পড়েছে, ছবি দেখেছে। সেটা কোথায়? দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল।

দুপুর নাগাদ এদিক-সেদিক এলোপাথারি হাঁটল। তারপর সূর্য যখন মাথার উপরে, তখন শাপলা চত্বরের সামনে এসে দাঁড়াল। বইতে যেমন দেখেছে তেমনই। একটানা হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেছে। এতোক্ষণ ক্ষুধার কথা ভুলে থাকলেও এখন আবার বেশ জানান দিচ্ছে। মামা বাড়িতে আর যাই হোক, খাবারের কোন অভাব ছিল না। তিন-চারবেলা শুধু ভাত আর ভাত, সাথে যথেষ্ট পরিমানে ডাল আর মাছ।

শাপলা চত্বরের পানিতে মুখ ধুয়ে নিলো। চারপাশে কোন ছায়া নেই, খিদে সামাল দিতে কী করা উচিত কোন ধারনা নেই। এ সময় একটা লোক এসে দাঁড়াল সামনে। লোকটার চোয়াড়ে চেহারে, হাতে একটা সিগারেট। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সুবিধার কেউ না।

'তুই কে রে? এইখানে কি করস?'

'আমার নাম সালাম। ঢাকায় আসছি আজকে।'

'বাড়ি থাইকা পলাইছোস? পলাইয়া এই ঢাকাতেই আসতে হইবো?'

'কেন আসলে কি সমস্যা? শুনছি এই শহরে নাকি টাকা উড়ে?'

'কথা সত্য। কিন্তু সেই টেকা ধরতে জানতে হয়, বুঝলি।'

'আপনে ধরতে পারছেন?'

'মাঝে মইধ্যে পারি। আয় আমার লগে।'

লোকটার নাম জানা হয়নি। দেখেও খুব সুবিধার মনে হচ্ছে না। তবু

এগিয়ে গেল সালাম। লোকটা একটু বাঁকা হয়ে হাঁটে। পরনের প্যান্টটা শক্ত হয়ে আঁকড়ে আছে দুইপায়ের সাথে, শার্টটার রক্ত অতিরিক্ত হলুদ। লোকটার কোঁকড়া চুলগুলো ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, মাঝখান দিয়ে সিঁথি করা। গালের কাছে কাঁটা দাগ। সবমিলিয়ে ভয়াবহ অবস্থা।

'আগে চল, দুইজনে কিছু খাই,' লোকটা প্রস্তাব দিলো।

এই প্রস্তাবে আপত্তি জানানোর প্রশ্নই উঠে না এবং এই প্রথমবারের মতো ভয়াবহ চেহারার এই লোকটাকে ভালো লাগতে লাগল সালামের।

দুজনে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল। গরম ভাত, কাঁচা মরিচ, ডাল আর রুই মাছ, এই হচ্ছে মেনু। ভরপেট খেয়ে সালামের মনে হলো, সে ঠিক জায়গায়ই এসেছে আর এই লোকটা হচ্ছে সাক্ষাৎ দেবদূত।

'আমার নাম মিলন, লোকে আদর কইরা মগা মিলন ডাকে,' ভাত খাওয়া শেষে সিগারেটে টান দিতে দিতে বলল লোকটা। 'কিন্তু তুই আমারে গুরু কইবি, ঠিক আছে?'

সালাম মাথা নাড়ল। ভরপেট খেয়ে সে এখন মিলন নামের লোকটার মহা ভক্ত।

'চল, খাওয়া-দাওয়া হইছে, এখন টেকা ধরার কাম করি,' বলল মিলন ওরফে মগা মিলন।

দুজনে রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল।

'তুই কিছু করবি না, খালি আমারে দেখবি, আমি কী করি,' মিলন বলল, তারপর এগিয়ে গেল সামনে।

সালাম পিছু নিলো। দেখল মিলন শুধু পথচলতি মানুষজনের গা ঘেষে চলছে, ব্যস্ত মানুষগুলোর কারো কারো সাথে ধাক্কা লাগছে। কেউ খেয়াল করছে, কেউ করছে না। এরমধ্যেই সালাম দেখল মিলনের টাকা ধরার কাজ। কমপক্ষে তিনজনের প্যান্টের পেছন থেকে মানিব্যাগ নিজের পকেটে চালান করে দিয়েছে অবিশ্বাস্য দক্ষতায়। সালামকে একবার হাত ইশারায় ডাকল কাছে।

'তুই পেছন পেছন থাক। আর এই দুইটা তোর কাছে রাখ,' দুটো পেটকোলা মানিব্যাগ সালামের হাতে দিল মিলন। মানিব্যাগগুলো খুলে দেখতে ইচ্ছে করছিল সালামের। কিন্তু সামলাল নিজেকে।

'এগুলার ভিতরে টেকা নাই, টেকা আমার পকেটে,' মিলন বলল।

'আপনে মাইনষের টেকা চুরি করেন?'

'ঐ টেকা তোর আমার আমার টেকা। বুঝলি? টেকা যার পকেটে থাকে তার। এই পকেট বদলানির কাজটা আমার।'

মানিব্যাগগুলো ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করছিল সালামের। কিন্তু এরমধ্যেই একটা জিনিস চোখে পড়ল। দূর থেকে কিছু লোক এগিয়ে আসছে মিলনের দিকে। মিলনের পেছন দিক থেকে আসছে বলে মিলন সেটা খেয়াল করেনি। কিন্তু সালাম বুঝল, মিলনের কাজ ধরা পড়ে গেছে। এখন দ্রুত পালাতে হবে। মানিব্যাগগুলো মিলনের হাতে দিয়ে দিল দ্রুত।

'পলান!' বলেই দৌড় দিল সালাম।

পালানোর সুযোগ মিলন পেলো না। এরমধ্যেই লোকগুলো এসে ধরে ফেলল মিলনকে। পেছনে তাকিয়ে সালাম দেখল বেদম পিটুনি শুরু হয়ে গেছে। মিলন কোনরকমে মার ঠেকাতে ব্যস্ত। উত্তেজিত লোকজনের মধ্যে কেউ একজন লক্ষ্য করল তাকে। 'ঐ যে আরেকটা পলায়!'

এ কথা শুনে সালামের গলা শুকিয়ে এলো। ঐলোকগুলো তাকে ধরতে পারলে পিটিয়ে শেষ করে দেবে। আর যাই হোক, বিনা কারনে মার খেতে রাজি নয় সালাম। তাই দৌড়ের গতি বাড়াল। মাঝে মাঝে পেছনে তাকাচ্ছে। কেউ পিছু নিয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সামনে বেশ বড়সড় একটা জটলা দেখে এগিয়ে গেল। ভিড় ঠেলে মাঝখানের দিকে ঢুকে পড়ল। লোকজনের মাঝে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। দু'একবার তাকাল পেছনের দিকে। কেউ পিছু নেয়নি মনে হচ্ছে কিংবা নিলেও এই জটলার মধ্যে তাকে খুঁজে বের করতে পারবে না। মগা মিলনের কী হয়েছে জানার ইচ্ছে নেই। ভাগ্য ভালো আজ লোকগুলোর হাতে পড়েনি। পড়লে ঢাকায় পা রাখার দিনই তাকে হাসপাতালে থাকতে হতো, অথবা জেলখানায়।

এতোগুলো লোক এখানে জটলা কেন করেছে সেটা এতোক্ষণ খেয়াল করেনি সালাম। এবার চোখে পড়লো লোকটাকে। চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষজনের মাঝখানের বৃত্তাকার ফাঁকা জায়গাটায় ঢ্যাঙা, শুকনো, চোয়াল ভাঙা কিছুটা কুঁজো একজন মানুষ ক্রমাগত কথা বলেই যাচ্ছে। হাতে একতাড়া তাস। সেই তাস নিয়ে নানারকম কসরত করছে। একেকবার একেকজনকে দিয়ে তাস উঠাচ্ছে। সেটা না দেখেই বলে দিচ্ছে কোন তাসটা উঠানো হয়েছিল। এসব হাত সাফাইয়ের পাশাপাশি দড়ির গিট নিয়ে

দু'একটা খেলা দেখালো। দর্শকরা মাঝে মাঝে হাততালি দিচ্ছে। তবে হাততালিতে লোকটার মন ভরছে না। সবাইকে বলছে যে যা পারে যেন দেয়। তার সে কথায় দর্শকদের মাঝে খুব একটা সাড়া পড়ছে বলে মনে হচ্ছে না।

সালাম হাত সাফাইয়ের কাজ দেখছিল। ভাবছিল, চোখের পলকে কিভাবে লোকটা সব বলে দিচ্ছে। কি চমৎকার জাদু। মাঝে মাঝে তাস শুন্যে ভাসাচ্ছিল লোকটা আর চোখ বড় করে দেখছিল সালাম। কাউকে হাত মুঠো করে থাকতে বলে তার কানের পাশ থেকে পয়সা বের করে আনছে। কি অদ্ভুত। মুখ থেকে বের করে আনছে লম্বা রুমাল। কিভাবে সম্ভব! নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না সালাম। পকেটে টাকা থাকলে না খেয়ে হলেও লোকটাকে কিছু টাকা দিতো। কিন্তু সে উপায় তো নেই। বরং এর মধ্যে খিদেটা আরো বেশি জানান দিচ্ছে। আরো প্রায় আধঘন্টা এরকম টুকটাক হাত সাফাই দেখানোর পর আজকের মতো কথা বলা শেষ করলো লোকটা। দর্শকরা চলে যাওয়ার সময় সামনের ছোট জায়গাটায় যে যার মতো টাকা-পয়সা ছুঁড়ে দিলো। লোকটা সেগুলো কুড়োতে কুড়োতে সালামের দিকে তাকাল।

সালামের মনে হচ্ছিল, লোকটা তার ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। হাত ইশারায় তাকে কাছে ডাকল লোকটা।

'তুই কে রে?'

'আমি সালাম।'

'বাড়ি কই?'

'বাড়ি নাই।'

হাসলো এবার লোকটা। 'সবার বাড়ি আছে। এই যে আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি, আমারও বাড়ি আছে। তোরও আছে। কিন্তু তুই কইতে চাস না।'

'হ।'

'আমার লগে থাকবি?'

'আপনে কী করেন?'

'আমার নাম জমির ম্যাজিশিয়ান। এই বাংলাদেশে আমি এক নাম্বার। বুঝলি?'

'হ।'

'ওড। ত্রিশ টাকা জমছে এখন। এই টাকা দিয়া দুইজনের দুপুরের খাওয়া হইয়া যাইবো।'

সালাম কিছু বলল না। দুপুরে তার ভরপেট খাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর পর বেশ ভালো রকম দৌড়ানো হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে আরেকবার খেতে বসলেও সে বেশ খেতে পারবে। জমির ম্যাজিশিয়ানকে দুপুরের খাবার জোগাড় হয়েছে বলে সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে।

'আর আমারে তুই ম্যাজিশিয়ান কইয়া ডাকবি। ওস্তাদ ফুস্তাদ না, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

জমির ম্যাজিশিয়ানের সাথে পথ চলার শুরু এখানেই। সারাদিন পথে পথে জাদু দেখিয়ে বেড়ানো শুকনো, ঢ্যাঙা মানুষটাকে সালামের খুব পছন্দ হয়েছে। সব সময় হাসিমুখ। যখন রাস্তার পাশে শো করে না, তখন লোকটা সালামের সাথে গল্প করে। সেই সব গল্পের কোন আগামাথা নেই। সালাম গল্প শুনতে ভালোবাসে। গল্পের সত্যমিথ্যা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। এসব গল্পের মধ্যে একটা গল্প কিছুটা ভালো লেগেছে এবং সত্যি বলে মনে হয়েছে। সেই গল্পে জমির ম্যাজিশিয়ান এক ভয়ংকর খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। লোকটা নাকি জাদুবলে জমিরকে একটা ঘরে বন্দি করে রেখেছিল। এই গল্পের বর্ণনা এতোটাই প্রানবন্ত ছিল যে একে সত্যি বলে মানতে দ্বিধা হয়নি।

কমলাপুর রেলস্টেশনের পেছনের বস্তিতে একটা ঘরে জমির ম্যাজিশিয়ানের বসবাস। একটা মাত্র ঘর, সেই ঘরে একটা খাট পাতা। সালাম নীচেই ঘুমায়। গরমে তার ঘুম আসে না। বস্তিতে বিদ্যুৎ থাকলেও এই ঘরটায় বিদ্যুৎ নেই। একটা হ্যারিকেনের আলোয় যতোটুকু আলো হয়, ততোটুকুতেই কাজ চালাতে হয়।

সন্ধ্যার পর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দুজনই ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরে। সালাম রান্নাবান্নার কিছু পারে না, জমির ম্যাজিশিয়ানই রান্না করে। লোকটার রান্নার হাতও অসাধারন। সামান্য ডিম, আলু আর ডাল, এই তিনটা উপাদান দিয়েই কী চমৎকার রান্না করা যায়, তা জমির ম্যাজিশিয়ানের কাছেই শেখা উচিত। এর পেছনে নিজের ক্ষুধার্ত অবস্থারও অবদান আছে বলে মনে হয় মাঝে মাঝে। ক্ষুধা পেটে সামান্য খাবারকেও অমৃত বলে মনে হয়।

জমির ম্যাজিশিয়ানের সাথে মাসখানেক ঘোরাঘুরির পর একটা জিনিস টের পেল সালাম। সেটা হচ্ছে ম্যাজিকের প্রতি তার অসম্ভব একটা আকর্ষণ। যদিও সেটা জমিরকে বুঝতে দেয়নি। লোকটা এমনিতে সব দিক থেকে ভালো হলেও, যখনই সালাম কোন ম্যাজিক সম্পর্কে জানতে চায়, মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। কোন কথাই বলতে চায়না। লোকটার এরকম আচরনের কারন বুঝতে পারে না সালাম। এজন্য মাঝে মাঝে রাগ হয়। আবার পরমূহুর্তেই ভুলে যায়। কারন এই লোকটার কারনে এখন পর্যন্ত সে টিকে আছে। নইলে এই কঠিন শহরে না খেয়ে মরতে হতো।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে হ্যারিকেনের আলোয় তাই বই নিয়ে বসে সালাম। ক্লাস ফোর পর্যন্ত স্কুলে পড়েছিল। এরপর মামী আর পড়তে দেয়নি। কিন্তু তাই বলে সে নিজের পড়ালেখাকে ভুলে যায়নি। প্রতিবছর স্কুলে যে বই দেয়া হতো, সেগুলো মামার কাছ থেকে টাকা নিয়ে লুকিয়ে কিনে আনতো। সবাই ঘুমিয়ে গেলে একা একাই পড়তো। বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল বা সমাজবিজ্ঞান পড়তে তেমন কোন সমস্যা হয়নি, সমস্যা হতো অংক নিয়ে। কিন্তু যেহেতু কোথাও পরীক্ষা দিতে হয় না, কাজেই একসময় অংক পড়া বাদ দিয়েছিল সালাম। বলতে গেলে এভাবেই নিজে নিজে পড়েছে অনেকদূর। ক্লাস নাইনের বই পড়ছে এখন। জমির ম্যাজিশিয়ানকে বলাতে লোকটা কোন পুরনো বইয়ের মার্কেট থেকে বইগুলো কিনে এনে দিয়েছে। সন্ধ্যার পর একা একা পড়ে সালাম। পড়তে ভালো লাগে। নিজেকে অশিক্ষিত মনে হয় না। যদিও কোনদিন প্রাতিষ্ঠানিক কোন সনদপত্র পাবে না, তবু সে স্বশিক্ষিত। এটাও বা কম কিসে।

আজ সন্ধ্যার পর জমির ম্যাজিশিয়ান কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। রান্নাবান্নার কোন জোগাড়যন্ত্র নেই। খিদে পেলেও চুপচাপ বসে আছে সালাম। মাঝে মাঝে জমিরের দিকে তাকাচ্ছে।

লোকটার কপালে হাত দিয়ে দেখেছিল একটু আগে। অনেক জ্বর। এই মূহুর্তে করণীয় সম্পর্কে কোন ধারনা নেই। মামার বাড়িতে জ্বর হলে মামী খুব রাগারাগি করতো। ঔষধ তো দূরের কথা, কোনদিন এক গ্লাস পানি খাওয়াতেও আসেনি কেউ। মামাতো বোনদের ইচ্ছে থাকলেও, মামীর কড়া চোখ এড়িয়ে সালামের যত্ন নেয়ার সুযোগ ওরা পায়নি।

একা একা জ্বরে বিছানায় পড়ে থাকার মতো বিরক্তিকর আর কোন কাজ নেই। জমির ম্যাজিশিয়ানের আত্মীয়স্বজন কেউ আছে বলে মনে হয় না।

বিয়েশাদী করেনি। করার সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না। কী রকম একা একটা জীবন। তার নিজের জীবনটাও এরকম। মা-বাবা, ভাই-বোন নেই। এক মামা আছে, তার কাছেও আর ফেরা হবে না।

কোন ওষুধও খাওয়ানো হয়নি। টাকা নেই। ওষুধ কিনবে কিভাবে? ছোট আলনায় জমিরের প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দুটো দশ টাকার নোট পাওয়া গেল। নোট দুটো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল সালাম। এই দুটো নোটই সম্বল। রাতে খাওয়ার কিছু নেই। এই টাকা দিয়েই ওষুধ কিনতে হবে, রাতের খাবার কিনতে হবে।

জমির ম্যাজিশিয়ানকে কিছু না বলেই ঘর থেকে বের হলো সালাম। এখন রাত আটটার মতো বাজে। কমলাপুরের এই জায়গাটায় সারি দিয়ে বস্তির ঘর। অনেক দূরে একটা ওষুধের দোকান। হাঁটতে হাঁটতে দোকানের দিকে এগুলো। আগে ওষুধ খাওয়াতে হবে লোকটাকে। রাতের খাবার পরে। এক রাত না খেয়ে থাকলে খুব বেশি ক্ষতি হবে না। কিন্তু জমির ম্যাজিশিয়ান কালই যদি রাস্তায় বের হতে না পারে, তাহলে কালকেও না খেয়ে থাকতে হবে।

দোকান থেকে জ্বরের ওষুধ হিসেবে প্যারাসিটামল দিলো। দুটো প্যারাসিটামল খেলেই নাকি জ্বর নেমে যাবে। দোকানির এই কথায় কিছুটা ভরসা পেল সালাম। বাকি টাকা দিয়ে দুজনের জন্য পরোটা আর ডিমভাজা কিনে কাগজ দিয়ে মুড়ে বাসায় ফিরল।

ঘরে ঢুকে দেখল জমির বিছানায় উঠে বসে আছে। চেহারায় দুর্বলতার ছাপ স্পষ্ট। উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমি তো মনে করছি, তুই ভাগছিস!'

সালাম হাসল। ভেগে যাওয়ার কোন জায়গা যে তার নেই, জমির নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছে।

'কী আনছিস?'

'ওষুধ। রাইতে একটা খাইবেন, সকালে একটা। জ্বর নাই হইয়া যাইবো।'

জমিরের চেহারা দেখে বোঝা গেল বেশ খুশি হয়েছে। প্যারাসিটামল খেয়ে পরোটা আর ডিমভাজা দুজনে ভাগাভাগি করে খেল।

'শোন, শুইয়া শুইয়া চিন্তা করতেছিলাম,' জমির ম্যাজিশিয়ান বলল, 'তোরে আমার শিষ্য বানামু। আমি যা জানি সব তোরে শিখামু।'

'সত্যিই!'

'হ। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'আমি যতোদিন আছি, আমার লগে থাকবি, আমি মরলে তুই খালাস।'

'আইচ্ছা।'

'নে, শুরু কর।'

'আপনে ঘুমান এখন,' সালাম বলল, 'কাইল থেইক্যা শুরু করমুনে।'

'না, এখনি,' জমির বলল, 'যা করনের এখনই করন লাগবো। দেরি করলেই লেট হইয়া যায়।'

সালাম বিছানার এক কোণায় বসল। জমির বালিশের নীচ থেকে তাস বের করলো এক প্যাকেট। বেশ দামী জিনিস। চকচক করছে।

'শুরু করতাছি, তাসের খেলা দিয়া,' জমির বলল, 'পরে অন্য জিনিস।'

'আইচ্ছা।'

ঘন্টাখানেকের মধ্যে তাসের যাবতীয় খেলা দেখাল জমির। তাসের নাম ধাম, ছোট ছোট সব হাতের কারুকাজ, চোখকে ফাঁকি দেয়া খেলাগুলো শিখতে সালামের খুব বেশি সময় লাগলো না। অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সময় লেগেছিল জমিরের এই খেলাগুলো শিখতে। তাসের খেলা দেখাতে সহজ মনে হলেও আসলে সহজ না। এখানে হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই। সেই চোখগুলোকে ফাঁকি দেয়ার জন্য হাত সাফাইয়ের কাজ হতে হয় দ্রুত আর নিখুঁত। সালাম এতো দ্রুত সেটা কিভাবে করে দেখাচ্ছে! মনে হচ্ছে খেলাগুলো ওর মাথায় আগে থেকেই ছিল।

'তুই কী এইগুলা আগে থেইক্যাই জানিস?'

'না। আপনের কাছেই দেখলাম মাত্র।'

'সত্যি কইরা বল।'

'সত্যি। বাপের কসম।'

'তোর বাপের নাম কী?'

'আমি ছোট থাকতেই বাপজান মইরা গেছে। উনার নাম ছিল জমশের। জমশের আলী।'

'কি করতো তোর বাপে?'

'জানি না।'

জমির চুপচাপ কিছুক্ষণ সালামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জমশের আলী নামটা পরিচিত। সালামের বাবার নাম জমশের হলেও এ একই জমশের নাও হতে পারে। লোকমুখে জমশের আলী সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে এককালে। ইচ্ছে ছিল দেখা করার। কিন্তু লোকটা কোথায় উধাও হয়ে গেল, সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না।

জমশেরের কোন ছবি নেই কোথাও। অবশ্য ছবি থেকেও লাভ ছিল বলে মনে হয় না। সালামের নিশ্চয়ই ছোট বেলায় দেখা বাবার চেহারা এখন আর মনে নেই।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলো দুজন। সালাম আরো বেশ কয়েকবার তাসের জাদুগুলো দেখালো। জমির খুব অবাক হয়ে দেখল এতো নিখুঁত কাজ সে নিজেও এখনো করতে পারে না। অথচ একবার দেখেই কী চমৎকার শিখে গেল!

বিস্ময়বোধটা নিজের কাছেই রাখলো জমির। ওকে আরো কিছু ট্রিকস শেখাতে হবে। দেখতে হবে বাকি ট্রিকসগুলোর ক্ষেত্রেও দ্রুত শিখতে পারে কিনা। ছেলেটা জাত জাদুকর। সত্যিকারের ম্যাজিশিয়ান।

সালাম কাজ শিখে নিচ্ছে দ্রুত। এতোটা দ্রুত যে জমিরের মাঝে মাঝেই চিন্তা হয়। ওর হাতের কাজ দেখলে মনে হয়, ও আসলে কোন ফাঁকি দিচ্ছে না কোথাও। সত্যি জাদু দেখাচ্ছে। গুলিস্তান থেকে ওকে একটা কোট কিনে দিয়েছে কিছুদিন আগে। সেই কোটটা ঢুলঢুল করে। কোটের ভেতর হরেক রকমের পকেট, কোটের হাতার ফাঁকে ফাঁকে অনেক কিছু রাখা যায়। সেসব জায়গায় কিছু রাখলে বাইরে থেকে সেটা বোঝার কোন উপায় নেই। কোটটা পরে আনন্দে ঘুরঘুর করে সালাম। দেখতে ভালো লাগে জমিরের।

জাদু হচ্ছে গুরুমুখি বিদ্যা। সে হিসেবে জমির সালামের গুরু। কিন্তু ছেলেটা যেভাবে আগাচ্ছে, তাতে গুরুকে ছাড়িয়ে যাবে যেকোন সময়। এই কয়দিনেই যে দ্রুত গতিতে শিখছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে জাদুটা ওর ভেতর সহজাত, কষ্ট করতে হয় না। এমনিতেই বুঝে যায়। তবে ছেলেটার একটা সমস্যা আছে। সেটা হচ্ছে চারপাশ ঘিরে থাকা লোকজনের মাঝে কেমন শক্ত হয়ে যায়। মুখ দিয়ে কথা বের হতে চায় না। জাদুকররা হাতের কাজের সাথে সাথে কথায়ও সেরকম পারদর্শী হবে, তা না হলে মুশকিল। 'প্রেজেন্টেশন' আর 'মিসডিরেকশন' হচ্ছে জাদুর একটা মূল মন্ত্র। এ

শব্দদুটো ওস্তাদের কাছে শিখেছিল জমির। যে জাদুকর দর্শকদের যতো বেশি ভুল দিকে চালাতে পারবে সে ততো সফল। আর এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে অন্যতম প্রধান অস্ত্র।

সালামকে তাই কথা বলার ট্রেনিং দিচ্ছে জমির। দর্শককে কিভাবে জমিয়ে রাখতে হবে সে ব্যাপারে কী কী পদ্ধতি নিতে হয়, তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা চলে দুজনের মাঝে। আলোচনারসাথে সাথে প্রতিটা জাদু কিভাবে দেখাতে হবে, দর্শকদের কী বলতে হবে, কেউ কোন প্রশ্ন করলে কিভাবে থামিয়ে দিতে হবে, এসব নিয়ে রীতিমতো ট্রেনিং। ট্রেনিং তো রাস্তাঘাটে দেয়া সম্ভব না। কমলাপুর বস্তি থেকে বের হয়ে স্টেশনের দিকে ঢুকলে একের পর এক খালি মালবাহি বগি দেখা যায়। এসব খালি বগিকে মঞ্চ বানিয়ে তাতে সালামকে দাঁড় করিয়ে দেয়। দর্শক বলতে একা জমির। তবু জাদু দেখাতে গিয়ে সালাম থতমত খায়, তোতলায়। ওর হাত চলে ঠিকই, কিন্তু একই সাথে মুখ চলে না।

সারাদিন এখানে সেখানে জাদু দেখিয়ে, দিনের পর দিন সন্ধ্যার পর বগিকে মঞ্চ বানিয়ে সালামকে ট্রেনিং দিয়েছে জমির। মাসখানেক এভাবে চলার পর মনে হলো, এবার ছেলেটার আসল জায়গায় পরীক্ষা করে দেখার সময় হয়েছে। খুব বেশি না, তিনটা জাদু দেখাবে সালাম। তাতেই হবে। বাকি কয়েকটা জমির নিজে দেখাবে।

মতিঝিল পাড়ার লোকজন, বিকেলে অফিস সেরে বাসায় ফেরে। ফেরার পথে টুকটাক কেনাকাটা করে। এইসব ঘর ফেরা মানুষদের মধ্যে জাদু বেশ জনপ্রিয়। বাজারের ব্যাগ হাতে অনেকেই দাঁড়িয়ে দেখে কী হচ্ছে না হচ্ছে। জাদু শেষ হলে দু'এক টাকা ফেলে যায়।

আগামী বৃহস্পতিবার বিকেলকে বেছে নিলো জমির। সালামের জাদু দেখানোটা একটা গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার। সে বিশেষ একজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সে-ই লোক সামনের বৃহস্পতিবার ঢাকায় থাকবে। এই সুযোগ আরেকবার পাওয়া যায় না।

অধ্যায় ৫

মুরশেদ মিয়ার বয়স সত্তুরের কাছাকাছি। উনিশশো কুড়ি সালের শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিভরা এক দিনে তাঁর জন্ম। সেদিন নাকি এতো বৃষ্টি হয়েছিল যে আঁতুড় ঘর পানিতে থৈ থৈ করছিল। ধাত্রী ব্যস্ত ছিল সন্তানপ্রসবের কাজে অন্যদিকে শিশু মুরশেদ মিয়ার মা আনোয়ারা খাতুন যে বিছানায় শুয়ে ছিলেন তার পায়া জড়িয়ে ছিল দুটো গোখরা সাপ। শিশু মুরশেদ মিয়া জন্মের পরপরই এমন চিৎকার দিয়েছিল যে সাপ দুটো নাকি মুহূর্তেই ঘর ছেড়ে চলে যায়। ঘটনাটা আনোয়ারা বেগম প্রায়ই বলতেন। সেই দিন গত হয়েছে কবে। এখন উনিশশো নব্বই চলছে। সত্তুর বছর বয়সে অনেক কিছু দেখা মুরশেদ মিয়ার কেন জানি মনে হয় সামনে কঠিন দিন আসছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বাড়ছে, যন্ত্রের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। দেশের রাজনীতি নিয়ে খুব একটা চিন্তিত না হলেও মুরশেদ মিয়ার ধারনা দেশে একটা পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে।

এখন মুরশেদ মিয়ার শ্যামলা মুখে অনেক বলিরেখা, কপালে শত ভাঁজ। চোখ দুটো বড় বড়, চোখের মণি গাঢ় বাদামী বর্ণের। থুতনিতে অল্প সাদা দাঁড়ি, মাথার সাদা চুল ঝুটি করে বাঁধা। কানের ফাঁকে একটা সিগারেট গোঁজা। পরনে ফিনফিনে ফতুয়া আর লুঙি। হাতে ছোট মোটা একটা লাঠি। দেখলেই বোঝা যায় জিনিসটা ভারি। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে ময়মনসিংহ রেলস্টেশনে বসে আছেন। ট্রেন আসবে কিনা আদৌ বোঝা যাচ্ছে না। তার সাথে একটা ঝোলা। ঝোলায় হাবিজাবি অনেক জিনিস। ঝোলাটা শক্ত করে ধরে আছেন। দূর থেকে দেখে যে কেউ ভাববে এই ঝোলায় সাতরাজার ধন মানিক আছে, তাই এতো সতর্কতা। অথচ মুরশেদ মিয়া জানেন, এই ঝোলায় যা আছে, সাধারন মানুষের দৃষ্টিতে তার কোন মূল্য নেই। এসব জিনিসের মূল্য পৃথিবীর মানুষ দিতে পারবে বলেও মনে হয় না।

ঢাকায় যেতে হবে, প্রতিমাসে নিয়ম করে একবার ঢাকায় যান।

ফার্মগেটের কাছে একটা বাসা ভাড়া নেয়া আছে। সেই বাড়িতে উঠেন। বাড়ির মালিক তার বিশেষ ভক্ত। নামমাত্র ভাড়া দেন। তিনতলার পুরোটা তার দখলে। মাসে মাত্র কয়েকদিনের জন্যই সেখানে যাওয়া হয়। বাকি সময় ফাঁকা পড়ে থাকে।

তার হাতে একটা কাগজের ঠোঙায় অল্প কয়েকটা বাদাম। বাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ডানে-বামে তাকালেন মুরশেদ মিয়া। ট্রেন আসেনি। তবে অন্য কিছু একটা এসেছে। চোখের কোণা দিয়ে ক্যান্টিনের দিকে একটা নড়াচড়া লক্ষ্য করলেন। কেউ ওখানে একটু আগেও দাঁড়িয়েছিল। এখন নেই। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনবোধ করলেন। হাতে লাঠি আছে, কাউকে শায়েস্তা করার জন্য এই লাঠিটাই যথেষ্ট। যারা তাকে চেনে না, ভাববে বুড়ো মানুষ, কোন শক্তি নেই গায়ে। কিন্তু ওদের ধারনাও নেই, তার গায়ে কেমন শক্তি ধরে। এটি তিনি কাউকে বুঝতেও দিতে চান না।

বাদামের ঠোঙা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মুরশেদ মিয়া। আজ ট্রেন আসবে না। তারচেয়ে বাসে যাওয়া যেতে পারে। মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ডে সন্ধ্যার আগে পৌঁছালে হয়তো বাস পাওয়া যেতে পারে।

স্টেশন থেকে বের না হয়ে ট্রেন লাইন ধরে হাঁটা ধরলেন। কেউ অনুসরন করলে করুক। খুব বেশিক্ষণ নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারবে না। বিকেলের এই সময়টায় অবশ্য বেশ মানুষজন হয় স্টেশনে। খোলা স্টেশন, লোকজনের অবাধ বিচরণ। কেউ হাওয়া খেতে আসে, কেউ কেউ দল বেঁধে আসে ট্রেনের লাইনের ওপর বসে আড্ডা দিতে।

হাঁটতে হাঁটতে সিকে ঘোষ রোডের কাছাকাছি এসে পেছন ফিরে তাকালেন মুরশেদ মিয়া। লোকটাকে এবার স্পষ্ট দেখতে পেলেন। মাঝারি গড়ন, পুরু গোঁফ, কাঁধ পর্যন্ত ঝাকড়া চুলের এই লোকটাকে আগে কখনো দেখেননি। কিংবা দেখেছেন। এরা ভোল পাল্টাতে ওস্তাদ। গোঁফ, চুল সবই হয়তো নকল।

বিকেলের এই আলোতে তাকে এতো কাছ থেকে অনুসরন করার একটাই মানে থাকতে পারে। তা হলো ওদের সাহস বেড়ে গেছে। কিংবা ওরা এখন আর তাকে ভয় পায় না। ভয় কিভাবে পাওয়াতে হয় তা তার ভালো জানা আছে। এই মুহূর্তে অবশ্য সেসব কিছুই করার ইচ্ছে নেই।

এখন মাসকান্দা যেতে হবে। হেঁটে যাওয়া যায়। কিন্তু সিকে ঘোস রোডে পা রেখেই একটা রিক্সা ডাকলেন মুরশেদ মিয়া। উঠে পড়লেন।

একটু পেছনে অনুসরনকারী যে অন্য একটা রিক্সায় পিছু নিলো তা বুঝতে অসুবিধা হলো না। রিক্সা ধীর গতিতে চলেছে।

সুর করে গান গাচ্ছেন মুরশেদ মিয়া। রিক্সায় উঠলে তার মাঝে মাঝে খুব উদাস লাগে। গান গাইতে ইচ্ছে করে। আগে যখন গহীন রাতে নৌকা নিয়ে মাঝ নদীতে একা একাই বের হয়ে পড়তেন, তখনকার কথা মনে পড়ে। সে সময় আশপাশে কেউ থাকতো না বলে গলা ছেড়ে গান ধরতেন। রিক্সায় অবশ্য গলা ছেড়ে গান গাওয়ার উপায় নেই। এই বয়সে যতোটুকু গাচ্ছেন তাতেই রিক্সাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। পথচারি কয়েকজনের চোখেও একই রকমের বিস্ময় লক্ষ্য করলেন। এই বিস্ময় কী তার সুরেলা কণ্ঠে গানের কারণে না এই বৃদ্ধ বয়সে রিক্সায় বসে গান গাওয়ার কারনে তা বুঝতে পারলেন না। তবে প্রথমটা হলেই তার ভালো লাগবে। একসময় গান গাওয়ার প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। কিন্তু কারো কাছ থেকে উৎসাহ না পেয়ে এক্ষেত্রে খুব বেশি এগুনো হয়নি। ঐ সময়ে তার গানের গুনগ্রাহী না থাকলেও বুড়ো বয়সে বেশ ভক্ত জুটে যাবে মনে হচ্ছে।

রিক্সাওয়ালার কাঁধে টোকা দিলেন মুরশেদ মিয়া। যতো ধীর গতিতে চালানো যায়, ততো ধীর গতিতে যেন চালায়, এই পরামর্শ দিলেন। রিক্সাওয়ালা জোয়ান-মদ্দ, তার পায়ে অসীম জোর। সে যাত্রীর পরামর্শ কানে না তুলে ঝড়ের গতিতে রিক্সা চালাতে লাগল।

সন্ধ্যার পর মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড এলাকাটা প্রায় ফাঁকা হয়ে আসে। ঐ সময়টাই কাজে লাগাতে হবে। তাকে অনুসরন করার শাস্তিটা হাতে হাতে দিতে হবে, যাতে এরপর কেউ এলে যেন আরো সাবধান হয়।

শেষ বাসটাও যখন ছেড়ে চলে গেল, মুরশেদ মিয়া মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড ছেড়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। পায়ে যথেষ্ট জোর আছে। টানা একদিন হাঁটলে ঢাকা পৌঁছানো যাবে।

অনুসরনকারী এখনো আছে আশপাশে। বাসস্ট্যান্ডে অনেক লোকজন ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে ফাঁকা অন্ধকার রাস্তায় একাই হাঁটছেন মুরশেদ মিয়া। রাস্তার দু'পাশে ল্যাম্পপোস্ট থাকার কথা। সেগুলো নেই। আজ অমাবস্যার রাত নয়, কিন্তু চারপাশ এতো অন্ধকার যে নিজেকে কেমন অন্ধ লাগছে।

মনে হচ্ছে চোখ বুজে হাঁটলেও তেমন কোন সমস্যা হবে না। এই অন্ধকারে চোখ খোলা রাখা আর বন্ধ রাখা একই কথা।

রাস্তার দুপাশে ঝোপঝাড়। একপাশ ধরে হাঁটছেন মুরশেদ মিয়া। মাঝে মাঝে অল্প কিছু রিক্সা, বেবিট্যাক্সি দ্রুত গতিতে পার হয়ে যাচ্ছে। হাতের ঝোলা থেকে মোটাসোটা একটা বাঁশি বের করে আনলেন। এই জিনিসটা তার খুব পছন্দের। বাঁশি বাজাতে বাজতে হাঁটা। ছোটবেলায় গল্প শুনেছিলেন। কোন এক বাঁশিওয়ালা বাঁশির সুরে শহরের সব বাচ্চাকে নিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার অবশ্য কাউকে নিয়ে হারিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নেই।

এই বাঁশিটা উপহার দিয়েছিল ফুলপুরের হারিছ মন্ডল। মন্ডলের দাবী বাঁশিটা মন্ত্রপূত। কামরুপ কামাখ্যা থেকে আনা। মন থেকে কিছু চেয়ে এই বাঁশিতে ফুঁ দিলে সেটা পাওয়া যায়। সন্তান হচ্ছিল না হারিছ মন্ডলের। মন থেকে চেয়ে এই বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে সে ফল পেয়েছে। এতো চমৎকার একটা জিনিস তাকে কেন দিয়ে দিয়েছিল হারিছ মন্ডল সেটা বের করতে বেশ সময় লেগেছিল। হারিছের যে ছেলেটা হয়েছিল, ও ছিল জন্ম থেকে প্রতিবন্ধী। এরকম প্রতিবন্ধী সন্তান পাওয়ার চেয়ে বাঁশিতে ফুঁ না দেয়াই হয়তো ভালো ছিল বেচারার জন্য, ভাবলেন মুরশেদ মিয়া।

আরো কিছুটা এগিয়ে একটা আম গাছের নীচে দাঁড়ালেন। চাঁদ উঠেছে বলে বেশ আলো হচ্ছে এখন। এখান থেকে দু'পাশের রাস্তা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। আশপাশে জনবসতি নেই। এখানে চেঁচিয়ে মরে গেলেও কেউ দেখতে আসবে না। বাঁশিটা আবার ঝোলায় ঢুকিয়ে রেখেছেন। একটানা অনেকক্ষণ বাঁশি বাজালে হাঁপ ধরে যায়।

দূরে লোকটাকে দেখা গেল। বেশ ধীরে সুস্থে হেঁটে আসছে। কোন তাড়া নেই। শিকারকে দেখলে শিকারীর মধ্যে সামান্য চঞ্চলতা দেখা যায়। এই লোকটার ক্ষেত্রে তাও নেই। কঠিন শিকারি বোঝা যাচ্ছে। অবশ্য এখানে শিকারি কে আর শিকার কে তা অল্পক্ষণেই বোঝা যাবে।

লোকটা ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এসেছে। চাঁদের আলোয় শ্যামলা মুখমন্ডল পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। শার্ট প্যান্ট পরনে, ঝাকড়া চুলের লোকটার হাতে কিছু নেই। তবে একেবারে খালি হাতে এসেছে এটা বিশ্বাস হচ্ছে না। পকেটে কিংবা প্যান্টের পেছনের দিকে কিছু রেখেছে হয়তো। সময়মতো

বের করবে।

আম গাছটা রাস্তার একপাশে। লোকটা রাস্তার ওপাশে ঠিক বিপরীত দিকে দাঁড়ালো। ঠিক মুরশেদ মিয়ার মুখ বরাবর। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বলছে না। অবশ্য বলার কিছু নেই। যে যার উদ্দেশ্য জানে। এখানে বড় বক্তৃতার কিছু নেই।

মুরশেদ মিয়া ঝোলায় হাত ঢোকালেন। তার বয়স হয়েছে। মৃত্যুর জন্য সবসময় প্রস্তুত। কিন্তু তবু মৃত্যু যখন কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন মনে হয়, হাজার ঝুট ঝামেলা সত্ত্বেও জীবনটা খুব খারাপ কিছু নয়। এখানে পাওয়ার কিংবা হারানোর কিছু না কিছু থাকে। তার অবশ্য পাওয়ার বা হারানোর কিছু নেই। তিনি শুধু রক্ষা করতে চান।

লোকটার দুই হাত প্যান্টের পকেটে। যা ধারনা করেছিলেন মুরশেদ মিয়া। খালি হাতে আসেনি। যা এনেছে তা ঐ প্যান্টের পকেটে আছে। তিনি প্রস্তুতি নিলেন মনে মনে। বড় করে নিশ্বাস নিলেন। চোখ বুজে কিছুক্ষণ প্রার্থণা করে নিলেন। এই প্রার্থণা আর কারো কাছে নয়। নিজের মনের কাছে। মন শক্ত থাকলে সব ঠিক।

চোখ খুলতে যাওয়ার আগে চমকে উঠলেন মুরশেদ মিয়া। কানের পাশ দিয়ে সাই সাই করে কয়েকটা ছুরি চলে গেছে। বিঁধেছে পেছনের আম গাছে। ধারালো সব ছুরি একের পর ছুঁড়ে যাচ্ছে তাকে তাক করে। লোকটার তাক মারাত্মক।

মুরশেদ মিয়া কিছু করছেন না। মাথাটাকে শুধু ডান-বাম করছেন, তাতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে ছুরিগুলো। এতোগুলো ছুরির একটাও লক্ষ্যভেদ করেনি দেখে একটু অবাক হলো লোকটা। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালেন মুরশেদ মিয়া। কমপক্ষে পঞ্চাশটা ছুরি গেঁথে আছে আম গাছে। চাঁদের আলোয় চকচক করছে ছুরির ফলাগুলো। এটা নিশ্চিত যে প্রতিটা ছুরির আগায় বিষ মেশানো আছে। যে বিষ রক্তে মিশে যাওয়া মাত্রই শিকারকে শেষ করে দেবে।

এবার তার পালা। ঝোলা থেকে ধীরে সুস্থে ছোট একটা খোপ বের করে আনলেন। এই খোপের নীচের দিকে ছোট একটা বোতাম আছে। বোতাম চাপ দিতেই খোপটা বদলে গেল এক নিমিষে। ছোট একটা খোপের বদলে এখন মুরশেদ মিয়ার হাতে ধারালো একটা কিরিচ দেখা

যাচ্ছে। লম্বা, তলোয়ারের কাছাকাছি দেখতে হলেও কিরিচ জিনিসটা বেশ কার্যকর অস্ত্র। একবারে পেটে ঢুকাতে পারলে আর নিস্তার নেই।

ঝোলাটা কাঁধে শক্ত করে আটকে নিলেন মুরশেদ মিয়া। ছুরিবাজি ভেস্তে যাওয়াতে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটার চেহারায় বেশ হতাশার একটা ছাপ পড়েছিল। তবে সেটা অল্পক্ষণের জন্যই। ওর দুই হাতে এখন দুটো তলোয়ার। এগুলো কোথায় ছিল এতোক্ষণ? তার চোখে পড়েনি কেন?

মুরশেদ মিয়া চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করলেন কিছুক্ষণ। মানুষের মৃত্যুতে মানুষই সবচেয়ে বেশি দুঃখ পায়। অন্য কোন প্রাণী নয়। বিনাকারনে কারো প্রান নিয়ে খেলতে যাওয়ার ইচ্ছে কোনকালেই ছিল না। ইচ্ছে না থাকলেও মরনঘাতি খেলা খেলতে হবে। খেলোয়াড় দুজনেই প্রস্তুত।

মুরশেদ মিয়া পা বাড়ালেন। চাঁদের আলোয় তার চোখ দুটো চকচক করে উঠলো।

অধ্যায় ৬

নামের আগে ডক্টরেট ডিগ্রি যোগ হয়েছে। ইউনিভার্সিটির চাকরিটাও জুটেছে। ঢাকায় নিজের মতো থেকে, দেশকে দেখে, বাংলায় কথা বলে যে আরামের জীবনের হাতছানি ডঃ আরেফিনের সামনে সে তুলনায় লন্ডনে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব মোটেও সুবিধার নয়। পিএইচডি করেছেন অক্সফোর্ডের অধীনে কেন্ট ইউনিভার্সিটি থেকে। তার থিসিসের মূল বিষয় ছিল প্রাচীন ভারত ও জাদুবিদ্যা। নিজের বিষয় নৃতত্ত্ব বাদ দিয়ে এমন বিদঘুটে বিষয় বেছে নেয়ার পেছনের কারন ছিলেন তার সুপারভাইজার ডঃ অনিকেত সেন। সেনবাবু পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নিলেও ইংল্যান্ডে আছেন কুড়ি বছর হলো। দেশে যান না কোন আত্মীয়স্বজন নেই বলে। তবে সবসময় দেশ কিংবা দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করেন। বিশেষ করে প্রাচীন ভারত, এর মিথ, আদি ইতিহাস, ঐতিহ্য এসব নিয়ে ভদ্রলোকের বিস্তর জানা। ডঃ আরেফিনের আগ্রহের মূল বিষয় প্রত্নতত্ত্ব হলেও জাদুর মতো একটা অদ্ভুত ব্যাপারের জন্য তার মনে আলাদা একটা স্থান আছে। তার সাথে যদি প্রাচীন ভারত শব্দটা জুড়ে দেয়া যায় তো কথাই নেই।

এ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে দারুন খাটাখাটি করতে হয়েছে। ডঃ সেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, তবে মূল বিষয়ে আগ্রহ থাকাতে কাজটা করতে ঝামেলা হয়নি।

ডঃ আরেফিনের বয়স এখন সাতাশ। বাবা-মা দুজনেই গত হয়েছেন, বড় ভাই লন্ডনেই স্থায়ী নিবাস করেছেন আর একমাত্র বোন থাকে অস্ট্রেলিয়ায়। তিনি এখনো বিয়ে করেননি। খুব সহসাই করার ইচ্ছে নেই। আরো অন্তত তিন-চার বছর নিজের অবিবাহিত জীবনের আনন্দ নিতে চান। এক্ষেত্রে তার আনন্দের ক্ষেত্র খুব সীমিত। তিনি বই পড়তে পছন্দ করেন। এছাড়া ঘুরে বেড়াতেও ভালো লাগে।

গত কিছুদিন ধরে ঢাকায় মন টিকছিল না। সারাদিন একটা দু'টা ক্লাস নেয়া, তারপর টিচারদের কমনরুমে বসে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টানো আর

সন্ধ্যার পর চুপচাপ নিজের ফ্ল্যাটে বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি চলে এসেছিল। তিনি খুব একা মানুষ, বন্ধু-বান্ধব খুব একটা কখনোই কাছে টানেনি তাকে। অসামাজিক বলে দারুন সুনাম(!) ছিল সেই ছাত্র অবস্থায়ই। এখন সেটা আরো বেড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে বিয়ে-থা করলে হয়তো অসামাজিক ভাব কিছুটা হলেও কাটবে।

ইউনিভার্সিটির কবে বন্ধ দেবে সেটার অপেক্ষায় না থেকে ডঃ আরেফিন চলে এলেন গ্রামে। শৈশবের অল্প কিছু সময় এখানে কেটেছে। তারপর মা ঢাকায় বাসা নিলেন। বাবাকে খুব একটা কাছে পাওয়া হয়নি। সারাজীবন বাউন্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ানো লোকটা একদম শেষ বয়সে এসে স্থির হয়েছিলেন। তিনি মারা গিয়েছেন বছর দশেক হলো। মা'ও মারা গিয়েছেন সাত বছর আগে। গ্রামের এই ভিটেবাড়িটা তাই ফাঁকাই থাকে। বড় মামা দেখাশোনা করেন। তিনি অবিবাহিত মানুষ। একা একা থাকতেই তার ভালো লাগে।

সন্ধ্যার দিকে ভিটে বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালেন ডঃ আরেফিন। মাঝখানে উঠোন, দু'পাশে কিছু টিনের ঘর। এরমধ্যে মাঝখানের বড় ঘরটায় মা থাকতেন। পাশের ঘরগুলো ফাঁকাই থাকতো সবসময়। ডানদিকের কোণার ঘরটা সেই ছোটবেলা থেকেই তালাবন্ধ পেয়েছেন, এখনও সেটা তালাবন্ধ। এই ঘরটা তাকে অনেকদিন ধরে টানছিল। এবার সেই টান অগ্রাহ্য করতে পারেননি।

তাকে দেখে চশমা পরা যে বয়স্ক লোকটা সামনে এসে দাঁড়ালেন তার নাম নজু মিয়া। নজু মিয়ার বয়স সত্তুরের কাছাকাছি। ইনিই বড় মামা।

'তুই কামাইল্যা না?'

মাথা নাড়লেন ডঃ আরেফিন।

'এতো রাইতে কি ঘটনা? আগে খবর দিবি না?'

ডঃ আরেফিন দেখলেন ঘড়িতে মাত্র আটটা বাজে। ঢাকায় এটা মাত্র সন্ধ্যা। কিন্তু বিজলি বাতির সাথে সংযোগহীন এই অজ পাড়া গায়ে এটাই অনেক রাত।

'হঠাৎ করেই চলে এলাম।'

'তোর বাপও এইরকম হঠাৎ কইরা আইতো আর যাইতো,' বিড়বিড় করে বললেন নজু মিয়া।

'আমি কয়েকটা দিন থাকবো।'

'নিজের বাড়িতে কয়টা দিন কেন, সারা জীবন থাক, কে মানা করছে?'

নজু মিয়ার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না ডঃ আরেফিন। বড় মামা এমনিতেই কথা বেশি বলেন। আগামী কয়েকদিন কান ঝালাপালা হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

বড় মামার হাতের রান্না খারাপ না। দশটার মধ্যেই সবকিছু গোছানো হয়ে গেল। বড় মামা বারান্দায় হুকা নিয়ে বসেছেন। সুখটান দিতে দিতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন ডঃ আরেফিনের দিকে।

'তুই তোর বাপের মতো দেখতে হইছিস, বুঝলি?' নজু মামা বললেন, 'হঠাৎ কইরা তোরে দেইখ্যা মনে হইছিল সামসু আইসা খাড়াইছে উঠানে। ওরে দিয়া অবশ্য সব সম্ভব।'

'মামা, বাবা মারা গেছেন দশ বছর হলো। আপনি এ কথা বললেন কেন?'

'তোর বাপ অন্যরকম ছিল। তুই বুঝবি না।'

'অন্যরকম কী রকম?'

'বাদ দে।'

ডঃ আরেফিন আর কথা বাড়ালেন না। বাবা অন্যরকম ছিলেন সেটা জানেন, পিতৃস্নেহ কী জিনিস তা তিনি কিংবা তার ভাইবোন কেউ টের পাননি। টাকা পয়সার অভাব কখনো ছিল না। কিভাবে কিভাবে বাবা মায়ের কাছে টাকা পাঠাতেন সংসার চালানোর জন্য। কিন্তু তিনি নিজে উপস্থিত হতেন না। বছরে দু'একবার বাবাকে দেখতে পাওয়া যেত। সেটাও খুব কম সময়ের জন্য। বৃদ্ধ বয়সে বাবা ফিরে এলেন ঠিকই, কিন্তু তখন সবাই বড় হয়ে গেছে। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। কাজেই অভিমান ভুলে বাবার কাছে পুরনো দিনের অবহেলার কৈফিয়ত আর চাওয়া হয়নি।

মাঝখানের বড় ঘরটায় শোয়ার ব্যবস্থা হলো। বড় মামা এগারোটার দিকে ঘুমাতে চলে গেলেন।

অনেকদিন পর জায়গা বদলের কারনেই সম্ভবত ঘুম আসছিল না ডঃ আরেফিনের। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে একসময় উঠে বসলেন। বারবার নজু মামার বলা কথাগুলো মনে পড়ছিল। বাবাকে দিয়ে সব সম্ভব এই কথার মানে কী? মৃত্যুর পরও কী একজন মানুষ ফিরে

আসতে পারেন!

ঘড়িতে যখন রাত দুটো বাজল তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ডঃ আরেফিন। বাইরে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় বাড়ির চারপাশের গাছগুলো থেকে কেমন শনশন শব্দ আসছে।

দৃষ্টিবিভ্রমই কিনা, ডঃ আরেফিন দেখলেন উঠোনের মাঝখানে কতোগুলো ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি ভূতে বিশ্বাস করেন না, কাজেই ভয় পেলেন না। একটু খেয়াল করে তাকাতেই বুঝলেন ওগুলো আশপাশে গাছগুলোর ছায়া। ভয়ের কিছু নেই।

উঠোনে কিছুদূর পায়চারি করে একসময় তিনি একদম কোণার তালাবন্ধ ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এই রুমে বাবা ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারবে না। এটা কঠিন নিয়ম ছিল। তিনি বছরে একবার দু'বার যখনই আসতেন, একা একা এই ঘরে ঢুকতেন। সেই ছোটবেলায় খুব আগ্রহ ছিল ঘরটা নিয়ে। কিন্তু পরবর্তীতে মনে হয়েছিল, বাবা একা থাকতে চান বলেই এই ঘরে থাকেন। এখানে রহস্যের কিছু নেই।

বড় ভাই একবার ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন, সেজন্য মা'র হাতে মার খেতে হয়েছিল। বাবা ফিরে এসে যখন শুনেছিলেন, খুব রাগ করেছিলেন। এরপর সেই ঘরে ঢোকার চেষ্টাও কেউ করেনি।

দরজার সামনে বড় একটা তালা ঝুলছে। জিনিসটা বেশ ভারি, গায়ে নানারকম নক্সাকাটা। এই তালার চাবি কোথায় কেউ জানে না। বাবা নেই, তাই এই চাবি খুঁজে পাওয়া সম্ভাবনাও নেই। এই তালা ভাঙতে হবে। এতো ভারি একটা তালা ভেঙে ফেলা সহজ কাজ হবে না। একটা হাতুড়ি হলে ভালো হয়। কিন্তু হাতুড়ি পাওয়া যাবে কোথায়? নজু মামাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি হয়তো জোগাড় করে দিতে পারবেন, কিন্তু মামাকে জড়াতে চাচ্ছেন না ডঃ আরেফিন।

এখন শীতকাল না, তবু কেমন শীত শীত লাগছে। তালাটায় হাত দিলেন, লোহার তৈরি জিনিস। বেশ গরম লাগল জিনিসটা। তালাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। অনেক পুরনো এই তালাটায় আজব সব নক্সা। সাপ, হরিণ, ব্যাঙ আর বাঘ এই প্রাণীগুলোকে দেখা যাচ্ছে, যদিও ঠিকমতো লক্ষ্য না করলে মোটেও বোঝা যায় না। তালাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে 'খুট' করে একটা শব্দ হলো। অবাক হয়ে দেখলেন, তালাটা খুলে

গেছে।

দরজার আংটা থেকে তালাটা খুব সাবধানে বের করে আনলেন ডঃ আরেফিন।

'তোমার বাপেরে জিগাইছিলাম, এইটার চাবি কই?'

পেছন থেকে কথাগুলো শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন ডঃ আরেফিন। নজু মামা দাঁড়িয়ে আছেন। এগিয়ে এলেন ডঃ আরেফিনের দিকে। তার হাতে একটা হ্যারিকেন।

'সে বলছিল এই তালার চাবি নাই। যার হাতে খোলা দরকার এমনিতেই খুলবে। আমি নিজে অনেকবার চেষ্টা করছি। এমনকি তালাচাবিওয়ালাও নিয়া আসছিলাম। কাজ হয় নাই। আইজ তোমার হাতে খুইলা গেল।'

'আপনি ঘুমাননি? '

'রাইতে আমার ঠিকমতো ঘুম হয় না। বুড়া হইছি তো। বুড়া হইলে ঘুম আসে না।'

তালাটা প্যান্টের পকেটে ঢোকানোর চেষ্টা করলেন ডঃ আরেফিন। ঢুকল না। হাতে রেখেই দরজা খুললেন। ভেতরে নিকষ অন্ধকার। নজু মামা তার হাতের হ্যারিকেনটা এগিয়ে দিলেন।

'ঐ ঘরে কী আছে জানি না। জানতে চাইও না। বেশি সময় থাইকো না। আমি যাই, দেখি ঘুম আসে কিনা।'

নজু মামা চলে গেলেন আর হ্যারিকেন হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলেন ডঃ আরেফিন।

ঘরের ভেতরটা শব্দহীন, তবে গন্ধহীন নয়। হাল্কা একটা সুগন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ছোট ঘরটায় আসবাব বলতে সাদা ধবধবে চাদর পাতা একটা বিছানা। একপাশে বড় একটা কাঠের আলমারি আর দেয়ালজুড়ে অসংখ্য মুখোশ। হ্যারিকেন নিয়ে এক এক করে মুখোশগুলো দেখছেন ডঃ আরেফিন। এতো নিখুঁত মুখোশগুলো যে মনে হয় সত্যি সত্যি মানুষের মুখ এগুলো। একটা মুখোশের সামনে দাঁড়িয়ে সেটায় হাত দিয়ে দেখলেন। মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি কারো মুখে হাত দিয়েছেন। মুখের চামড়াটা একদম সতেজ, অকৃত্রিম। মুখোশের চোখ দুটো বোজা। মনে হয় ঘুমিয়ে আছে, যে কোন সময় চোখ খুলে অবাক দৃষ্টিতে তাকাবে।

অন্তত কয়েকশ মুখোশ আছে এখানে। তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ফর্সা, কালো, চাইনিজ, আফ্রিকান, ককেশিয়ান এরকম নানা রকম মুখের সমাহার দেয়ালজুড়ে। দেখতে দেখতে প্রায় শ'খানেক মুখোশ দেখার পর বিছানায় বসলেন ডঃ আরেফিন। মুখোশগুলো দেখতে দেখতে একটা কথাই মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই মুখোশগুলো স্রেফ মুখোশ নয়। এগুলো সবগুলো একেকজন রক্তমাংসের মানুষ। এদের সবার সাথে বাবার পরিচয় ছিল কিংবা বাবাই হয়তো... চিন্তাটা মাথায় আসতেই কেঁপে উঠলেন ডঃ আরেফিন। মুখোশগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা মুখোশ পরিচিত লাগল। হ্যারিকেন নিয়ে তেমন একটা মুখোশের সামনে দাঁড়ালেন। চল্লিশোর্ধ একজন পুরুষ মানুষের মুখোশ। মুখে অসংখ্য কাটাকুটি। এই মানুষটাকে তিনি চেনেন। ইয়াসিন পাগলা। সেই ছোটবেলায় গ্রামে মাঝে মাঝে এই পাগলের আবির্ভাব হতো। ইয়াসিন পাগলা সাত সকালে এই বাড়ির উঠোনে এসে বসে থাকতো, তাদের সাথে গল্প করতো। মনে আছে মা এই পাগলের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করতো, এমনকি সেঁধে সেঁধে খেতেও দিতো। তার মানে কী...

এসব কিছু ভাবতে ভাবতে আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। কাঠের আলমারিটায় এখনো ঘুণে ধরেনি। কয়েকটা তাক আছে। তাকগুলো ফাঁকা। ফাঁকা একটা আলমারির কী প্রয়োজন ছিল এই ঘরে বুঝতে পারলেন না। তবে উপরের তাকের এক কোনায় কালো কিছু একটা চোখে পড়ল। হাত বাড়িয়ে জিনিসটা বের করলেন। একটা নোটবইয়ের মতো লাগছে। উপরে ধূলোর আস্তরণ পড়েছে।

নোটবইটা খুলতেই দেখলেন কালো কালিতে ইংরেজিতে অনেক কিছু লেখা। হ্যারিকেনের আলোয় পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল না কিছু। দিনের আলোয় পড়তে হবে।

নোটবইটা হাতে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। দরজায় তালা লাগালেন। কাল সকালেই ঢাকা ফিরবেন। এই নোটবুকটায় বাবার ফেলে আসা জীবনের অনেক কিছুই জানা যাবে মনে হচ্ছে।

অধ্যায় ৭

জমির ম্যাজিশিয়ান হাবিজাবি ম্যাজিশিয়ান না। সে রাস্তার পাশে 'শো' করে যৌনরোগের ওষুধ বিক্রি করে না, কিংবা তাবিজ-কবজ, ঝাড়ফুঁক করে না। তার এখানে অল্প কিছু ম্যাজিকই শুধু দেখানো হয়। এর বদলে দর্শকরা খুশি হয়ে যে যায় দেয়, তাতেই সে খুশি। টাকা বেশি পেলে সুবিধা হতো। জাদু দেখাতে অনেক উপকরন লাগে। সেসব উপকরন জোগাড় করা বেশ কঠিন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজের হাতে বানিয়ে নিতে হয়। জমিরের অবশ্য বেশি উপকরন লাগে না। রাস্তার পাশে 'শো' করে বলে যতো অল্প উপকরন নেয়া যায় ততোই সুবিধা। একটা ভ্যান ভাড়া করলেই তার হয়ে যায়।

আজ বৃহস্পতিবার। শাপলা চত্বরের এই পাশটায় নিজের জন্য একটা জায়গা করে নিয়েছে জমির ম্যাজিশিয়ান। একটা ছোট টেবিল বিছিয়েছে। টেবিলের ওপর জাদু দেখানোর অল্প কিছু সরঞ্জাম। মাটিতে চাদর পেতে দিয়েছে দর্শকরা যাতে টাকা-পয়সা ছুঁড়ে মারতে পারে। অফিস এখনো ছুটি হয়নি। তবে এরমধ্যেই লোকজন দাঁড়াতে শুরু করেছে। অল্প লোকের মাঝে এসব দেখিয়ে আনন্দ নেই। চারপাশ উপচে পড়া ভিড় থাকলেই মজা।

অল্প কিছু দর্শক যেহেতু আছে, তাই ছোটখাট ম্যাজিক দিয়ে শুরু করা যায়। নাহলে এরা চলে যাবে। তার হাতে টিনের চোঙার একটা মাইক। মাইক দিয়ে কথা বলার আগে একপাশে দাঁড়ানো সালামকে দেখে নিলো। ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের সংকটে আছে। লোক বাড়লে ওর আত্মবিশ্বাস আরো কমবে তাতে সন্দেহ নেই।

মনে আছে প্রথমবার জনসমক্ষে জাদু দেখানোর আগে গুরুর পরামর্শমতো পাগলা পানি খেয়ে নিয়েছিল। দেশি জিনিস, কাজ করেছে খুব দ্রুত। নার্ভাসনেস কী জিনিস টেরই পায়নি। হাত একদম কাঁপেনি, কথাবার্তায়ও কোন জড়তা ছিল না। তাই শুরুর শো'টাই ছিল একদম বাজিমাত। গুরু সেদিন খুব প্রশংসা করেছিলেন। নিজের অতীতের কথা চিন্তা বাদ দিয়ে সামনের দর্শকদের দিকে মনোযোগ দিলো জমির। চাইলে

কথা দিয়ে ওদের আরো আধঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবে। সে কথার রাজা। ম্যাজিশিয়ানদের কথার রাজা হতে হয়। কিন্তু সেসব না করে জমির প্যান্টের পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বের করলো।

অভ্যস্ত হাতে তাসগুলোকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো। এবার খেলা দেখানো শুরু করা যাক।

'ভাইসব, আপনেরা আমার হাতে যে তাস দেখছেন, এগুলা সাধারন তাস, কিন্তু বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, এই তাসগুলা দিয়া আমি এমন কিছু আজ দেখাবো যা আপনেরা কোনদিন দেখেন নাই।'

'ভূয়া,' দর্শকের মাঝ থেকে কেউ একজন মৃদু কণ্ঠে বলল।

এ কথা না শোনার ভান করে তাসগুলো নিয়ে আরো বেশ কিছুক্ষণ কসরত করলো জমির। তারপর যে ছেলেটা 'ভূয়া' বলেছিল ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'আগে আমার জাদু দেখেন, ভালো না লাগলে ভূয়া বলবেন, কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু তার আগে কইলে কিন্তু অসুবিধা আছে।'

'কী অসুবিধা?' ছেলেটা বলল। এই ছেলে ঘাড়ত্যাড়া ধরনের। বয়স আঠারো-উনিশ। এই বয়সটা সম্ভবত ঘাড় ত্যাড়ামিরই।

'পুরুষ মানুষের ঐ জিনিস কয়টা থাকে?'

'কোন জিনিস?'

'জিনিসটা হইলো, পটল। পটল থাকে দুইটা। কিন্তু এই ছেলের আছে একটা,' ছেলেটার দিকে হাত দেখিয়ে বলল জমির।

'পটল' শব্দটা দর্শকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। দর্শকরা তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে। এতে বেশ বিব্রতবোধ করলো ছেলেটা। রেগে চোখমুখ লাল হয়ে গেছে মুহূর্তেই।

'আজাইরা কথা কন কেন?' রেগে গিয়ে বলল ছেলেটা।

'বিশ্বাস না হইলে নিজেই হাতাইয়া দেখেন, নাকি দর্শকের মধ্য থাইক্যা কেউ দেখবে?'

ছেলেটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জমিরের দিকে। সে ভাবছিল জমির ফাজলামি করছে, কিন্তু জমিরের চোখ মুখ দেখে বুঝল এটা ঠাট্টা-ফাজলামি না। সত্যি সত্যি জাদুকর বলছে তার অন্ডকোষ একটা।

'আমি হাত দিয়া দেখি?' মাঝারি বয়সের একটা লোক বলল। তাকে

বেশ আগ্রহী মনে হলো।

'আমিই দেখতাছি,' বলল ছেলেটা।

এতোগুলো লোকের সামনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের নিম্নাঙ্গে হাত বুলালো ছেলেটা। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। ছেলেটা নিজের বিস্ময়বোধ লুকাতে পারছে না।

'কিন্তু আমার তো দুইটা ছিল!' আর্তনাদ করে বলল ছেলেটা।

'আরেকটা কী হাওয়ায় মিলাইয়া গেছে, নাকি বাসায় রাইখ্যা আসছেন?'

দর্শকদের মাঝে হাসির রোল পড়ে গেল। ছেলেটা কোনমতে নিম্নাঙ্গ থেকে হাত সরালো।

'কিন্তু...ছেলেটা কিছু বলতে গিয়েও থামলো। বুঝতে পারছে এ বিষয়ে কম কথা বলাই শ্রেয়।

'একটা থাকলেও সমস্যা নাই, এতো চিন্তা করো কেন মিয়া, এইগুলার চিকিৎসা আছে, তাই না?'

ছেলেটা চলে যেতে চাইলে ওর হাত ধরে থামাল জমির।

'এতো সকাল সকাল কই যাইবা। থাকো, থাকলে জিনিস ফেরতও পাইতে পারো।'

জমিরের কথায় কাজ হলো। ছেলেটা হয়তো ভাবলো, তার হারিয়ে যাওয়া জিনিসটা ফিরে আসলেও আসতে পারে।

যাই হোক, এসব টুকটাক জাদু দেখাতে দেখাতে আসর প্রায় জমিয়ে ফেলেছে জমির। লোকজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথা শুনছে। তবে এরমধ্যে তার চোখ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। সে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ আজ বিকেলে এখানে থাকার কথা।

মাঝে মাঝে সালামের দিকেও তাকাচ্ছে। ওর চোখে মুখে কিছুক্ষণ আগে যে অস্বস্তি দেখেছিল সেটা কেটে গেছে দেখে ভালো লাগলো। আজকের সবচেয়ে বিস্ময়কর জাদুটা দেখাবে সালাম। তাতে জমির নিজে সহকারি হিসেবে কাজ করবে। তবে সেটা সবার পরে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে দর্শকদের জানিয়ে রাখতে ভুলছে না যে শেষে দারুন কিছু অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। সেটা কী তা নিয়ে দু'একজন প্রশ্ন করতে চাইলেও কিছুক্ষণ আগে ছেলেটার অন্ডকোষ নিয়ে যা ঘটলো সেরকম কিছুর মুখোমুখি হতে চাইছে না কেউ।

অফিস ছুটি হয়েছে। লোকজন বের হতে শুরু করেছে, বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। তার আগে টুকটাক বাজার সারবে, কোন সহকর্মীর সাথে টি-স্টলে চা খাবে, সিনিয়র কিংবা বসকে নিয়ে সমালোচনায় মেতে উঠবে আর একসময় অল্পক্ষনের জন্য হলেও জমিরের জাদু দেখবে। অনেকদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছে জমির যে এসব অফিসের চাকরির চেয়ে তার কাজটা অনেক সহজ আর আনন্দের।

প্রায় ঘন্টাখানেক পার হওয়ার পর, দর্শকদের একাংশ যখন চলে যাচ্ছে, তখন জমির সালামের নাম ঘোষনা করলো।

'ভাইসাবেরা, এতোক্ষণ আমার হাবিজাবি জাদু দেখলেন। এবার দেখবেন আসল জাদু। কিন্তু এই জাদু আমি দেখামু না। আমার শিষ্য দেখাইবো। কসম কাইটা কইতে পারি, এরকম জিনিস বাপের জন্মে আপনেরা দেখেন নাই।'

জমিরের গ্যারান্টিতে কাজ হলো। দর্শকদের মধ্যে যারা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তারা থেকে গেল। সালামকে হাত ধরে সামনে এনে দাঁড় করালো জমির। ছেলেটার প্রস্তুতি খারাপ ছিল না। এখন এতোগুলো দর্শকের মধ্যে কী করে কে জানে।

সালাম তাকিয়ে আছে দর্শকদের দিকে। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সী ছোঁড়া কী এমন জাদু দেখাবে! সবাই উৎসুক। জমির দেখলো সালাম এখনো কিছু বলছে না। শুরুতেই এরকম নার্ভাস হয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু না। ওকে পাগলা পানি খাইয়ে আনা দরকার ছিল। তাহলে খুব সহজেই নার্ভাসনেস কেটে যেতো।

'সালাম, শুরু কর,' সালামের কানে ফিসফিস করে বলল জমির। ওর হাতে দড়ির টুকরো এগিয়ে দিলো। এই দড়ি দিয়েই জাদু শুরু করার কথা। কিন্তু দড়ি হাতে নিয়েও দাঁড়িয়ে রইল সালাম।

জমির দেখলো লোকটা এসেছে। লম্বা মানুষ। পেছনের সাড়িতে দাঁড়ালেও তার এখান থেকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। ওর উদ্দেশ্যে হাতটা অল্প একটু নাড়াল জমির। লোকটা দেখতে পেয়েছে কিনা বুঝতে পারলো না।

দর্শকরা যখন উশখুশ শুরু করেছে, তখন মুখ খুলল সালাম। তাতেই জমে গেল সবাই।

'এক পাও নড়বেন, তো মরবেন,' সালাম বলল, 'এইখানে যারা যারা আছেন, সবাই সাবধান। দুই হাত মুঠি কইরা রাখেন। মুঠি খুললেই বিপদ।'

জমির তাকিয়ে আছে সালামের দিকে। এসব কী বলছে ছোঁড়া। দড়ির জাদুর সাথে এসবের সম্পর্ক কী! তাকে অবাক করে দিয়ে দড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সালাম।

সালামের হাতে ছোটখাট একটা ছোরা দেখা যাচ্ছে। বিকেলের শেষ আলো পড়ে ছোরাটা চকচক করে উঠেছে। ছোরা দেখে দর্শকদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন শোনা গেল। জমির অবাক হয়ে দেখলো, দর্শকদের সবাই দুই হাত মুঠো করে আছে। কেউ নড়ছে না।

সালাম ছোরা নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করলো। মাঝে মাঝে উপরে ছুঁড়ে দিল। সেটা যখন নীচে নেমে আসছিল, মাটি স্পর্শ করার আগেই ধরে ফেলল। খুব ঝুঁকিপূর্ণ কিছু না, তবে দেখতে ভালো লাগছিল। এবার ছোরা নিয়ে দর্শকদের দিকে এগিয়ে গেল সালাম। মাঝবয়সী একজনের সামনে দাঁড়াল। লোকটাকে হাত ধরে একটু সামনে নিয়ে এলো।

'উনি আমারে সাহায্য করবেন,' সালাম বলল। মাঝবয়সী মানুষটাকে সাহায্য করতে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না। তবে কিছু বললও না। কোন কারনে ভয় পেয়েছে, চেহারায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। জমির অবাক হয়েছে। এখানে তার সাহায্য করার কথা। অন্য কাউকে ডাকল কেন ছেলেটা!

সালাম কী করতে যাচ্ছে এটাই এখনো পরিস্কার হয়নি।

মাঝবয়সী মানুষটাকে দর্শক আর খেলা দেখানোর জায়গার ঠিক মাঝখানে দাঁড় করালো সালাম। তারপর কয়েকপা এগিয়ে সে নিজে দর্শকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। হাতে ছোরা। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দর্শকরা তাকিয়ে আছে। চারদিকে অদ্ভুত এক নিরবতা। হঠাৎ ঘুরে গায়ের সব শক্তি দিয়ে ছোরাটা ছুঁড়ে মারল মাঝবয়সী মানুষটার মুখ বরাবর। সাঁই করে শব্দ হলো।

দর্শকদের সবাই আঁতকে উঠলো। কেউ কেউ চোখ বন্ধ করে ফেলল ভয়ে। জমির নিজেও আঁতকে উঠেছে। মাঝবয়সী লোকটাও। সাঁই করে একটা শব্দ শুনেছে সবাই। কিন্তু ছোরাটা কোথায় গেল সেটা পরিস্কার না।

মাঝবয়সী লোকটার মাথায় আঘাত করার কথা, তা না হলে পেছনে জমির দাঁড়িয়ে আছে তাকে আঘাত করার কথা। সেটাও না হলে আরো একটু পেছনে যে মোটা জাম গাছটা আছে সেখানে আটকে থাকার কথা। কিন্তু সেসব কোথাও ছোরাটা নেই।

'ভয় পাইছেন? আমার নিশানা কিন্তু ছুটে না, কিন্তু এই লোকের উপরে তার বাপ-মায়ের দোয়া আছে, তাই বাঁইচা গেছেন,' সালাম বলল। এতোক্ষণ তার দু'চোখ বন্ধ ছিল, এবার খুলল।

'আপনি ছুরি মারেন নাই, ঐটা আপনের পকেটে আছে,' দর্শকদের মাঝ থেকে মিনমিন করে বলল একজন।

সালাম হাসল। দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। তারা সালামের পকেটে খুঁজে দেখতে চায়।

'এতো অস্থির হইয়েন না,' সালাম বলল। 'ছুরিটা কই গেল এইটা জানতে চান তো?'

'হ,' দর্শকদের মধ্যে বলল কয়েকজন। জমিরও ওদের সাথে একমত। সেও জানতে চায়। যদিও কিছু বলল না।

'দাঁড়ান দেখাই,' বলল সালাম। এগিয়ে গেল মাঝবয়সী লোকটার দিকে। লোকটা হাঁটুগেড়ে বসেছিল। ওকে হাত ধরে দাঁড় করাল সালাম। বোঝাই যাচ্ছে নরম সরম লোক। অল্পতেই ভয় পেয়ে গেছে। ওর প্যান্টের পকেট হাত দিলো সালাম। ডান পাশের পকেট থেকে ধীরে ধীরে চকচকে ছোরাটা বের করে আনলো।

দর্শকরা তালি বাজাল। স্বতস্ফূর্ত এই তালির শব্দে কান পাতা দায়। টাকা, পয়সা ছুঁড়ে মারতে লাগল মাটির ওপর পাতা চাদরের ওপর। যে চাদরটা কিছুক্ষণ আগেও প্রায় ফাঁকা ছিল সেটা ভরে উঠলো একটাকা, দু'টাকা, পাঁচ টাকার নোটে আর কিছু পয়সায়।

মাথা নীচু করে জাত ম্যাজিশিয়ানের মতো দর্শকদের অভিবাদন জানালো সালাম।

দর্শক আরো জাদু দেখতে চায়। একটু আগে যারা বাজারের থলে নিয়ে বাসায় যাওয়ার জন্য তৎপর ছিল, এখন মনে হচ্ছে তাদের হাতে অঢেল সময়। কিন্তু আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি টানতে হচ্ছে জমিরকে। ভিড়ের শেষে দাঁড়ানো লোকটার ইশারা উপেক্ষা করা সম্ভব না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রায়। সব কিছু দ্রুত গুছিয়ে নিলো জমির। সালামকে ঐ লোকটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

বছর দশেক আগের সেই দিনের কথা মনে পড়ল। রাত হয়ে গিয়েছিল। শাহবাগের মোড়ে জাদু দেখিয়ে যখন জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল, এই লোকটা এক কোনায় দাঁড়িয়েছিল। তাকিয়েছিল এক দৃষ্টিতে। সব গোছানো শেষে যখন আশপাশ একদম ফাঁকা তখন এগিয়ে এসেছিল লোকটা।

লম্বা একজন মানুষ, চওড়া কাঁধ। চোখগুলো বড় বড়, লম্বা টানা ভ্রু জোড়া সারাক্ষণ যেন নাচছে। মুখে হাসি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল লোকটা।

'আপনের নাম জমির না?'

'হ। আপনে কে?'

'একই পথের লোক।'

'কোন পথের?'

'এই যে আপনে যে খেলা দেখাইলেন, সেই পথের।'

'তারমানে আপনেও ম্যাজিশিয়ান?'

'হ। কিন্তু আপনের চেয়ে অনেক উঁচা মানের।'

কথাটায় শ্লেষ ছিল। জমির রাগতে গিয়েও রাগেনি। মনে হয়েছিল লোকটা ঠিক কথাই বলেছে। পথে-ঘাটে জাদু দেখানো কেউ তো আর নিজেকে উচ্চ শ্রেনীর বলে নিজেকে দাবি করতে পারেনা।

'আপনে কী জুয়েল আইচের চাইয়াও বড়?'

'তার সাথে আমার কোন মিল নাই। তিনি আলাদা লাইনের। আমি আলাদা।'

'কিন্তু উঁচা কইলেন যে? উনার চে উঁচা ম্যাজিশিয়ান বাংলাদেশে আছে কেউ?'

'জমির মিয়া, বড় বড় জায়গায় জাদু দেখাইলেই যে উঁচা হইবো এমন কোন কথা নাই। তার আর আমার লাইন আলাদা। তিনি নমস্য মানুষ। কিন্তু আমরা তো ঐ লাইনের জাদু করি না। আমরা হইলাম আসল জাদুকর।'

'আসল জাদুকর মানে?'

জমির ম্যাজিশিয়ানের বয়স তখন কিছুটা হলেও কম ছিল, রাগ ছিল

চড়া। কোথাকার কোন লোক এসে নিজেকে নিয়ে খুব বাহাদুরি ফলাচ্ছে এটা তার সহ্য হচ্ছে না।

'জুয়েল সাহেবরা দেখায় নির্দোষ জাদু। ঐটা শুধুই হাতের কারুকাজ। মাইনষের চোখ ফাঁকি দেয়া। কিন্তু আমরা ফাঁকি দেই না।'

'তাইলে কী করেন? সত্যি সত্যি জাদু দেখান? মানুষরে দুইভাগ কইরা সত্যি সত্যি আবার জোড়া লাগাইতে পারবেন?'

'সেইটাও সম্ভব। ওস্তাদ লোকজন পারে।'

'আপনে কী পারেন?'

জমির লক্ষ্য করলো চারপাশে কিছু একটা বদলাচ্ছে। নিজের শরীরের ভারসাম্য রাখতে কষ্ট হচ্ছে। আরো অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো সে কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই মাটি থেকে ফুট খানেক উপরে ভাসছে। বিস্ময়ে চিৎকার করতে গিয়েও করলো না। এ জায়গাটা এখন অন্ধকার বলে কেউ দেখছে না। কিন্তু কেউ দেখে ফেললে হৈচৈ লেগে যাবে।

'আমারে কী আপনে উপরে তুললেন? জাদু কইরা?'

'জাদু ছাড়া কেমনে, আপনেই বলেন?'

জমির এখনো ফুট খানেক উচ্চতায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের নীচটা ফাঁকা। এখানে কোনরকম কারসাজি দেখা যাচ্ছে না। মিনিট পাঁচেক আগে এই লোকের সাথে দেখা। তার আগে একে সে কখনো দেখেনি। কারসাজি করবে কখন?

'আমারে নামান।'

লোকটা আঙুল দিয়ে ইশারা করলো। ধীরে ধীরে নেমে এলো জমির।

'আমার কাছে কী চান?'

'তেমন কিছু না। যদি বিশেষ কিছু নজরে পড়ে আমারে জানাবেন।'

'বিশেষ কিছু কী?'

'যে জিনিস আপনে আশা করেন নাই, তেমন কিছু।'

'কতো কিছুই তো জীবনে আশা করি নাই। কেমনে বুঝমু?'

'আপনি নিজেই বুঝবেন, টের পাইবেন।'

'আপনেরে জানামু ক্যামনে?'

'একটা কালা কাউয়া মারবেন। গলা টিপ্যা মারবেন। আমি খবর পামু।'

জমির আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি। বুঝেছিল সেদিনই এই লোক খুব

সাধারণ কেউ নয়। তবে গত দশ বছরে এমন অনেক বারই হয়েছে যে লোকটাকে খবর দিতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হয়েছে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তবে এবার সালামের জাদু দেখার পর ব্যাপারটা অভাবনীয় মনে হয়েছে বলেই সে খবর পাঠিয়েছে। সাতসকালে কমলাপুর বস্তির কাছের ডাস্টবিনে অনেক কাক থাকে। কাক ধরতে বেশ কষ্ট হয়েছে। গলা টিপে মেরে ফেলতেও খুব অস্বস্তি লেগেছিল, কিন্তু কিছু করার নেই। খবরটা না দিলে হয়তো খারাপ কিছু হতে পারতো।

সালাম এক কোনায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ওকে হাতের ইশারায় ডাকল জমির। লোকটাও এগিয়ে এসেছে। দশ বছর আগে যেমন দেখেছিল, এখনো তেমন লাগছে দেখতে। লোকটার বয়স বাড়েনি মনে হচ্ছে। সে নিজে এই দশ বছরে অনেক বুড়িয়ে গেছে।

'সালাম, উনার সাথে পরিচয় হও, উনি বিখ্যাত জাদুকর,' জমির বলল।

লোকটা এসে সালামের হাত ধরল। সালামকে দেখে বোঝা যাচ্ছে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে।

'তোমার বাপের নাম কী জমশের?'

'হ।'

'মায়ের নাম সাবিহা।'

'হ।'

'তুমি কি জানো, জমশের কে ছিল?'

'ম্যাজিক দেখাইতো। জমির ওস্তাদের মতো।'

লোকটা হাসল হা হা করে। ওর অট্টহাসিতে আশপাশ দিয়ে যাওয়া পথিকেরা ফিরে তাকাল। তবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই লোকটার।

'তোমার বাপে ছিল ওস্তাদ লোক। যাক, তুমি এখন থাইকা আমার লগে থাকবা।'

'না, আমি জমির ওস্তাদের লগে থাকমু।'

'বাহ, বাপের মতোই ঘাড়ত্যাড়া হইছো,' লোকটা বলল, 'আমার নাম শংকর লাল। শংকরের লগে ত্যাড়ামি চলবো না।'

'আমি উনার সাথেই থাকবো।'

'আমি কিন্তু তোমারে জোর কইরা নিয়া যাইতে পারি,' শংকর বলল, 'কিন্তু নিমু না। ওস্তাদের পোলা তুমি। তারচেয়ে আরেকটা কাম করা যায়।'

সালাম আর জমির দুজনেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালো শংকরের দিকে।

'আমিও তোমাগর লগে থাকমু। তাইলে ঝামেলা মিইটা গেল।'

'কিন্তু আমরাই তো কষ্টেমষ্টে থাকি, ছোট একটা ঘর।'

'বড় ঘর ভাড়া লও। ভাড়া আমি দিমু।'

বলে শংকর হাসল।

সালাম দেখল জমির আর কথা বাড়াচ্ছে না। এখানে তার আর কিছু বলার নেই। তবে শংকর লোকটাকে প্রথম দেখায় পছন্দ না হলেও যখন বলল বাবার শিষ্য তখন কিছুটা হলেও মনেহলো, এই পৃথিবীতে তাকে চেনে এরকম আরেকজন মানুষ বাড়ল। মামার বাড়িতে থাকতে মামা-মামী বাবা কিংবা মা'কে নিয়ে কিছুই বলতো না। মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগতো, কান্না এসে যেতো। বাবা-মা'কে নিয়ে ওদের সেই অবহেলা খুব কষ্ট দিতো। বাবাকে খুব খারাপ লোক বলে মনেহতো। মা ছিল চিরদুখি। হয়তো এই শংকর লোকটার কাছ থেকে বাবা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা

যাবে। বাবা কেমন ছিল, জাদু কেমন দেখাতেন, তার জন্ম কোথায়, এসব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার খুব আগ্রহ তার।

সেদিন রাতটা কোনমতে কাটল কমলাপুর বস্তিতে। পরেরদিনই ফকিরেরপুলে দুই রুমের একটা বাসা ভাড়া নিলো জমির। তিনতলা বাড়ির দোতলার একটা ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটটা দুই রুমের। এক রুম শংকরের জন্য, অন্য রুমে সালাম আর সে। একপাশে রান্নাঘর, দুটো বাথরুম। অনেকদিন পর হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমানোর সুযোগ এসেছে। তাই পরপর কয়েকটা রাত ভালো ঘুম হলো সালামের।

তবে সমস্যা হচ্ছে শংকর সবসময় তাকে চোখে চোখে রাখে। ওর সামনে কখনোই জাদু নিয়ে কথা বলে না সালাম, কিংবা জাদু নিয়ে কাজও করে না। বেশ অস্বস্তি হয়। লোকটা খুঁতখুঁতে স্বভাবের। তার কাছে খুটিয়ে খুটিয়ে অনেক কিছু জানতে চায়, কি জানতে চায় নিজেও হয়তো জানে না। সালাম ঘুনাক্ষরেও বলে না তার সেই স্বপ্নের কথা, কালো আলখেল্লাধারী লাঠিওয়ালা সেই লোকটার কথা। কেন জানি মনে হয়, শংকরের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে। বাবার শিষ্য বলে তাকে দেখাশোনা করবে এটা একটা ভাঁওতাবাজি কথা। সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটা কী ধরতে পারছে না।

এখন পর্যন্ত এই বাসা ভাড়া, খাবার-দাবারের খরচ সব শংকরই চালাচ্ছে। তাতে জমির মহাখুশি। জমির বলেছিল শংকর বড় জাদুকর। শংকরের জাদু নাকি অন্য ধরনের। সেই অন্য ধরনের জাদু দেখার জন্য সালাম মুখিয়ে ছিল। আজ সকালে বাসা থেকে জমির যখন বাজার করতে বের হলো, সালাম তখন পড়ার বই পড়ছিল। শংকরের রুম থেকে খুটখাট শব্দ আসছিল। এমনিতে রুমের দরজা লাগানো থাকে। তবে দরজা লাগানো থাকলেও ঠিক মাঝবরাবর ছোট একটা গর্ত আছে। অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও সেখানে চোখ রাখল সালাম। শংকরের প্রথম জাদুটা তখনই দেখল সে। অদ্ভুত, অভাবনীয় ব্যাপারটা লক্ষ্য করে গায়ের লোম সব দাঁড়িয়ে গেল তার।

দৌড়ে নিজের ঘরে চলে এলো। খুব সাবধানে থাকতে হবে। খুব সাবধানে।

অধ্যায় ৮

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তুমুল বৃষ্টি, অন্ধকার, ভেজা মাটি, আপাতত এভাবে বর্ণনা করা যায় চারপাশের পরিবেশকে। এরমধ্যে অন্ধকারে মাঝে মাঝে লোকটা হাওয়া হয়ে যাচ্ছে যেন। আবার ফিরে এসে আক্রমণ করছে। লোকটা যেভাবে তলোয়ার চালাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। হয়তো তাকে সামলানোর জন্যই বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হয়েছে। অন্য কেউ হলে এতোক্ষণে কাবু হয়ে যেতো। তবে মুরশেদ মিয়া এতো সহজ পাত্র নয়। এটা টের পেয়ে লোকটা এখন সাবধান হয়ে গেছে। শুরুতে যে ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণ করছিল, এখন অনেকটাই নিজেকে সামলে নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। দুই হাতে একই গতিতে তলোয়ার চালানো সহজ কথা নয়।

মুরশেদ মিয়া চাইলে লড়াইটা মুহূর্তেই থামাতে পারেন। কিন্তু বয়স হলেও নিজের শারীরিক শক্তির ওপর পুরো আস্থা আছে। আজ অনেকদিন পর নিজের শারীরিক শক্তির ওপর একটা পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে। লোকটা হঠাৎ দুদ্দাড় করে এগিয়ে এলো অন্ধকার ফুঁড়ে। দুই হাতে দু-পাশ দিয়ে তলোয়ার চালালো। একটু অসতর্ক হলেই দুই ভাগ হয়ে এখানে পড়ে থাকতে হতো। তবে মুরশেদ মিয়াও বিদ্যুতগতিতে একপাশে সরে গেলেন। কিরিচটা ফেলে দিলেন হাত থেকে। এই লোককে মেরে ফেলা ঠিক হবে না। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আছে। ঝোলা থেকে সবসময়ের প্রিয় ছোট মোটা লাঠিটা বের করে আনলেন মুরশেদ মিয়া।

লোকটা ভারসাম্য হারিয়েছিল মুরশেদ মিয়া হঠাৎ সরে যাওয়ায়। এই সুযোগ মাথার পেছন দিকে লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন মুরশেদ মিয়া। আঘাত সামলাতে না পেরে কাদাময় মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা। এগিয়ে গিয়ে ওর হাত থেকে তলোয়ারগুলো লাথি দিয়ে সরিয়ে দিলেন মুরশেদ মিয়া। এই লোকটার প্রাণ এখন তার হাতের মুঠোয়। লাঠির মাথায় ধারাল ছুরির ফলা লাগানো আছে। একপাশে বোতাম চাপলেই বের

হয়ে আসবে। লোকটার কপাল বরাবর গেথে দিলেই হবে।

লাঠির মাথা লোকটার ঠিক গলার ওপর রাখলেন মুরশেদ মিয়া।

'তোর নাম পরিচয় বল।'

লোকটা কিছু বলল না। মাথা ফেটে রক্ত বের হয়েছে বেশ। সেই রক্তে মুখমন্ডল অনেকটাই ভেসে গেছে।

'পরিচয় বল, তোরে কে পাঠাইছে?'

এবারও নিরুত্তর লোকটা।

'আমি তোরে কষ্ট দিয়া মারুম। হাত-পা কাটমু, তারপরে চুতড়া পাতা দিয়া সারা শরীর ডলুম। এরপরেও কাম না হইলে, তোর চামড়া ছিইল্যা গাছের লগে লটকাইয়া রাখুম, বুঝলি কিছু?'

এবারও কিছু বলল না লোকটা। বরং হাসল। এরকম মুহূর্তে হাসে অতিরিক্ত সাহসী মানুষ, যার বুকে ভয়-ডর বলতে কিছু নেই। অথবা নিতান্ত বোকা কেউ, যে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারে না। এই লোকটা কোন শ্রেনীতে পরে তা বুঝতে পারছেন না মুরশেদ মিয়া।

রাতের এখনো অনেক বাকি। এখানে রাস্তার মাঝে এই ঝামেলা নিয়ে পড়ে থাকার মানে নেই। লোকটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন মুরশেদ মিয়া। দুই হাত, দুই পা বেঁধেছেন শক্ত করে। নড়াচড়ার কোন সুযোগ নেই। মুখটা খোলা রেখেছেন। ওর কাছ থেকে কিছু তথ্য দরকার। অনেক কাল চুপচাপ ছিল সব কিছু। আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে বিশেষ শক্তি। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারন আছে। ওদের মাথা ভেঙে দেয়া হয়েছিল পনেরো বছর আগে। নিশ্চয়ই নতুন করে কেউ হাল ধরেছে।

কাদামাখা মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে একটা খালের পাড়ে নিয়ে গেলেন মুরশেদ মিয়া। লোকটার পুরো দেহ কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। রক্তে, কাদায় চেহারা চেনা যাচ্ছে না। তবে এতো কিছুর পরও লোকটার চেহারা দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়ানো অনেক মানুষের মুখভঙ্গি দেখার সৌভাগ্য কিংবা দূর্ভাগ্য দুটোই হয়েছে মুরশেদ মিয়ার, কিন্তু তাদের সবার চোখে মুখেই ভয় দেখেছেন। এই লোকটার চেহারায় কিংবা অভিব্যক্তিতে ভয় বলে পৃথিবীতে কিছু আছে বা ছিল বলে মনে হচ্ছে না। তবে এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। জীবহত্যা মহাপাপ হলেও মাঝে মাঝে পৃথিবীতে বাসযোগ্য রাখতে কিছু আগাছা

পরিস্কার করতে হয়।

'আরেকটা সুযোগ দিলাম, বল তোরে কে পাঠাইছে?'

লোকটা এবার হাসল। অন্ধকারে দাঁতগুলো চোখে পড়ল শুধু।

মুরশেদ মিয়া আকাশের দিকে তাকালেন। বিড়বিড় করে কিছু বললেন। তারপর লাঠিটা তুলে নিলেন উপরে। তাক করলেন লোকটার মাথা বরাবর। লাঠির আগায় ছোট ধারাল ছুরির ফলা বেরিয়ে এসেছে।

'দ্যাখ, এখনো সময় আছে।'

'মরতে আমার আপত্তি নাই। আপনেও রেডি থাইকেন। বেশিদিন নাই কিন্তু...

লোকটা কথা শেষ করার সুযোগ পেল না। মুরশেদ মিয়া প্রচণ্ড বেগে লাঠিটা নামিয়ে আনলেন লোকটার মাথা বরাবর। ছুরির ফলাটা ঠিক কপালে বিঁধে গেল। থপ করে একটা শব্দ হলো শুধু।

মৃত মানুষকে বাঁধন দিয়ে আটকে রাখার কোন মানে নেই। লোকটার দেহ থেকে দড়ি খুলে ফেললেন মুরশেদ মিয়া। তারপর খালের পানিতে লাশটা ঠেলে ফেলে দিলেন।

লাঠিটা ঝোলায় ঢুকিয়ে আবার প্রধান সড়কের দিকে এগিয়ে গেলেন মুরশেদ মিয়া। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে বুঝতে পারলেন হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। একটানা লড়াই করে ঘেমে গেছেন। লড়াইয়ে জিতলেও একদম সহজে জিতেছেন বলা যাবে না। পেটের দুই পাশে তলোয়ারের খোঁচা লেগেছে। রক্ত বের হচ্ছে। এতোক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন বলে টের পাননি। এখন ব্যথা হচ্ছে খুব।

এতো রাতে এই রাস্তায় কোন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সকালের আগে যানবাহন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এছাড়া ঢাকা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াও সম্ভব না এই শরীরে। আপাতত নিরাপদ কোন জায়গা দেখে একটু বিশ্রাম নিতে হবে। তারপর রওনা দিতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশে ছোট খাট একটা বাজারের সামনে চলে এসেছেন মুরশেদ মিয়া। টিনের ছাউনি দিয়ে বাঁশ দিয়ে তৈরি করা দোকানগুলো অস্থায়ী, চারপাশ খোলা। এরকম একটা ছাউনিওয়ালা দোকান বেছে নিয়ে মেঝেতে বসে পড়লেন মুরশেদ মিয়া।

চোখ লেগে আসছে ঘুমে। তবে ঘুমানো চলবে না। যে লোক এসেছিল, তার পেছনে আরো কেউ না কেউ আসবে। হয়তো এরমধ্যেই চলে এসেছে,

তার গতিবিধি দেখছে। সাবধান হতে হবে। না হলে মৃত্যু অবধারিত। ঘুমের মধ্যে মৃত্যু মোটেও পছন্দ নয় মুরশেদ মিয়ার। তিনি সহজ মৃত্যু চান না। মৃত্যু হবে লড়াই করে। সেই মৃত্যুর মধ্যে বীরত্ব আছে।

রাত কয়টা বাজে বোঝার কোন উপায় নেই। দূরে কোথাও পেঁচা ডেকে উঠলো। কোনমতে হেলান দিয়ে বসলেন মুরশেদ মিয়া। চোখ বন্ধ করে পুরনো দিনের কথা মনে করার চেষ্টা করছেন। অনেক কিছুই ভাসাভাসা। তবে কিছু স্মৃতি সে কখনোই ভুলবে না। এরকম একটা স্মৃতি আজ রাতে খুব বেশি করে মনে পড়ছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

মুরশেদ মিয়ার বয়স তখন কুড়িও হয়নি। কিন্তু এই বয়সেই সে ছন্নছাড়া রোগে আক্রান্ত। নিজ গ্রাম ভালো লাগে না। গ্রামের লোকজন ভালো লাগে না। মনে হয় জীবন অনেক বড়। এই গ্রামে পড়ে থাকা মানে জীবন এই গ্রামেই শেষ হয়ে যাবে। এই দুনিয়াতে কতো কী দেখার আছে, শোনার আছে। সেসব কিছু না দেখে-শুনে মরে যাবার কোন মানে নেই। তাই মুরশেদ মিয়া মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে। কখনো একা, কখনো সঙ্গি হয় জালাল। জালালের পুরো নাম শাহ জালাল। ময়মনসিংহের অতি বিখ্যাত পীর বংশের সাথে নাকি জালালদের পরিবারের পারিবারিক সম্পর্ক আছে। কথাটা সত্যি না মিথ্যে তা যাচাই করে দেখেনি কেউ।

দুজনে মাঝে মাঝে শেরপুরের শেষ প্রান্তে গারো পাহাড়ের দিকে চলে যায়। সেখানে শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়। এইখানে এসে তারা দুজন তেমন কিছু করে না। ঘুরে বেড়ায়। যেখানে যা পায় খায়। গারোরা এমনিতে চুপচাপ, ঝামেলা করে না। বেশ অতিথিপরায়ণ। সমতল থেকে আসা দুই তরুণকে মাথা গোঁজার ঠাই দিতে তাদের তেমন আপত্তি দেখা যায় না। বরং চলে আসার সময় ওদের কেউ কেউ ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে।

এবার শীত নেমেছে দ্রুত। উনিশশো চল্লিশ সালের শেষের দিক। কোথায় কোন যুদ্ধ লেগেছে, তার হাঁকডাক এই অজ পাড়া গায়ে তেমন একটা পাওয়া যাচ্ছে না। এখানকার শান্তশিষ্ট মানুষজন চাষবাস, গ্রাম্য রাজনীতি, গান-বাজনা এসব নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু তরুণ মুরশেদ মিয়ার মন তখন অন্যদিকে।

পৃথিবীতে কেন যুদ্ধ হচ্ছে, কিসের যুদ্ধ হচ্ছে এ নিয়ে তার দারুন চিন্তা। গ্রামে পত্রপত্রিকা আসে অনেক দেরি করে। সপ্তাহে একদিন হাঁট বসলে রেডিওতে কিছু খবর শোনা যায়। স্বশিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ মুরশেদ মিয়া

কান খাড়া করে রেডিওতে খবরগুলো শোনে। বোঝার চেষ্টা করে। কোথাকার কোন জার্মানরা সারা পৃথিবী দখল করতে নেমেছে এ নিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরের গ্রামে বসে দুশ্চিন্তা করার দরকার না থাকলেও সে দারুন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

এই হিটলার লোকটাকে শায়েস্তা করার জন্য তার হাত নিশপিশ করে। কিন্তু তারপর একসময় ভুলেও যায়। জালাল তার সার্বক্ষণিক বন্ধু। বেশি কথা বলা এই বন্ধুটার একটাই সমস্যা। মুরশেদ মিয়া যা ভাবে বা চিন্তা করে জালাল ভাবে তার উল্টোটা। ফলে দুজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া লাগে আবার খুব দ্রুত সেই ঝগড়া মিটেও যায়।

তবে পূবপাড়ার সখিনার প্রেমে যখন দুজনেই পড়লো একসাথে, তখন এই বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। সখিনা মোড়ল বাড়ির বড় মেয়ে। পর্দানশীন এই মেয়েটা বাড়ির বাইরে পা রাখেনা। কিন্তু কোন এক কালে মক্তবে পড়ার সময় ওকে দেখেছিল মুরশেদ মিয়া। তখনই ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে ওকে বিয়ে করবে। এখন সে বড় হয়েছে। কিন্তু সখিনাকে বিয়ে করা হচ্ছে না। বিয়ে করবে কী সখিনার সাথে কথাও হয়নি কোনদিন। মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখে আপাদমস্তক বোরখায় আবৃত হয়ে সখিনা যাচ্ছে। কখন বোরখার কাপড় তুলে একটু তাকাবে এই আশায় মুরশেদ মিয়া রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। সখিনা ফিরে তাকায় না।

ওকে মনের কথা জানানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে মোড়ল বাড়িতে হাজির হওয়া। সেটা সম্ভব না। মোড়ল বাড়ির প্রধান আলতাফ হোসেনের সাথে তার বাবা আজমল মিয়ার জমিজমা নিয়ে মহা গন্ডগোল। দুজন দুজনের নামে বেশ কিছু মামলা ঠুকে দিয়েছে। সেই মোকদ্দমা লড়তে দুজনকে প্রায়ই ময়মনসিংহ শহরে দৌড়াতে হয়।

যাই হোক, এই দিক থেকে জালাল আছে সুবিধাজনক অবস্থানে। জালালের বাবা স্থানীয় মসজিদের ইমাম, শাহ করিম উদ্দিন। সকলে উনাকে খুব মান্য করে। গ্রামের সালিশ থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজে ইমাম সাহেবের ডাক পড়ে। বাবার সুবাদে জালালের সুনাম আছে এলাকায়। অন্যদিকে মুরশেদ মিয়া ডানপিটেমির কারনে এই বয়সেই দুষ্ট প্রকৃতির তরুণ হিসেবে চিহ্নিত।

সখিনাকে দুজনেই আলাদা আলাদাভাবে পছন্দ করে এবং একজনের সামনে আরেকজন কখনোই তা স্বীকার করে না। এভাবে দিনগুলো ভালোই

চলছিল। কিন্তু সমস্যা হলো ভালো দিন সবসময় থাকে না। জালাল আর মুরশেদ মিয়ার জীবনেও ভালো দিন বেশিদিন রইলো না।

তারা একটা সমস্যায় পড়ল। সমস্যাটায় দুজনে একসাথেই পড়েছিল। সেই দিনটার কথা পরিস্কার মনে আছে মুরশেদ মিয়ার। কার্তিক মাসের শেষে শীত যখন আসি আসি করছে গ্রামে এক লোক এলো। সেদিন হাঁটবারের দিন। হাঁটে অনেক লোকজন। দুপুরের দিকে হাটের এক কোনায় বড়সড় একটা জমায়েত করে ফেলল লোকটা। লোকটার বেশভূষা চমৎকার, দেখতে সুদর্শন। সেই জমায়েতের মধ্যে অনেকের মধ্যে জালাল আর মুরশেদ মিয়াও উপস্থিত ছিল।

জীবনে কোনদিন ভাবেনি কোন লোক কাউকে এতোটা প্রভাবিত করতে পারে। সে একা অবশ্য প্রভাবিত হয়নি। জালালও হয়েছিল।

লোকটার নাম জাহাঙ্গীর। ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা, স্বাস্থ্যও বেশ। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ, গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। বাংলায় কথা বললেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না বাংলা লোকটার মাতৃভাষা নয়। লোকটার সঙ্গে ছিল বেশ কিছু বাক্স-পেটরা, তিন-চারটে লোক, সম্ভবত সহকারি। ফাই-ফরমাশ খাটে এমন। হাঁটের কোণার দিকে দাঁড়িয়ে কথার ফুলঝুড়িতে লোক জমিয়ে ফেলেছে এরমধ্যেই। অতি উৎসাহে একদম প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছে মুরশেদ মিয়া, সাথে জালাল। তার চোখে-মুখেও উৎসাহের কমতি নেই।

জাহাঙ্গীরের কথাগুলোর মানে একটাই। সে নিজেকে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর বলে দাবি করছে। সেই দাবির স্বপক্ষে বেশ কিছু চিত্তচাঞ্চল্যকর জাদুও সে পরিবেশন করবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু জাদু দেখার আগে তার নিজ হাতে তৈরি, গাছগাছড়ার নির্যাস থেকে বানানো ওষুধপত্র কিনতে হবে উপস্থিত জনগনকে এই কথা দিতে হবে। মুরশেদ অবাক হয়ে দেখলো উপস্থিত

প্রায় সবাই হাত তুলল, চিত্তহরনকারী জাদু দেখার জন্য তারা যেকোন কিছু করতে রাজি। বিনোদনহীন এই গ্রামে অনেককাল পর, দারুন একটা বিনোদনকে তারা হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

জাহাঙ্গীরের লোকজন একটা ছোট বাক্স নিয়ে লোকজনের কাছে গেল। মুরশেদ মিয়া আট আনা দিল, জালাল দিল পাঁচ সিকে। বুঝতে অসুবিধা হলো না জাহাঙ্গীরের জাদু দেখার জন্য কতোটা উন্মুখ হয়ে আছে জালাল।

'আপনেরা জানেন, জাদু হইল কুফরি, কিন্তু আমি জাহাঙ্গীর আলম

বলতেছি, জাদু দেখলে কিছু হয় না। যে জাদু কারো ক্ষতি করে না সে জাদু দেখলে অসুবিধা নাই।'

'আপনে বেশি জানেন?' ভিড়ের মধ্য থেকে বলে উঠল একজন, সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এবং বেশিরভাগেরই মুখে বিস্ময়সূচক শব্দ শোনা গেল।

ভদ্রলোক হচ্ছেন স্থানীয় মসজিদের ইমামসাহেব, জনাব শাহ করিম উদ্দিন। নিজের বাবাকে দেখে একটু আড়ালে দাঁড়াল জালাল, ব্যাপারটা মুরশেদ মিয়ার নজর এড়ালো না।

'জাদু মানেই কুফুরি, এইসব জাদু-টোনা এই অঞ্চলে চলবো না,' বেশ কড়াভাবে বললেন শাহ করিম উদ্দিন।

'ভাইসাহেব, আমি যা দেখাবো সেইটা বিনোদন। জাদুটোনা, বানমারা বশীকরণবিদ্যা এইসব না।'

স্থানীয় ছেলেরা জাদু দেখার জন্য বেশ অস্থির হয়ে আছে। শাহ করিম উদ্দিন আর কিছু না বলে চলে গেলেন। তবে যাওয়ার আগে এরপর এইসব জাদুবিদ্যা যে তিনি চলতে দেবেন না তা বিড়বিড় করে বলে গেলেন।

ইমাম সাহেব চলে যাওয়াতে আবার স্বস্তি ফিরে এলো দর্শকদের মাঝে। তারা বিনোদন চায়। অনেকদিন পর কেউ এসেছে সামান্য বিনোদন নিয়ে।

'ভাইসাব, আমি একটা জাদুই দেখাবো আজ,' জাহাঙ্গীর বলল, 'সেইজন্য আপনাদের এলাকার সবচেয়ে সাহসী লোকটাকে প্রয়োজন। এই কাজ সাহস ছাড়া হবে না। আছেন কেউ আপনাদের মধ্যে সাহসী কেউ?'

দর্শকরা এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। কেউ এগিয়ে যাচ্ছিল না বা হাত তুলছিল না। এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে সবার দৃষ্টি মুরশেদ মিয়ার দিকে পড়ল। এভাবে একসাথে এতোগুলো লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে কিছুটা বিব্রতবোধ করলো মুরশেদ মিয়া। এদের কাছে সে সাহসী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সেসব তো সাধারন সাহস। এই জাদুকর তাকে নিয়ে কী না কী করবে কে জানে। তবু সবাই যেহেতু তার দিকে তাকিয়ে আছে তাই নিজের মান রাখতেই এগিয়ে গেল

মুরশেদ মিয়া।

জাহাঙ্গীর আলম এগিয়ে এলো তার দিকে। হাত ধরল। ফিসফিস করে কিছু একটা বলল কানে কানে। কথাগুলো বুঝল না মুরশেদ মিয়া। বাংলা ভাষায় কিছু বলেনি এটা নিশ্চিত। আরবী বলেছিল? এতোদিন পর তা আর মনে নেই। তবে লোকটা ফিসফিস করে কথাগুলো বলার পরই তেমন কিছু

আর মনে নেই। সব ঝাপসা হয়ে উঠেছিল কিছুক্ষণের জন্য। অন্তত আধঘন্টা সময় কিভাবে পার হয়েছিল কিছুই মনে নেই। শেষটুকু মনে আছে, যখন দর্শকরা পাগলের মতো হাততালি দিচ্ছিল।

তবে জালালের কাছে পরে যা শুনেছে সেটা গায়ের লোম খাড়া করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সে নাকি জাহাঙ্গীর জাদুকরের কথামতো বেশ কিছু অসম্ভব কাজ করেছে। এরমধ্যে প্রথমটা ছিল আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। দ্বিতীয়টা ছিল আস্ত একটা তলোয়ার মুখ দিয়ে পুরোটা ঢুকিয়ে বের করে আনা। শেষেরটা সবচেয়ে লোমহর্ষক। সে বাম হাতের তালুর মধ্যে দিয়ে ধারাল একটা চাকু বসিয়ে দিয়েছিল। চাকুটা হাতের তালু এফোঁড়ওফোঁড় করে চলে যায়। কিন্তু তার চেহারায় যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র ছাপ পড়েনি। এমনকি হাত থেকে তেমন রক্তও বের হয়নি।

জালালের কথা শুনে বাম হাতের তালুর দিকে তাকিয়েছিল মুরশেদ মিয়া। একদম পরিস্কার ঝকঝকে হাত। কাঁটা ছেড়ার কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অথচ একটা চাকু তালুটার এপাশ থেকে ওপাশে চলে গিয়েছিল, সেটা দর্শকদের মধ্য থেকে সবাই দেখেছে।

সে রাতে মুরশেদ মিয়াকে দিয়ে জাদু দেখানোর পর আর কিছু দেখায়নি জাহাঙ্গীর আলম। ছোট দুটো তাঁবু টেনে দলবল নিয়ে সেখানেই রাত কাটিয়েছিল। পরদিন সকালেই জাহাঙ্গীর আর দলকে পাওয়া যায়নি। রাতেই নাকি ইমাম শাহ করিম উদ্দিন দলবল নিয়ে এসে শাসিয়ে গিয়েছিল এই অঞ্চলে নাকি জাদু দেখানো চলবে না। দেখালে চরম পরিনতি হতে পারে।

পরদিন সকালেই হাঁটে হাজির হয়েছিল মুরশেদ মিয়া। ইচ্ছে ছিল জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে শুনবে, দেখবে কিভাবে কী করতে হয়। এমনকি সে প্রয়োজনে জাদু শিখবে।

জাহাঙ্গীরকে না পেয়ে দারুন মন খারাপ করে বাড়ির পথ ধরতে গিয়ে মনে হলো, কাল রাতে যে সব অসম্ভব কান্ড করেছে তা কিভাবে সম্ভব হয়েছে তা জানা দরকার। সেটা জানে একমাত্র জাহাঙ্গীর জাদুকর।

জাহাঙ্গীর জাদুকরের খোঁজে জীবনে প্রথমবারের মতো ঘরছাড়া হয়েছিল মুরশেদ মিয়া। তার জীবনটা বদলে গিয়েছিল সেখানেই!

অধ্যায় ৯

রাতে প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে সালামের। এখন যে ফ্ল্যাটে উঠেছে তার বারান্দাটা বেশ খোলা। সেই বারান্দায় গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় মনে হয়, ঠিক কোথায় যেন একটা সুর কেটে যাচ্ছে। বাকি আর দশটা ছেলেমেয়ের মতো জীবন হবে না এটা বাবা-মা মারা যাওয়ার পরই বুঝে গিয়েছিল। তাই স্বাভাবিক জীবন না পাবার আক্ষেপ নেই। আক্ষেপ একটাই। নিজেকে পুরোপুরি জানতে না পারা।

কোন একটা অস্বাভাবিকতা আছে তার জীবনে। সেই অস্বাভাবিকতাটা কী এটাই বের করতে পারছে না। রাতের দুঃস্বপ্নগুলোকে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয় না মাঝে মাঝে। মনে হয় ঘটনাগুলো ঘটেছে অথবা ঘটতে চলেছে।

আজকে রাতেও ঘুম ভেঙেছে সালামের। পাশের বিছানায় জমির ম্যাজিশিয়ানের নাক ডাকার মহোৎসব চলছে। ঘুম ভেঙে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। বারবার মনে হচ্ছিল সে এখনো গ্রামে আছে। দরজা খুললেই মামাবাড়ির সেই উঠোন। কিন্তু ইটসিমেন্টের এই শহরে উঠোন বলতে কিছু নেই কোথাও।

গতকাল দুপুরে শংকরের রুমে উঁকি দিয়েছিল। কাজটা ঠিক হয়নি। শংকর বিছানার ওপর বসেছিল। তবে ঠিক বিছানার ওপর নয়। বিছানার গদির অন্তত ফুটখানেক উপরে ভাসছিল। চোখ বন্ধ ছিল শংকরের, হাত দুটো ছড়ানো ছিল দু'পাশে। অদ্ভুত একটা দৃশ্য। মনে হচ্ছিল লোকটার দেহের কোন ওজন নেই।

জাদু নিয়ে খুব বেশি কিছু ভাবেনি কখনো। মনে হয়েছিল দৃষ্টি বিভ্রম, হাতের কারসাজি, দর্শকদের বোকা বানানোই এই বিদ্যার কাজ। কিন্তু শংকরের শুন্যে ভেসে থাকার পেছনে কোন জাদু কাজ করছে সেটা ভেবে পাচ্ছে না। এছাড়া শংকরের জানার কথা নয় সে ঐ দরজার ফুটো দিয়ে তাকাবে।

লোকটাকে এরপর যখনই দেখছে আড়ষ্টবোধ করেছে সালাম। কথা

বলতে গিয়ে মনে হয়েছে এই বুঝি লোকটা প্রশ্ন করবে সে কেন দরজার ফুটো দিয়ে তাকিয়েছিল। কারো গোপন কিছু দেখা উচিত নয় এভাবে।

তবে শংকর ছিল স্বাভাবিক। সবসময়ের মতো হেসে কথা বলেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। এতো স্নেহ কেন তার ওপর এটা বুঝতে পারছে না বলে আরো অস্বস্তি হচ্ছে। মামা বলেছিল স্বার্থ ছাড়া পৃথিবীতে কেউ কিছু করে না। শংকরের আসল স্বার্থ কী সেটা না জানা পর্যন্ত শান্তি লাগছে না।

ঘরে ফিরে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল সালাম। ইদানীং আর রাস্তার কোণায় দাঁড়িয়ে টুকটাক জাদু দেখাতে ভালো লাগছে না। অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করার মতো লাগে ব্যাপারটাকে। এরচেয়ে পড়াশোনা করে অন্য কোন পেশায় যাওয়া ভালো। মৃত পিতা এই বিদ্যার সাথে জড়িত ছিল বলে তাকেও জড়িয়ে পড়তে হবে এমন কোন কথা নেই। ভাগ্যের ফেরে সে ঠিক একই পেশার লোকের সাথে এসে পড়েছে। কিন্তু এখানে থাকতে সে বাধ্য নয়।

মনে মনে বড় একটা সিদ্ধান্ত নিলো সালাম। সকালে খুব তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।

জমির ম্যাজিশিয়ান বের হয়েছে এগারোটার দিকে। সালামকেও সাথে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু সালাম গেল না। বলল শরীর খারাপ লাগছে। প্রতিদিন সালাম সঙ্গ দেয়। একদিন না গেলে এমন কোন ক্ষতি হবে না ভেবে জমিরও আর জোরাজুরি করলো না।

জমির চলে যাওয়ার পর নিজের জিনিসপত্র গোছালো সালাম। অল্প কিছুদিন এসেছে এখানে। জিনিসপত্র তবু কিছু হয়েছে। এরমধ্যে আছে কাপড়-চোপড় আর কিছু পড়ার বই। ছোট একটা ব্যাগে এসব গুছিয়ে এক কোনায় রেখেছে। এখন শুধু মোক্ষম সময়ের অপেক্ষা।

খেয়াল করে দেখেছে একটার দিকে বাসা থেকে বের হয় শংকর। ঘন্টা খানেকের জন্য। এই সময়টা ছাড়া বাকি সময় বাসায়ই থাকে লোকটা। সারাদিন বাসায় বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি চলে আসার কথা। অথচ শংকরের মুখে সবসময় হাসি।

আজও শংকর কখন বের হবে সে অপেক্ষায় আছে সালাম। বিছানায় শুয়ে আছে চোখ বন্ধ করে। তবে তার কান খোলা। দরজা খুলে বাইরে যাওয়ার শব্দের অপেক্ষায় আছে।

ঘড়িতে একটা বাজতে টের পেল শংকর বের হচ্ছে। বাইরে যাওয়ার সময় শংকর বাইরে তালা দিয়ে যায়। এভাবে তাকে বন্দি করে রেখে যাওয়ার কী মানে কে জানে! সে তো এদের পোষা মানুষ নয় কিংবা কেউ তাকে এদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে যায়নি।

শংকর বাইরে থেকে লক করে বের হয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে লোকটার নীচে চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল সালাম। তারপর দ্রুত বিছানা ছাড়ল। ব্যাগটা বের করে কাঁধে ঝুলাল। তারপর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

শংকর লক করে চলে গেছে। কিন্তু লোকটা জানে না সাধারন এইসব লক দিয়ে তাকে আটকে রাখা যাবে না। লক খোলার ব্যাপারে কেউ তাকে কিছু শেখায়নি, কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপার এমনিতেই সালাম টের পায়। ভেতর থেকে দরজার লক খোলা অসম্ভব একটা কাজ কোন জিনিসপত্র ছাড়া। কিন্তু সালাম জানে লকটা সে খুলতে পারবে। এই বিশ্বাসের পেছনে কোন যুক্তি নেই।

তবে যুক্তি দিয়ে তো পৃথিবী চলে না। সালাম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বুজল। হাত রাখল দরজার হাতলে। তার সম্পূর্ণ মনোযোগ দরজার হাতলের ওপর। প্রায় মিনিটখানেক ধরে রাখার পর খুট করে শব্দ হলো একটা। হাতলটা ঘোরাতেই দেখল দরজা খুলে গেছে।

দ্রুত বের হয়ে এলো সালাম। আলতো করে দরজাটা আবার লাগাল। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এলো নীচে।

বাইরে ঝা ঝা রোদ। বাস, প্রাইভেট কার, রিক্সা চলছে যে যার মতো। সালাম জানে না সে কোথায় যাবে। তবে এখানে থাকা যাবে না। শংকর লোকটা যতোই অমায়িক হোক, ওর উদ্দেশ্য ভালো লাগছে না।

হাতে অল্প কিছু টাকা আছে। জমির ম্যাজিশিয়ান এটা সেটা কিনে খাওয়ার জন্য দিতো। সেই টাকাগুলো কখনো খরচ করা হয়নি। আজ কাজে লাগবে। একটা ফাঁকা স্কুটারকে ডাকল হাত ইশারায়।

'কই যাইবেন?'

'মিরপুর দশ।'

'দেড়শ টাকা।'

'চলেন।'

স্কুটারে চড়ে বসল সালাম। ড্রাইভারকে মিরপুর দশের কথা কেন বলল

সে নিজেও জানে না। ওখানে কখনো যায়নি। কাউকে চেনেও না। কিন্তু মাথায় হঠাৎ এই জায়গার নাম মাথায় এলো। মিরপুর দশে যাওয়া যাক। ঢাকায় এক মতিঝিল ছাড়া সবই তার কাছে অপরিচিত। মিরপুরে যাওয়া যে কথা, ধানমন্ডি বা উত্তরায় যাওয়াও একই কথা।

সিএনজি ঝড়ের বেগে চলতে শুরু করেছে। ঢাকায় আসার পর প্রথমবারের মতো নিজেকে খুব স্বাধীন মনে হচ্ছে। সে যে কোন জায়গায় যেতে পারবে, বাঁধা দেয়ার কেউ নেই। জমির ম্যাজিশিয়ান তাকে সাহায্য করেছিল, তাকে বলে আসতে পারলে ভালো লাগতো। তবে শংকর আসার পর থেকে জমিরের ব্যবহারেও বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে সালাম। মনে হয়েছিল লোকটা আগে কিছুটা সহজ-সরল ছিল। কিন্তু ইদানীং বেশ পাল্টে গেছে। সালামকে ঠিক আগের মতো সময় দিতো না। কোন প্রশ্ন করলে সহজে উত্তর দিতো না। কোন কিছু জানতে চাইলেই বলতো শংকরের সাথে কথা বলে জেনে নিতে। কী অদ্ভুত! শংকর তার কে? ওর কাছে জানতে হবে কেন?

কিছুদূর গিয়ে ট্রাফিক জ্যামে পড়ল। এখানে আগে আসেনি কখনো। তবে শেরাটন হোটেল দেখে বুঝল এটা শাহবাগ। স্কুটার জ্যামে দাঁড়িয়ে আছে আর প্রচণ্ড শব্দ করছে। গরমে ঘেমে গিয়েছিল বলে মাথাটা স্কুটার থেকে বের করলো সালাম। পেছনে তাকাতেই দেখল শংকর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

একটা মোটরবাইক নিয়ে ঠিক তার স্কুটারের পেছনেই আছে শংকর। কোন সন্দেহ নেই, শংকর তার পিছু নিয়েছে। এই মোটরবাইক এর আগে কখনোই দেখেনি সালাম। শংকর এটা রাখেই বা কোথায়? অন্তত জমির ম্যাজিশিয়ানের জানার কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে জমির তাকে কিছু বলেনি। শুধু একটা কথা বলেছিল জমির, কথাটা খুব দামী। 'নিজেরেও মাঝে মধ্যে বিশ্বাস করবা না মিয়া। বিশ্বাস করছো তো মরছো।' কেন জানি কথাগুলো খুব ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল সত্যিকারের জীবনে মানুষের ওপর বিশ্বাস করার আগে অবিশ্বাস করতে হবে। তাহলেই হয়তো বিশ্বাস ফিরে পাওয়া যাবে।

মাথাটা দ্রুত ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল সালাম। ড্রাইভারের কাঁধে টোকা দিল।

'চালান তো।'

'সিগ্নেল পড়ছে তো?'

'পড়ুক। আপনি চালান।'

'মামলা করবো। আপনে দিবেন মামলার টেকা?'

'আপনি দ্রুত চালান। মামলা দিলে দেখা যাবে। আমি দেখবো।'

স্কুটার চালক তবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। পনেরো বছরের একজন সদ্য কৈশোর পেরুনো ছেলের কাছ থেকে নির্দেশ পেতে এবং মানতে মোটেও অভ্যস্ত নয় সে।

সালাম বুঝল ধমকে কাজ হবে না।

'আরো পঞ্চাশ বাড়িয়ে দেবো। আপনি চালান।'

পঞ্চাশটা বাড়তি টাকার লোভে হোক বা সামনের ট্রাফিক সিগন্যাল ছেড়ে দেয়ার কারনেই হোক, ড্রাইভার স্কুটার চালু করল।

স্কুটার চালু হতেই মোটরবাইক চালুর আওয়াজ পেল সালাম। বুঝতে পারছে শংকর পিছু নিয়েছে। মোটরবাইক নিয়ে একটা স্কুটারের পেছন পেছনে চলে আসা খুব কঠিন কাজ নয়। শংকরকে ফাঁকি দিয়ে পালানো অসম্ভব একটা কাজ মনে হচ্ছে। স্কুটার চলছে এখন ফার্মগেটের দিকে। বামে বাঁক নিয়ে জাতীয় সংসদের দিকে চলে এলো। মানিক মিয়া এভিনিউ অনেক চওড়া রাস্তা। স্কুটারের ঠিক পাশে পাশে আসছে শংকর। সামনে আরেকটা ট্রাফিক সিগন্যাল। এই মোড়ে স্কুটার থামলেই শংকর এসে ধরবে তাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'ভাই, আপনে বায়ে রেখে দেন,' স্কুটার চালককে বলল সালাম।

'মিরপুর যাইবেন না?'

'না।'

স্কুটারচালক আর কিছু বলল না। বাম দিকে দাঁড় করালো। স্কুটার থেকে নেমে কোনমতে পকেট থেকে দেড়শ টাকা ভাড়া দিলো সালাম। শংকরও মোটরবাইক নিয়ে চলে এসেছে প্রায়।

স্কুটারওয়ালা ভাড়া নেয়ার সাথে সাথে দৌড় দিল সালাম। বাম দিকে একটা গলি ভেতরের দিকে চলে গেছে। এই এলাকা সে চেনে না। কিন্তু খুব সহজে শংকরের হাতে ধরা পড়তে চায় না।

এটা ধানমন্ডি এলাকা। কয়েকটা সাইনবোর্ড পড়ে বুঝল। মোটরবাইক

নিয়ে পেছনে আছে শংকর। লোকটার মুখে চাপা একটা হাসি দেখল সালাম। বুঝতে পারছে তার বোকামি নিয়ে লোকটা হাসছে মনে মনে। ইঁদুর-বেড়াল খেলায় বেড়াল যখন নিশ্চিত জেনে যায় ইঁদুর ধরে পড়বে, তখন মনে হয় এভাবেই হাসে।

তবে সালাম সহজ পাত্র নয়। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে সে পাঁচতলা একটা বাড়ির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। গেটে দারোয়ান নেই। কেউ তাকে আটকাল না। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে এলো। পাঁচতলা সিঁড়ি বাইতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেছে। ছাদ থেকে নীচে তাকিয়ে দেখল শংকর গেটের পাশে মোটরবাইক পার্ক করেছে। গেট দিয়ে ঢুকতে যাবে এইসময় একটা লোক এসে আটকাল। এই লোক এই মাত্রই হয়তো বের হয়েছে কোন ফ্ল্যাট থেকে। কিংবা বাড়িওয়ালা। অচেনা একজনকে দেখে জিজ্ঞেস করছে। হাতের ইশারায় সালামকে দেখাল শংকর। কী বোঝাতে চাইল লোকটাকে বুঝতে পারলো না সালাম। তবে লোকটা শংকরকে ভেতরে ঢুকতে দিতে রাজি নয়।

শংকরকে এভাবে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না এই লোক। কোন না কোনভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে আসবে শংকর। এই ছাদে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ না। ছাদের অন্য প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল সালাম।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো। পাশের বাড়ির ছাদটা খুব বেশি দূরে নয়। একটু পেছনে এসে রেলিং এর কাছাকাছি থেকে জোরে লাফ দিলো। শুন্যে বেশিক্ষণ থাকতে হয়নি। পার্শ্ববর্তী ছাদের কার্ণিশে কোনমতে পা ছুঁইয়ে দিয়েই ভারসাম্য হারাল। তবে দুইহাতে শক্ত করে কার্ণিশের একপ্রান্ত ধরে ফেলতে পারলো বলে পাঁচতলা থেকে নীচে পড়ে গেল না। কোনমতে হাচড়ে-পাচড়ে ছাদে উঠে এলো। এই ছাদ থেকে পাশের বাড়ির ছাদে সহজেই যাওয়া যাবে। একটা পানির ট্যাঙ্কির ছায়ায় দাঁড়াল সালাম। তখনই চোখে পড়ল শংকরকে। যা ভেবেছিল, ঐ লোক শংকরকে আটকাতে পারেনি।

শংকর আশপাশে তাকাতে তাকাতে পাশের বাড়ির ছাদের ওপর দেখল তাকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। তারপর দৌড়ে আসতে লাগল। এক লাফে ঐ ছাদ থেকে সহজেই এই ছাদে চলে আসবে। সালামও দৌড় দিলো। তবে তার গন্তব্য পাশের বাড়ির ছাদ। এবার আর

কার্নিশে নয় সরাসরি ছাদের ওপর গিয়ে পড়ল সালাম। দেখল একটু আগে যে ছাদ থেকে লাফ দিয়েছিল সেই ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে শংকর। প্রস্তুতি নিচ্ছে লাফ দিয়ে এই ছাদে চলে আসার।

ডানপাশের বিল্ডিংটা তিনতলা। পাঁচতলা বাড়ির ছাদ থেকে তিনতলা বাড়ির ছাদে লাফ দিয়ে নামাটা খুব সহজ কাজ হবে না। পা ভাঙার সম্ভাবনা নব্বই ভাগ। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। এভাবে মরে যাওয়ার ঝুকি না নিয়ে শংকরের হাতে ধরা পড়া ভালো। কিন্তু এই মুহূর্তে ঝুকি নিতে ইচ্ছে করছে সালামের। তাই সে লাফ দিলো।

লাফ দিয়েই বুঝল কাজটা ঠিক হয়নি। বেশ বেকায়দাভাবে ছাদ স্পর্শ করলো তার পা দুটো। মনে হচ্ছিল পা দুটো ভেঙে দুই ভাগ হয়ে গেছে। তবু কোনমতে দাঁড়াল। উপরের দিকে তাকাল। শংকর দাঁড়িয়ে আছে। লাফ দিয়ে নীচে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এরমধ্যে আশপাশে কিছু লোকের নজরে এসেছে ওদের কীর্তিকলাপ। দিনে-দুপুরে দুজন মানুষ একে অপরকে ছাদ থেকে ছাদে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়। অল্প বয়সী কিছু ছেলে হৈ চৈ শুরু করেছে। নীচে রাস্তায় লোক জমে গেছে। সবাই ভিড় করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

সালাম বুঝতে পারছে এতো লোক দেখে ঘাবড়ে গেছে শংকর। এতো লোকের মাঝ থেকে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। এছাড়া যেভাবে লোকজন জড়ো হচ্ছে তাতে যেকোন সময় পুলিশ চলে আসতে পারে।

তিনতলা ছাদ থেকে লাফিয়ে এর পাশের দোতলার ছাদে চলে এলো সালাম। শংকর এখনো পাঁচ তলার ছাদ থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে তার কার্যকলাপ। দোতলার ছাদ থেকে সরাসরি নীচের রাস্তায় লাফ দেয়া ছাড়া গতি নেই। এই রাস্তায় এখনো লোকজন ভিড় জমাতে পারেনি। সালাম তাকাচ্ছিল চারপাশে, অন্য কোন পথ আছে কিনা নেমে যাওয়ার তা খুঁজছিল।

এরমধ্যে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার উপরে তাকাল। পাঁচতলার ছাদে শংকরকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেল মুহূর্তের মধ্যে? ডানে তাকাতেই দেখল তিন তলার ছাদে নেমে পড়েছে শংকর। দোতলার ছাদে লাফ দেয়ার

প্রস্তুতি নিচ্ছে। সময় নেই হাতে। যা করার এক্ষুনি করতে হবে। কার্ণিশে এসে দাঁড়াল সালাম।

নীচে রাস্তায় লোকজন ভিড় করতে শুরু করেছে। এরমধ্যে দ্রুতগতিতে খোলা একটা পিক আপ যাচ্ছে। পেছনে অনেকগুলো বস্তা। ভিড় এড়িয়ে দ্রুত এই রাস্তা ছাড়তে পারলে বাঁচে ড্রাইভার। শংকর তিনতলা থেকে দোতলার ছাদে ঝাঁপ দিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো সালাম।

কার্ণিশ থেকে লাফ দিয়ে সোজা পিক আপের পেছনের বস্তার ওপর পড়ল। বস্তাগুলোর সম্ভবত সব্জি জাতীয় কিছু আছে, তাই খুব একটা ব্যথা পেলো না সালাম। এভাবে লাফ দেয়ার দৃশ্য দেখে দর্শকরা হৈহৈ করে উঠল। দোতলার কার্ণিশ থেকে শংকর তাকিয়ে আছে তার দিকে। লোকটার দৃষ্টিতে হতাশা কিংবা রাগ নেই। যেন ধরেই নিয়েছে সালামের এই পালানো সাময়িক। দ্রুত গতিতে পিক আপটা রাস্তা ছেড়ে প্রধান সড়কে উঠল। ড্রাইভার টের পেয়েছে পেছনে কেউ আছে, তবু গাড়ি চালানো থামায়নি।

চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সালাম। ঢাকার আকাশ এতো পরিস্কার আগে খেয়াল করে দেখা হয়নি। কি ঝকঝকে, নীল!

অধ্যায় ১০

জাহাঙ্গীর জাদুকরের সাথে এরপর দেখা হয়েছিল মুরশেদ মিয়ার। কিন্তু সেটা অনেক অনেক দিন পর। সেই স্মৃতি এখনো তরতাজা। কিন্তু এই মুহূর্তে স্মৃতিচারণ করার মতো অবস্থায় নেই মুরশেদ মিয়া।

এই মুহূর্তে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ভালুকার দিকে। সারারাত হেঁটে এতোদূর আসতে পেরেছেন মাত্র। ভোর হয়েছে একটু আগে। ভালুকা বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা চায়ের দোকান খুলেছে সবে মাত্র। চারপাশে এখনো কুয়াশা কাটেনি। চা ওয়ালা মাত্র তার জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। এক কাপ চা পেলে সারা রাতের ক্লান্তি কেটে যেতো। কিন্তু আরো আধঘন্টা লাগবে এই মর্মে চা ওয়ালা মাত্রই সাবধানবানী দিয়েছে।

চায়ের জন্য অপেক্ষা না করে প্রায় খালি দেখে একটা বাসে উঠেছেন মুরশেদ মিয়া। এই বাস কখন ছাড়বে ঠিক নেই। যাত্রী বোঝাই না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ভোরের এই সময়ে যাত্রী কম হওয়ার কথা নয়। ভালুকা থেকে ঢাকা যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। অনেকেই এখান থেকেই ঢাকায় যায় নিয়মিত আবার সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসে।

জানালার কাছে একটা সীট বেছে নিয়েছেন মুরশেদ মিয়া। চোখ বন্ধ করে গতরাতে ঘটে যাওয়া ঘটনা মনে করার চেষ্টা করলেন। এই বয়সে পুরনো দিনের স্মৃতি ঝকঝকে ছবির মতো ভেসে উঠে, কিন্তু এই মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোই মনে পড়তে চায় না।

গতরাতে তার হাতে একজন মানুষ খুন হয়েছে। এ নিয়ে মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। আত্মরক্ষার জন্য খুন করতে তার দ্বিধা নেই। লোকটা তাকে খুন করতে এসেছিল, নিজেই খুন হয়ে গেছে। ব্যাপারটা এমনই সাধারন। অথচ একসময় রক্ত দেখলে ভয় লাগতো। কিন্তু দীর্ঘ জীবনে এতোবার এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে যে, এখন আর কোন কিছুই মনের মধ্যে দাগ কাটেনা।

সবার জীবনের নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য থাকে। সেই অল্প বয়সে সব ছেড়েছুড়ে যখন ঘর থেকে বের হয়েছিলেন মুরশেদ মিয়া তখনো জানা ছিল

না, জীবনটা এতো পাল্টে যাবে। সেই সখিনাকে আর পাওয়া হয়নি। এমনকি সাধারন সংসার জীবনও তার ভাগ্যে লেখা ছিল না। নেই কোন উত্তরাধিকার। তবু নিজের জীবনটা নিয়ে সন্তুষ্ট মুরশেদ মিয়া। তার জীবনটা নিস্তরঙ্গ নদীর মাঝির মতো ছিল না, বরং ছোট একটা নৌকা নিয়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দেয়া নাবিকের মতো দারুন রোমাঞ্চকর ছিল। এই রোমাঞ্চ এখনো মিশে আছে, হয়তো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকবে।

সাড়ে ছয়টার মধ্যে বাস ছেড়ে দিলো। পুরো বাসে খুব বেশি যাত্রী হয়নি। জানালার কাছে মাথাটা হেলান দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করলেন মুরশেদ মিয়া। ঢাকায় পৌছে অনেক কাজ আছে। ঘুম হবে না। ঢাকায় পৌছানো পর্যন্ত যতোটুকু সম্ভব ঘুমিয়ে নেয়া যাক।

রাজাবাজার এলাকাটা ফার্মগেটের কাছে। দশটা নাগাদ নিজেকে ফার্মগেটের দারুন ভিড়ে নিজেকে আবিষ্কার করলেন মুরশেদ মিয়া। পিপড়ের মতো গাড়ি চলছে, সাথে শশব্যস্ত মানুষ। কেউ কাউকে পরোয়া করছে না, ধাক্কা দিয়ে এদিক-সেদিক চলে যাচ্ছে। সিনেমা হলের পাশের রাস্তা থেকে একটা রিক্সা নিয়েছেন মুরশেদ মিয়া। মাসখানেক পর ঢাকায় এসে মনে হলো শহরটা দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে। এ ক'দিনেই যেন চারপাশ জুড়ে নতুন শত শত সাইনবোর্ড আর বিজ্ঞাপন লাগানো হয়ে গেছে।

ঝোলাটা খুব সাবধানে কোলের ওপর রেখে পায়ের ওপর পা তুলে রিক্সায় বসেছেন মুরশেদ মিয়া। এদিকে রাস্তায় ভিড় নেই তেমন। হাজি সাহেবের বাড়ির সামনে যেতে হবে বলতেই রিক্সাওয়ালা চিনতে পেরেছে। দশ মিনিটেই তিনতলা বাড়িটার সামনে এসে হাজির হলেন মুরশেদ মিয়া।

বাড়িওয়ালা মনজুর রহমান বাসার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে রিক্সা থেকে নামতে দেখে প্রায় দৌড়ে সামনে এলো।

'স্লামালেকুম, আপনি আসবেন আমারে জানাইবেন না? তাইলে মহাখালি গিয়া আপনেরে নিয়া আসতাম।'

রিক্সা ভাড়া মিটিয়ে মুরশেদ মিয়া মনজুরের দিকে তাকালেন। আগে জানালে মনজুর সত্যিই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো মহাখালি বাসস্ট্যান্ডে। কিন্তু অহেতুক কাউকে হয়রানি করাতে রাজি নন তিনি।

'আছো কেমন?'

'আপনের দোয়ায় ভালোই আছি,' দাঁত বের করে হাসল মনজুর.

'মালসামানা নাই?'

'তুমি জানো না আমি ব্যাগ-বোচকা লইয়া ঘুরি না,' মুরশেদ মিয়া বললেন।

'হ, তাই তো। ভিতরে আসেন।'

মনজুর রহমানের পেছন পেছন গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তিনতলা বাড়িটার সামনে অল্প একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে মনজুরের বৌ শখ করে শাক-সব্জি বোনে। শীত আসছে। শীতকালীন সীম, টমেটো এসব এখান থেকেই পাওয়া যাবে।

ছোট উঠোনটায় দাঁড়িয়ে বড় করে নিশ্বাস নিলেন মুরশেদ মিয়া। চারপাশ উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা একটু পুরনো ধরনের। মনজুর রহমানের বাবা মফিজুর রহমান অনেক কষ্ট করে বাড়িটা বানিয়েছিলেন, সেটাও প্রায় পনেরো-ষোল বছর হয়ে গেল। ভদ্রলোক মুরশেদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তিনি জীবিত থাকতেই তিনতলাটা মুরশেদ মিয়ার ব্যবহারের জন্য দিয়ে যান। ছেলেকে বলে গিয়েছিলেন, মুরশেদের যতোদিন দরকার ততোদিন ঐ তিনতলাটা ব্যবহার করতে পারবে। এমনকি এজন্য মনজুর কোনদিন তার কাছে ভাড়াও চাইতে পারবে না। মনজুর রহমান তার কাছে ভাড়া চায়নি কোনদিন, কিন্তু মুরশেদ মিয়া কারো কাছে ঋনী থাকতে রাজি না। তাই নিজেই আশপাশের বাড়িওয়ালাদের কাছ থেকে শুনে নিয়েছে কেমন ভাড়া হতে পারে, সে হিসেবে জোর করে মনজুরের হাতে টাকা গুজে দেন। মনজুর গাইগুই করে, কিন্তু মুরশেদ মিয়াও নাছোড়বান্দা, না নিয়ে উপায় থাকে না।

ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে এলেন মুরশেদ মিয়া। দরজার সামনে দাঁড়ালেন। ভারি একটা তালা ঝুলছে। কোমরে গুজে রাখা চাবি বের করে তালাটা খুললেন। ঘরে ঢোকার আগে কিছু নিয়ম পালন করতে হয়। পশ্চিমে মুখ করে বিড় বিড় করে কিছু একটা বললেন। তারপর ছোট একটা ছুরি বের করে ডান হাতের তালুতে খোঁচা দিয়ে রক্ত বের করে আনলেন কয়েক ফোঁটা। সেই রক্ত ছিটিয়ে দিলেন ঘরের প্রবেশমুখে। বাইরে ঝকঝকে রোদ থাকলেও এখানে তার ছিটেফোঁটাও আসে না। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে প্রায় আবছা অন্ধকারে ঘরে পা রাখলেন মুরশেদ মিয়া।

তিনতলায় মোট চারটা রুম। এরমধ্যে এই রুমটাই তার থাকার জায়গা। ভেতরের রুমগুলো সবগুলোয় তালা দেয়া। ওসব রুমে গত পনেরো বছরে কেউ কখনো ঢোকেনি। ঢুকবেও না। ডানদিকের দেয়ালে হাত দিয়ে বাতি জ্বালালেন মুরশেদ মিয়া। বেশ বড় একটা রুম। নীচতলায় এই রুমটা ড্রইং রুম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সেখানে অনেক আসবারপত্র থাকে। কিন্তু তার এই রুমে তেমন কিছু নেই। একপাশে একটা খাট আর একটা আলমারি। জাগতিক জিনিসপত্রের ওপর অধিকার যতো কম রাখা যায় ততই মঙ্গল।

জানালাগুলো বন্ধ থাকে, তবু রুমের মেঝে, বিছানা আর আলমারীর ওপর ধুলার স্তর জমেছে। একপাশে গিয়ে জানালা খুলে দিলেন মুরশেদ মিয়া। রোদ আর বাতাসের একসাথে হঠাৎ আগমনে পুরো রুমটাই যেন পাল্টে গেল। একটু আগের আবছা অন্ধকারের কোন চিহ্ন নেই। চারপাশ আলোয় ঝলমল করছে।

বিছানায় বসে একপাশে ঝোলাটা রাখলেন মুরশেদ মিয়া। মাসের নির্দিষ্ট এই সময়টা তাকে এখানে কাটাতে হয়। এর ব্যতয় হবার কোন সুযোগ নেই। গত পনেরো বছর ধরে একই নিয়মে চলছে।

বিছানায় হেলান দিয়ে বসে পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সিগারেটে তার প্রবল অনাসক্তি। কিন্তু মাঝে মাঝে সিগারেট হাতে নিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগে, বিশেষ করে দুশ্চিন্তার সময়গুলোতে।

এই মুহূর্তে তাকে দেখে কেউ বলবে না তিনি কোন দুশ্চিন্তায় আছেন, জাগতিক দুখ-কষ্টের ছাপ তার চেহারায় পড়ে না কখনো। দীর্ঘ পথ চলায় সব কিছু দেখার আর সহ্য করার শক্তি জন্মে গেছে। গত পনেরো বছর পর এই প্রথম দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সব কিছু আবার নতুন করে শুরু হতে যাচ্ছে কিংবা শুরু হয়ে গেছে। গত রাতের আক্রমনটাই তার প্রমান।

ছোট একটা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। ওর নাম কাশেম। মনজুর রহমানের বাসার ফুটফরমাশ খাটে। চটপটে একটা ছেলে। ওকে বলা আছে হুট করে যেন ঘরে পা না রাখে। কাশেম কথাটা মনে রেখেছে দেখে মনে মনে খুশি হলেন মুরশেদ মিয়া।

কাশেমের হাতে ছোট একটা ট্রে। সেই ট্রে-তে কিছু খাবার দাবার সাজানো। কমলা, চানাচুর, এক কাপ চা আর অল্প কয়েকটা বিস্কিট।

মনজুরের স্ত্রী রোখসানা পাঠিয়েছে। মেয়েটা খুব লক্ষী। এখানে যে কয়দিন থাকা হয় খাবার নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবতে হয় না মুরশেদ মিয়াকে।

হাত ইশারায় কাশেমকে ভেতরে ঢুকতে বললেন। কাশেম কোন কারনে এই রুমে ঢুকতে অস্বস্তিবোধ করে, এটা আগেও চোখে পড়েছে। ইতস্তত ভঙ্গীতে কাশেম ঢুকল। চেহারায় ফ্যাকাশে হাসি। হাতের ট্রে-টা অল্প অল্প কাপছে এটা মুরশেদ মিয়ার দৃষ্টি এড়াল না।

বিছানার ফাঁকা অংশে ট্রে-টা রেখে এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল কাশেম। ধোঁয়া উঠা চায়ের কাপ তুলে নিতে নিতে হাসলেন মুরশেদ মিয়া। সবাই তাকে ভয় পায়, কেন? সে কারো সাথে রেখে কথা বলে না কখনো, তাহলে?

হয়তো তাকে দেখতেই তেমন দেখা যায়, বদরাগি, খারাপ একজন মানুষের মতো। অনেকদিন আয়নায় চেহারা দেখা হয় না বলে জানা নেই আসলেই তাকে কেমন দেখায়। নিজের সম্পর্কে মুরশেদ মিয়াও খুব বেশি উচ্চ ধারনা পোষন করেন না। ভাবেন, সত্তুর বছর বয়সে শারীরিকভাবে এখনো টিকে আছেন এই তো অনেক।

চা খেয়ে কাজে নামতে হবে। মাসখানেক বিরতিতে ছোটখাট অনেক কাজ জমে গেছে।

দুপুরের দিকে খাওয়া এলো। এবার রোখসানা নিজে নিয়ে এলো। বছর পাঁচেক হলো এই বাড়িতে বউ হয়ে এসেছে। তারপর থেকে ওর যত্নে কোনদিন ঘাটতি চোখে পড়েনি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রোখসানাকে হাত ইশারায় ভেতরে ডাকলেন মুরশেদ মিয়া। ডাইনিং টেবিল নেই। বিছানার ওপর পুরনো খবরের কাগজ পেতেই কাজ সারতে হয়। রোখসানা খুব যত্নে খাবার বেড়ে দিল। মুরশেদ মিয়াও সময়ক্ষেপন না করে খাওয়ায় মনোযোগী হলেন। যতোক্ষণ খেলেন চুপচাপ পাশে বসে দেখল রোখসানা।

'চাচাজি, আপনে একলা থাকেন, বিয়াশাদি করেন নাই, এই ভুলটা করলেন কেন?' রোখসানা প্রশ্ন করলো। এই প্রশ্ন রোখসানা আগেও করেছিল। সম্ভবত ভুলে গেছে। মুরশেদ মিয়া ওর মুখের দিকে তাকালেন। সহজ সরল একটা মুখ। কোন জটিলতা নেই। তিনি চেহারা পড়তে পারেন। এই চেহারা দেখে বোঝা যায় মেয়েটা অনেক দুঃখী। ওর দুঃখটা

কোথায় সেটাও অজানা নয়।

'মা, সবার জীবন একরকম হইলো দুনিয়া চলবে না। এই দুনিয়াতে আমার মতো বান্দারও দরকার আছে। বুঝলা?'

'কিন্তু, তবু। এই বয়সে শরীর খারাপ হইলে আপনেরে দেখবো কে? আপনে তো ঢাকায়ও থাকেন না যে আপনের সেবা করবো।'

'চিন্তা কইরো না,' মুরশেদ মিয়া বললেন, 'আমি অসুখে পড়ি না সহজে। আর পড়লে তুমি তো আছোই।'

রোখসানা হাসল। এই লোকটার প্রতি অদ্ভুত এক মায়া অনুভব করে সে। ছোটবেলায় পিতৃহীন হওয়ার পর এই প্রথম লোক যাকে দেখে নিজের বাবার কথা মনে পড়ে।

'এই তিনতলাটা পরিস্কার করা দরকার,' রোখসানা বলল, 'এই রুমেই আপনে থাকেন। ভেতরের রুমগুলা তো সব তালা মারা। এর কারন কী?'

'আমার একটা রুমই তো যথেষ্ট।'

'তা ঠিক, কিন্তু গত কিছুদিন ধইরা একটা সমস্যা দেখছি।'

'কী সমস্যা?'

'রাইতে মনে হয় কে যেন হাঁটে। আমি তো দুইতলায় ডাইন দিকের ঘরে ঘুমাই। পরিস্কার টের পাই, কে যেন হাঁটে।'

'কে হাঁটবে? আমি না থাকলে এইখানে তালা দেওয়া থাকে।'

'উনারেও কইছি। উনি হাসে। বলে আমার মাথা খারাপ হইছে।'

'তুমি রাইতে বাইরে যাইবা না বেশি। জ্বিন-ভূতে আছর করতে পারে।'

মুরশেদ মিয়া দ্রুত খাবার শেষ করলেন। রোখসানার সাথে কথাবার্তা চলতে থাকলে সেটা আর সহজে শেষ হতে চায় না। বেসিনে হাত ধুয়ে এসে দেখলেন মেয়েটা বাসন-পত্র নিয়ে চলে গেছে। তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

খাবারের পর দীর্ঘ একটা ঘুমের প্রস্তুতি নিলেন। অনেক পরিশ্রম গতকাল থেকে। বিছানায় শুতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন তিনি। অনেকদিন পর স্বপ্নে দেখলেন তাকে। সেই একই মুখ। ঘুম থেকে ঘেমে-নেয়ে উঠলেন সন্ধ্যার দিকে। বিছানায় বসে সেই চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করলেন। মনে পড়লো অনেক অনেক বছর আগের কথা।

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের দিকে তাঁর বয়স সবে বাইশ। গায়ে অনেক

জোর। গ্রাম থেকে পালিয়ে চলে আসার পর দুই বছর পার হয়েছে। এই দুই বছরে নিজের মাঝে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে তরুণ মুরশেদ মিয়া। বিশেষ করে এখন সে আগের তুলনায় অনেক ধীরস্থির। দুই বছরে চুল-দাড়ি কাটা হয়নি বলে মুখে ঘন দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল। মাথার চুল কাঁধ ছাড়িয়েছে। পরনে ধূতি, উর্ধাংগ খালি। মুসলমানের ছেলে তাই ধূতি পরার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু এখন আর অসুবিধা হয় না।

শরীরিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী এখন সে। ভোরবেলা উঠে কমপক্ষে তিন মাইল দৌড়ায়। তারপর দক্ষিনের জাম গাছের তলায় শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ। এই সময়টা চোখ বুজে ভাবে। মাথায় অনেক কিছু আসে। জগত-সংসার, জীবন-মৃত্যুর মতো কঠিন সব কিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা হয়। চিন্তাভাবনার ফলাফল হয় শুন্য।

এই জায়গাটার নাম কেন্দুং। ছোট একটা গ্রাম। অল্প কিছু লোকজন। আদিবাসি। কুকি। নিজের এলাকা থেকে এতোদূরে কিভাবে কিভাবে যেন চলে এসেছে মুরশেদ মিয়া, তা নিজেও জানে না। জাহাঙ্গীর জাদুকরকে খুঁজতে গিয়ে সিলেট পার হয়ে চলে এসেছে আরো ভেতরে। যতো গহীনে এসেছে, ততো অবাক হয়েছে লোকজন দেখে। এদিকে বেশিরভাগই লোকজনই সমতলের মানুষদের মতো নয়। আদিবাসিদের সংখ্যাই বেশি। প্রাকৃতিক দিক থেকে এদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। ইচ্ছে ছিল হিমালয়ের দিকে যাওয়ার। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে আদিবাসিদের অঞ্চলের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে একসময় কখন নাগাল্যান্ডের এই জনমানবহীন অঞ্চলে চলে এসেছে। এখানে তার থাকার জন্য ছোট একটা কুঁড়েঘর দিয়েছে গ্রাম সর্দার। কুঁড়েঘরটা গ্রামের একদম শেষ প্রান্তে। মাসতিনেক হলো এখানে থাকতে থাকতে শহর কিংবা নিজের গ্রামের কথা ভুলতে বসেছে মুরশেদ মিয়া। এই কুঁড়েঘরের আশপাশে কেউ আসে না। কোন এক কালে এখানে এক সাধক বাস করতো। সেই সাধকের অদ্ভুত সব ক্ষমতা ছিল। এসব কুকিদের মধ্যে একজন টুকটাক বাংলা বলতে পারে, ওর কাছে শুনেছে।

লোকটা নাকি ছড়ার পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারতো, চাইলে সবচেয়ে উঁচু ডাল থেকে পেড়ে আনতো ফুলমূল। এজন্য গাছ বাইতে হতো না। শুন্যে ভেসে উঠতে পারতো যখন তখন। বছর কুড়ি আগে একরাতে

সেই সাধক হঠাৎ করে নেই হয়ে গেল। কোথায় গেল, কেন গেল এটা কেউ বলতে পারে না। তবে জঙ্গলের গহীনে কেউ কেউ সেই সাধককে দেখেছে বলে জানিয়েছে। তবে বেশিরভাগই কুকিরই ধারনা লোকটা কোথাও ধ্যানে বসেছে, যেকোন সময় আবার চলে আসবে। ওদের এসব কথাগুলোকে গল্পই ভাবে মুরশেদ মিয়া। সে কোনদিন চলে গেলে তাকে নিয়েও হয়তো এরকম মুখরোচক গল্প বানাবে।

গত কিছুদিন ধরেই মুরশেদ মিয়ার মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীতে সবাই কোন না কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসে। উদ্দেশ্যহীন জীবন কোন জীবন নয়। সে নিজেও কোন উদ্দেশ্যে এসেছে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটা কী এখনো খুঁজে বের করতে পারেনি। একসময় মনে হয়েছিল, জাহাঙ্গীর জাদুকরের কাছ থেকে জাদুবিদ্যার ওপর তালিম নিতে পারলেই তার জীবনের সব সাধ পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষকে সামান্য বিনোদন দেয়ার জন্য তার জন্ম নয়। তার জন্মের পেছনে আরো বড় কোন উদ্দেশ্য আছে। এসব ভাবতে ভাবতে জীবনের প্রতি মাঝে মাঝে বিতৃষ্ণা চলে আসে। ইচ্ছে করে উঁচু কোন পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যেতে। কিন্তু পরক্ষনেই মনে হয়, হয়তো এখনো সময় আসেনি। যখন সময় হবে জীবন তার উদ্দেশ্য নিয়ে হাজির হয়ে যাবে।

ঠিক সেরকম পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে করতে একদিন পরিস্থিতি চলেই এলো।

কুকিদের সর্দার, কো জোরামথাঙ্গা খুবই অতিথিপরায়ণ মানুষ। ছোট গ্রামটা কো'র নিয়ন্ত্রণে। এখানে তার সিদ্ধান্তই সব। গ্রামের সবাই খ্রিষ্টান হলেও আচার-অনুষ্ঠানে এখনো আদি কুকি রীতিতে চলে। খাওয়া-দাওয়া কিংবা অন্যান্য সব কিছুতেই কুকিরা নিজেদের ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেয়নি। শহর থেকে অনেক দূরে হওয়ায়, এখানকার মানুষদের তাদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় ওঝার ওপরই নির্ভর করতে হয়। ঘটনার দিন, সকাল সকাল জানা গেল কুকি সর্দার কো'র একমাত্র মেয়েটা অসুস্থ। অন্যান্য দিন সকাল সকাল নাস্তা সেরে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসে থাকে মুরশেদ মিয়া। কিন্তু এ দিন সে গ্রামেই ছিল। জানা গেল গ্রামের একমাত্র ওঝা চোখুঙ্গাও হাল ছেড়ে দিয়েছে আর শহরে নিয়ে যাওয়ার মতো সময়ও হাতে নেই, খুব খারাপ লাগছিল মুরশেদ মিয়ার।

পুরো গ্রামের লোকজনের চোখ-মুখ থমথম করছিল। উঠোনের একপাশে মুখ গোমড়া করে বসেছিল কো জোরামথাঙ্গা। মুরশেদ মিয়া উঠোনে পা রাখতে সে একবার শুধু মুখ তুলে তাকাল। কুঁড়েঘরের ভেতরে সরাসরি ঢোকার অনুমতি নেই। ভেতর থেকে এরমধ্যেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মুরশেদ মিয়া ইশারায় একজনকে বলল যেন মেয়েটাকে বাইরে নিয়ে আসে। শুরুতে রাজি না হলেও মেয়েটাকে উঠোনে নিয়ে আসা হলো। শুকনো মাটির ওপর শুইয়ে রাখা ছোট

মেয়েটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। মেয়েটার কী হয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

সারা গ্রামের লোক এসে ভিড় করেছিল। মুরশেদ মিয়া দুপুরের দিকে চলে এসেছিল কুঁড়েঘরে। সামান্য কিছু খেয়ে অসময়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এরকম অদ্ভুত ঘুম এরপর আর কখনো ঘুমায়নি। ঘুমটা পুরোপুরি ঘুম ছিল না। মনে হচ্ছিল আধো ঘুম আর তন্দ্রায় সে অন্য কোন জগতে চলে এসেছে। কুঁড়েঘরের সামনের ছোট উঠোনটায় দাঁড়িয়ে দেখছে সন্ধ্যার আকাশে মিটমিট করা তারাগুলো। এই সময় একটা ছায়া ছায়া অবয়ব ভাসতে ভাসতে এলো তার সামনে। অদ্ভুত সেই অবয়বের দেহ কাঠামো মানুষের মতোই, কিন্তু সেখানে কোন নাক-কান, চোখ-মুখ নেই। অথচ কী অদ্ভুত ভাবেই তার সাথে যোগাযোগ করছে।

অবয়বটার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরতে মুরশেদ মিয়া বুঝে গিয়েছিল কী করতে হবে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখেছিল সে কুঁড়েঘরেই শুয়ে আছে এবং তখনও সন্ধ্যা হয়নি। সে কোন স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখছিল। সেই স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নে একটা বার্তা পেয়েছে। এই বার্তার বাহককে সে চেনে না, কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছিল, এই সেই সাধক যে কোন এক কালে এই কুঁড়েঘরে থাকতো।

বিকেলের আলো ফুরিয়ে আসছিল। উঁচু টিলার ওপর তৈরি করা কুঁড়েঘরটা থেকে দ্রুত নীচে নেমে এলো মুরশেদ মিয়া। দৌড়ে চলে গেলে গ্রামের উত্তর পাশের ঘন বনের দিকে। এখানে শাল-সেগুনসহ নানাপদের গাছ একে অন্যের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলের শেষ আলোয় সব কিছু পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল না। বনের ঠিক মাঝখানে ছোট একটা ডোবার মতো আছে। এর আগেও ডোবাটা চোখে পড়েছে। কিন্তু থকথকে ময়লা

পানির এই ডোবার দিকে ঠিক করে তাকিয়েও দেখেনি।

আজ তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল। ডোবার পানি স্ফটিকস্বচ্ছ, একদম তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সেখানে লাল-নীল চকমকে সব পাথর। ডোবার ঠিক মাঝখানে ফুটে আছে একটা পদ্ম। গোলাপী রঙের পদ্ম ফুল থেকে কেমন অদ্ভুত একটা আভা বেরুচ্ছে।

আমি চোখে ভুল দেখছি, নিজেকেই বলেছিল মুরশেদ মিয়া। আমি এখনো হয়তো বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছি, ভাবল। পরক্ষনেই মনে হলো, স্বপ্ন কখনো এতো জীবন্ত হয় না। উত্তরের বাতাসে ডোবার পানি আর মাঝখানের গোলাপী পদ্ম মৃদুমন্দ দোল খাচ্ছে।

হাতে জোরে চিমটি দিল মুরশেদ মিয়া। আশপাশে তাকাল। মনে হচ্ছে কেউ নেই এই বিশ্ব চরাচরে। এক পা এক পা করে এগুলো ডোবার দিকে। স্বচ্ছ পানিতে পা রেখেই বুঝল একদম হিমশীতল পানি। এই পানিতে নামতে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক। হয়তো এই পানিতেই সে জমে যাবে। কিন্তু মেয়েটাকে বাঁচানোর তীব্র ইচ্ছায় আরো কিছুদূর নামল। এখন আর খুব বেশি শীতল মনে হচ্ছিল না পানিটাকে। বরং যতো নামছে ততো ঈষদুষ্ণ হয়ে উঠছে তাপমাত্রা। ঠিক মাঝখানে কোমর সমান পানিতে গিয়ে পদ্মটার সামনে দাঁড়াল।

বাতাসে এখনো অল্প অল্প দুলছে পদ্মটা। খুব বেশি সময় নেই হাতে। এক ঝটকায় পদ্মফুলটা তুলে নিয়ে ডোবার কিনারের দিকে হাঁটতে লাগল মুরশেদ মিয়া। বুঝতে পারল হাঁটতে দারুন সমস্যা হচ্ছে। পানি কেমন ঘন হয়ে আসছে। নীচের দিকে তাকিয়েই বুঝল সময় একদম নেই। ডোবার পানি তার আসল অবস্থায় ফিরতে শুরু করেছে। পায়ের নীচে আগে পাথরের স্পর্শ পেলেও এখন বুঝতে পারছে সেখানে থকথকে কাদা ছাড়া আর কিছু নেই।

এক হাতে পদ্মফুলটা উপরে তুলে ধরে সর্বশক্তিতে ডোবার কিনারায় হাঁটতে থাকল মুরশেদ মিয়া। বারবার মনে হচ্ছিল কাদায় পিছলে পড়ে যাবে, আর কখনো এই ডোবা থেকে বের হতে পারবে না।

শেষপর্যন্ত ডোবা থেকে উঠতে পারল মুরশেদ মিয়া। হাতে পদ্মফুলটা কখন যেন আকারে ছোট হয়ে এসেছে। ফুলটা হাতে নিয়ে গ্রামের দিকে দৌড়াতে থাকল। গ্রাম বেশ দূরে এখান থেকে। দৌড়াতে দৌড়াতে মাঝে

মাঝে তাকাচ্ছিল ফুলটার দিকে, বুঝতে পারছিল এই ফুলের আয়ু আর বেশিক্ষণ নেই। একদম ফুরিয়ে যাবার আগে গ্রাম সর্দারের বাড়িতে পৌঁছাতেই হবে।

এতোদূর পথ খুবই এতো দ্রুত দৌড়াল যে অল্প সময়েই উঠোনে এসে পৌঁছাল মুরশেদ মিয়া। গ্রামের সব লোকজন এখনো ভিড় করে আছে। উঠোনের এক কোণায় ওঝা আর সর্দার গম্ভীর মুখে বসে আছে। সর্দারের বউ আর সাথে অনেক মহিলা ঘিরে আছে মেয়েটাকে। কান্নার শব্দ আসছে সেখান থেকে।

উঠোনে ঢুকেই মুরশেদ মিয়া হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল পদ্মফুলটার একটা পাপড়ি অবশিষ্ট আছে মাত্র। সে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটার পাশে গিয়ে বসল। সর্দারের বউ তাকিয়ে আছে তার দিকে, বুঝতে পারছে না অচেনা, ভিনদেশি মানুষটা তার মেয়ের কাছে কী চায়!

হাতের মুঠো থেকে পাপড়িটা বের করে মেয়ের মুখ দিয়ে দিল মুরশেদ মিয়া। মেয়েটা মুখ নাড়াতে পারছিল না, কিন্তু পাপড়িটার স্বাদ মুখে যাওয়া মাত্রই দেখা গেল মেয়েটা ধীরে ধীরে সেটা খেয়ে ফেলল তারপর সবাইকে অবাক করে উঠে বসল।

যন্ত্রনায় নীল হয়ে যাওয়া মুখটা ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক রঙ ফিরে পাচ্ছে। একটু আগেও যে যন্ত্রনাক্লিষ্ট মুখ দেখে সবাই আফসোস করছিল, তাদের সবার চোখে-মুখে এখন বিস্ময়ের ছাপ। সর্দার দৌড়ে এসে মুরশেদ মিয়াকে জড়িয়ে ধরল। ওঝাও এগিয়ে গেল। তবে সে কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল মুরশেদ মিয়ার দিকে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে মেয়েটা যখন হাঁটতে শুরু করলো উঠোনে, তখন পুরো গ্রামে হৈচৈ পড়ে গেল। হাততালি আর হাসির শব্দে পুরো গ্রাম ভরে গেল।

সেদিন রাতটা উৎসবেই কেটেছিল। কিন্তু পরদিন সকালেই গ্রামবাসি আর খুঁজে পেল না মুরশেদ মিয়াকে। এই গ্রামে থাকার সময় তার শেষ হয়ে এসেছিল, একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে যেখানে তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। লোকজন এখন কোন কিছুই হলে তার কাছে আসবে সমাধানের জন্য। এতোটুকু জীবনে মানুষ এড়িয়ে চলার জন্য এই জনবিরল পাহাড়ি এলাকায় আস্তানা গেড়েছিল মুরশেদ মিয়া। মেয়েটার এভাবে সেরে উঠার কথা এখন

গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে যাবে। এই গ্রাম ছাড়লে হবে না, পুরো উপত্যকা ছাড়তে হবে।

মুরশেদ মিয়া বুঝতে পারছে এভাবেই কিংবদন্তীর জন্ম হয়। হয়তো এতো বছর পরও তার মতো পরদেশিকে নিয়ে ওরা মুখোরোচক কোন গল্পে মেতে উঠে, কে জানে?

যুদ্ধের আঁচ আসেনি পাহাড়ি এলাকায়। এই এলাকা ছেড়ে ধীরে ধীরে আরো গভীরে চলে গেল মুরশেদ মিয়া। এখন আর সে জাহাঙ্গীর জাদুকরের খোঁজ করছে না। বরং তার খোঁজ অন্য কিছুর প্রতি। সেই বিকেলে স্বপ্নে আসা সেই প্রায় অবয়বহীন মানুষ আর মৃত্যু সঞ্জীবনী পদ্মফুল তাকে আরো গভীর কিছুর দিকে ধাবিত করলো।

এরপরের কয়েক বছর ঘুরে বেড়াল। কিসের খোঁজে সে নিজেও জানে না। তারপর খোঁজ পেল সেই অদ্ভুত মানুষটির।

পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ বন্ধ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন মুরশেদ মিয়া। সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রায়। আজ রাতে বিশেষ একটা কাজ আছে। এই কাজের জন্য ঢাকায় আসা।

ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে না বলে নীচে নেমে এলেন মুরশেদ মিয়া। উঠোনে মনজুর দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে এগিয়ে এলো।

'কই যান? নাস্তা বানাইতেছে রুকসানা, আপনের জন্য পায়েস, আর কী কী জানে রান্না হইতেছে,' মনজুর বলল।

'তুমি জানো না, আমি সন্ধ্যার পরে কিছু খাই না।'

'তা তো জানি,' কাচুমাচু হয়ে বলল মনজুর, 'কিন্তু আপনের এখন বয়স হইছে। রাইতে না খাইলে কী চলে?'

'আমার চলে। এখন সামনে থাইকা সরো।'

মনজুর একপাশে সরে দাঁড়াল। গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন মুরশেদ মিয়া। ঢাকায় এই সমস্যা। একটু হাওয়া-বাতাস খাওয়া যাবে এমন জায়গা নেই। রাস্তায় এই সন্ধ্যায়ও দারুন ভিড়। বেবি-ট্যাক্সি, রিক্সা মিলে মিশে দারুন হৈচৈ।

তিনি এই দারুন হৈচৈয়ের মধ্যে নিবিষ্ট মনে কিছু ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকলেন। তার পেছনে এবারও আরেকজন পিছু নিয়েছে। অন্যমনস্ক থাকায় লক্ষ্য করলেন না।

অধ্যায় ১১

সালাম চলে এসেছে মিরপুর এলাকায়। একদম অচেনা একটা জায়গা তার জন্য। কাউকে চেনে না। কেউ তাকে চেনে না। এটাও একধরনের আনন্দ। মিরপুর দশ নাম্বার এলাকায় একটা রেস্টুরেন্টে সন্ধ্যায় নাস্তা সারলো। তারপর স্টেডিয়ামের বাইরে খোলা জায়গাটায় বসে রইল অনেকক্ষণ। রাত কোথায় কাটাবে তা এখনো ঠিক করতে পারেনি। জমির ম্যাজিশিয়ানের কাছ থেকে মাঝে মাঝে অল্প কিছু টাকা পেয়েছিল, জমানো সে টাকাগুলোই সম্বল। এই টাকা শেষ হয়ে গেলে কী করবে জানে না। কাজের মধ্যে একটা কাজই জানে। সেটা হচ্ছে জাদু দেখানো। কিন্তু জাদু দেখাতে হলে কিছু জিনিসপত্র লাগে। আপাতত সেইসব জিনিসপত্র কেনার সামর্থ্য নেই। এছাড়া জাদু দেখাতেও সমস্যা আছে। ঢাকা যতো বড়ই হোক, সালাম জানে ঢাকায় কোন এলাকায় কে জাদু দেখিয়ে টাকা রোজগার করে সেই খবর জমিরের কাছে পৌছে যায়। ছোট একটা গোষ্ঠির মতো হয়েছে। রাস্তায় জাদু দেখিয়ে বেড়ানো অল্প কিছু মানুষ পরস্পরের খোঁজ খবর রাখে। সে জাদু দেখালে তার খবর জমিরের কাছে যেতে সময় লাগবে না। আর জমিরের কাছে যাওয়া মানেই সেটা শংকরের জেনে যাওয়া।

শংকরের কাছ থেকে পালানোর জন্য বিশেষ কোন কারন খুঁজে বের করতে পারেনি সালাম। শুধু এটা মনে হয়েছিল এই লোকটার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে। লোকটা যেমনই হোক, তার বিশেষ কোন মতলব আছে। মতলব ছাড়া শংকরের মতো একা আর স্বার্থপর লোকটা কিছুতেইজমির আর তার পেছনে এতোগুলো টাকা ঢালতো না।

অচেনা দুজন মানুষকে বিনাপয়সায় থাকার সুযোগ কে-ই বা করে দিতে চায় স্বার্থ ছাড়া। জমির অবশ্য শংকরের কাছে অচেনা নয়। তবে সে সম্পর্কটা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

রাত ন'টার দিকে স্টেডিয়ামের এইপাশটা পুরো ফাঁকা। লোকজন নেই তেমন। একা একা এখানে বসে থাকার মানে নেই। রাতটা কোন হোটেলে

কাটাতে হবে। কাল সকালে পরের চিন্তা করাযাবে।

সালাম হেঁটে দশ নাম্বার গোল চত্বরের কাছে চলে এলো। এদিকে রাস্তায় অনেক জ্যাম এখনো। ট্রাফিক পুলিশরা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। পুলিশের পোশাক দেখলে ভয় লাগে সালামের। এই ভয় অল্প একটু কমেছে জমিরের সাথে শো করতে গিয়ে। এরা শো'র শেষের দিকে হাজির হতো। ওদের কাছে দৈনিক রোজগারের অল্প কিছু টাকা দিয়ে দিতো জমির। এতে সম্পর্ক ভালো থাকতো আর রাস্তার পাশে ম্যাজিক শো দেখানো নিয়ে পুলিশ আর ঝামেলা করতে আসতো না।

এখানে হোটেল কোথায় জানে না সালাম। রাস্তার দুপাশে ঝোলানো সাইনবোর্ডগুলো দেখতে দেখতে হাঁটতে থাকল। হোটেলের সাইনবোর্ড চোখে পড়ছে না। দুপুরে খাবারের পর আর তেমন কিছু খাওয়া হয়নি। খিদেয় পেট চো চো করছিল। হোটেল খোঁজা জরুরি হলেও পেট সামলাতে হবে আগে।

বিসমিল্লাহ হোটেল নামে এক রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল সালাম। এই মুহূর্তে বেশ ভিড়। লোকজনের অর্ডার সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে ওয়েটারকে। সব টেবিলেই লোক। শুধু শেষ টেবিলের একপাশের চেয়ারে একজন লোক বসে আয়েশ করে চা খাচ্ছে। তার হাতে দৈনিক পত্রিকা। উল্টোদিকের চেয়ার ফাঁকা, তাই খুব বেশি চিন্তা না করে এগিয়ে গেল সালাম।

'এইখানে বসা যাবে?' জিজ্ঞেস করলো সালাম।

লোকটা পত্রিকা না সরিয়েই বলল, 'বসেন না। মানা করছে কে?'

কেউ মানা করেনি, ভদ্রতার খাতিরেই জিজ্ঞেস করেছিল সালাম। লোকটা এসব ভদ্রতা বুঝবে না তা কে জানতো, এমনকি পত্রিকাটা সরিয়েও তাকায়নি।

সালাম সামান্য কিছু খাবার অর্ডার দিল। ভাত, মাছের ঝোল আর আলু ভর্তা। খেতে খেতে মাঝে মাঝে উল্টোদিকে বসে থাকা লোকটার দিকে তাকাচ্ছিল। পত্রিকাটা একপাশে সরিয়ে রেখে লোকটা একমনে সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। লোকটার কাঁধ পর্যন্ত ঝাকড়া চুল, লম্বা মুখে ঝোলানো গোঁফ। এক হাতে সিগারেট অন্য হাতে একটা দশ পয়সা নিয়ে খেলছে। আঙুলের ফাঁক গলে পয়সাটা বারবার তার স্থান বদলাচ্ছে। কাজটা এতো

দ্রুত হচ্ছে যে কখন কোন আঙুলের ফাঁকে চলে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছে না সালাম।

লোকটা সালামের দৃষ্টি খেয়াল করল অনেকক্ষণ পর। পয়সাটা শার্টের পকেটে ঢোকাল। সালামও খাওয়ায় মন দিল। কিন্তু মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছে লোকটার দিকে। সিগারেট শেষ করেছে। চা দিয়ে গেছে ওয়েটার। গরম চা কাপ থেকে পিরিচে ঢেলে নিলো লোকটা। পিরিচটা তুলে চুমুক না দিয়ে এক আঙুলের ওপর পিরিচটা রাখল। তারপর সেটা আরেক আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে দিল। চা সহ পিরিচটা এক আঙুলের ওপর বন বন করে ঘুরছে কিন্তু চা সেখান থেকে ছিটকে যাচ্ছে না।

সালাম খাওয়া বাদ দিয়ে এক দৃষ্টিতে দেখছে পিরিচের ঘূর্ণন। লোকটা হঠাৎ থামিয়ে দিল পিরিচটা, তারপর এক চুমুকে শেষ করে ফেলল পিরিচের চা'টুকু। কাপের বাকি চা টুকু আর খেল না। উঠে পড়ল। কাউন্টারে গিয়ে বিল দিয়ে বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে।

খিদে মরে গেছে সালামের। বাকি খাবারটুকু রেখে সে দ্রুত বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে নিলো। দৌড়ে কাউন্টারে গিয়ে খাবারের বিল দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। তাকাল দুপাশে। লোকটা কোনদিকে গিয়েছে বুঝতে পারছে না। ডান দিকের রাস্তায় তাকিয়ে দেখল একদম শেষ মাথা থেকে ডানে চলেযাচ্ছে লোকটা। দৌড় দিল সালাম।

লোকটা একমনে মাথা নীচু করে হাঁটছিল, শিস দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল সালামকে। হাত ইশারায় ডাকল। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সালাম।

'ঘটনা কী?'

'আপনে জাদু জানেন?'

লোকটা কিছু বলল না। সালামকে কিছুক্ষণ দেখল।

'জানলে জানতেও পারি। তোমার কি দরকার?'

'আমি জাদু শিখতে চাই আপনের কাছে,' সালাম বলল।

'আমি এগুলো কাউকে শেখাই না, তুমি যাও।'

'আমি যামু না।'

'কী করবা তাহলে?'

'আপনের পিছে পিছে থাকমু।'

লোকটা হাসল। এগিয়ে এসে সালামের সামনে দাঁড়াল।

'আমি কিন্তু কাউরে জাদু শেখাই না। জাদু শিখার জিনিস না। আপনে আপনে হয়।'

'আমি কিন্তু জমির ম্যাজিশিয়ানের লগে ছিলাম। তার কাছে কিছু শিখছি।'

'ওহ জমির! ও কিছু জানে নাকি?'

'আপনের নাম কি?'

'আমার নাম কুদ্দুস। কিন্তু এই নামে কেউ আমারে চিনে না।'

'তাহলে কি নামে চিনে?'

'পাগলা কুদ্দুস বললে চিনবে।'

'আপনে কি পাগল?'

'লোকে আদর করে পাগলা বলে। তুমি থাকো কোথায়?'

'আমি কোথাও থাকি না। থাকার জায়গা নাই।'

'পালিয়ে এসেছো?'

মাথা নীচু করে থাকল সালাম। তার মনে হচ্ছে এই লোকটাকে সব বলা যায়। তবু কিছু বলল না।

'আমিও ঘর পালানো লোক। সেই কবে ঘর ছাড়লাম নিজেও জানি না। যাক, তুমি আমার পেছন পেছন আসো। আমার লগে থাকো কয়দিন। পরেরটা পরে চিন্তা করা যাইবো।'

'আমি যদি আপনের সব চুরি কইরা পলাইয়া যাই?'

'পালাইয়া কই যাবা! আমি পাগলা কুদ্দুস হলেও খুব চালু লোক। কেউ আমার কাছ থেকে পালায়ে থাকতে পারবা না।'

কুদ্দুস হাঁটতে শুরু করেছে। পেছন পেছন হাঁটছে সালাম। লোকটা দ্রুত গতিতে হাঁটে। ওর সাথে তাল সামলাতে সালামকে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে কতোদূর গেল তা মনে নেই সালামের। তবে একসময় দেখল একটা বড় গলির শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে। ডানদিকে একটা টিনেরচালার ঘর। ঘরের দরজায় বড় করে তালা ঝোলানো।

কুদ্দুস তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। তালা খুলতে চাবি প্রয়োজন। কিন্তু ওর হাতে কোন চাবি দেখেনি সালাম এটা নিশ্চিত। লোকটার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল সালাম। ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। এ কোথায় চলে এসেছে সে!

পুরো ঘর আলোয় আলোকিত। এটা যে একটা টিনের ঘর তা বোঝা যাচ্ছে না। চমৎকার সব আসবাবপত্র। দেয়ালে ঝোলানো অনেক রকমের চিত্রকর্ম। একপাশে টিভি, ফ্রিজ, আলমারি অন্যপাশে খাবার টেবিল, বইয়ের সেলফ। বিছানার ওপর অন্তত আট-দশটা বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ডান দিকে নরম গদিওয়ালা সোফা।

কুদ্দুস একটা সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে বসল। সালামকেও উল্টোদিকের সোফায় বসার জন্য ইশারা করল।

'বিছানা একটাই, কারন লোক আমি মাত্র একজন,' কুদ্দুস বলল, 'তুমি এই সোফায় ঘুমাইতে পারো। নরম সোফা, আরামের ঘুম হইবো।'

ঘাড় বাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সালাম।

ঘরটা বারবার দেখছে। মাথার ওপর ছাদটাকে টিনের চাল বলে মনে হচ্ছে না। সেখানেও নানা কারুকার্য। পাখায় নানা রঙ করা একটা সিলিং ফ্যান ঘুরছে দ্রুত গতিতে।

'তুমি যে জাদু দেখছো বা শিখছো, ঐটা আসলে ধোঁকাবাজি,' কুদ্দুস বলল, 'আসল জাদুকররা ধোঁকাবাজি করে না। তারা আসল জাদু দেখায়। মানুষ মনে করে এরাও ধোঁকাবাজি করতেছে।'

'আপনে আসল জাদুকর?'

'হ। ঠিক ধরছো। আমি আসল জাদুকর। আসল জাদুকর দুনিয়ায় নাই বললেই চলে।'

'আসল জাদুকর হইতে হইলে কী করতে হয়?'

'তুমি আসল জাদুকর হইতে চাও?'

'হ।'

'চোখ বন্ধ করো।'

সালাম চোখ বন্ধ করল। টের পেল তার শীত শীত লাগছে। হঠাৎ করেই ঘরের তাপমাত্রা যেন কমে গেছে।

'এখন চোখ খোল।'

ধীরে ধীরে চোখ খুলল সালাম। দেখল একটু আগে ঘরে যা দেখেছে তার কিছুই নেই। পুরোপুরি দীনহীন একটা ঘর। কুদ্দুস একটা শক্ত কাঠের চেয়ারে বসে আছে। সেও তাই। মাথার ওপরখটখট শব্দে একটা সিলিং ফ্যান ঘুরছে। ঘরটা টিনের তৈরি সেটা এখন পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে।

দেয়ালে কিছুক্ষণ আগে যেসব চিত্রকর্ম দেখেছিল, তার কিছুই নেই। সেখানে এখন উনিশশো নব্বই সালেরকিছু ক্যালেন্ডার ঝুলছে। একপাশে ছোট একটা কাঠের আলমারি, একটা স্টিলের তৈরি ক্যাবিনেট, সাধারন একটা চৌকি পাতা ঘরের এক কোনায়।

'এবার চোখ বন্ধ করো।'

চোখ বন্ধ করল সালাম। একটু আগের শীত শীত ভাবটা নেই আর। তার বদলে আরামদায়ক একটা অনুভূতি। মাথার ওপর সুন্দর স্বচ্ছ একটা বাতাস বয়ে যাচ্ছে যেন।

'চোখ খোল এখন।'

সালাম চোখ খুলল। ঘরটা আবার আগের অবস্থায় চলে এসেছে। সোফা, টিভি, ফ্রিজ, আলমারি, খাবার টেবিল, বইয়ের সেলফ, সব চলে এসেছে যেখানে যেটা ছিল। এমনকি দেয়ালে ঝোলানো চিত্রকর্মগুলোও যার যার জায়গায় শোভা পাচ্ছে। কী বলবে বুঝতে পারছিল না সালাম।

'আপনি এইটা কী দেখাইলেন? এইটা কী জাদু না অন্যকিছু?'

'অন্যকিছু না। এইটা হইলো জাদু। এই জাদু অন্য কেউ দেখাইতে পারবো না।'

'আপনার নাম কী সত্যিই কুদ্দুস?'

কুদ্দুস কিছু বলল না। ডাইনিং টেবিলের সামনে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে সালামকে বসতে বলল। সে নিজে ফ্রিজ খুলে একটা ঠান্ডা পানির বোতল বের করে সালামের সামনে রাখল।

'ঠান্ডা পানি খাও। তারপরে ঐ সোফায় গিয়া ঘুমাও।'

'আমি তো এতো তাড়াতাড়ি ঘুমাই না।'

'কখন ঘুমাও?'

'বারোটার দিকে।'

'ধরো এখন বারোটা বাজে। ঘড়ি আছে?'

'আছে।'

কিছুদিন আগে গুলিস্তান ফুটপাত থেকে একটা ক্যাসিও ঘড়ি কিনেছিল অনেক শখ করে। ঘড়ির দিকে তাকাল সালাম। বারোটা দশ বাজে। অথচ রেস্টুরেন্টে যখন খাচ্ছিল তখন বেজেছিল সাড়ে ন'টা। এখন বড়জোর সাড়ে দশটা বাজার কথা। খেয়াল করে দেখল তার হাই আসছে।

'কয়টা বাজে?'

'বারোটা দশ।'

'যাও, ঘুমাও। আমি একটা পড়াশোনা করুম।'

'কি পড়বেন?'

'সেইটা তোমার জানার দরকার নাই। এখন বিরক্ত কইরো না।'

কুদ্দুস বিছানায় উঠে বসে একটা বই টেনে নিলো কাছে। সালাম সোফায় হেলান দিয়ে শুল। গদি এতোটাই নরম যে মনে হচ্ছিল এরচেয়ে নরম জিনিস পৃথিবীতে আর হয় না। যে আরামদায়ক অনুভূতি হচ্ছিল, চোখে ঘুম চলে এলো সালামের। ঘুম ঘুম চোখেই কুদ্দুসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েরইল সালাম। লোকটা কী হাসল তাকে দেখে! হাসবে কেন? ঘুম আসতেই পারে। রাত বারোটা দশ বাজে। ঘড়ির ডায়ালের দিকে আবার তাকাল সালাম। অবাক হয়ে দেখল দশটা কুড়ি বাজে মাত্র। একটু আগে কী সে ভুল দেখেছিল তাহলে? কিন্তু এসব নিয়ে আর কিছু ভাবার আগেই ঘুমের গভীরে তলিয়ে গেল সালাম। দুঃস্বপ্নটা আবার দেখল। ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখল চারদিকে গভীর অন্ধকার। অন্ধকার যে এতো নিকষ কালো হয় জানা ছিল না।

নরম সোফা থেকে পা রাখল মেঝেতে। মেঝেতেও নরম কার্পেট বিছানো। টয়লেটে যাওয়ার দরকার ছিল। ডাইনিং টেবিলের ওপাশে একটা দরজা দেখে তখন ধারনা করেছিল ওটাই টয়লেট। অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজ করে সেদিকেই হাঁটছিল। তবে কিছু একটায় হোঁচট খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

ঘরের বাতিগুলো সব জ্বলে উঠল সাথে সাথে। সালাম দেখল কুদ্দুস বিছানায় উঠে বসেছে, তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'বাথরুমে যাইবা?'

মেঝেতে বসা অবস্থায় মাথা নাড়াল সালাম।

বিছানা থেকে নেমে এলো কুদ্দুস। তার পরনে সাদা পায়জামা আর সবুজ একটা ফতুয়া। দেখতে একদম অন্যরকম লাগছিল। রেস্টুরেন্টে দেখা অপরিচ্ছন্ন মানুষটা যেন অন্য কেউ ছিল।

'যাও, ঐ যে ডাইন দিকে,' ডাইনিং টেবিলের পাশের দরজাটা দেখিয়ে বলল কুদ্দুস।

সালাম এগিয়ে গেল বাথরুমের দিকে। দরজা খুলে খুব একটা অবাক হলো না। এমনটাই আশা করেছিল। ধবধবে সাদা একটা বাথরুম। সব পরিষ্কার ঝকঝক করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এলো সে।

দেখল সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে কুদ্দুস। পরনের কাপড়-চোপড় বদলে গেছে। এখন নীল রঙা প্যান্ট আর রংচঙা একটা শার্ট পরনে। এতো দ্রুত কিভাবে পোষাক পাল্টালো লোকটা! সে তো বাথরুমে খুব অল্প সময় কাটিয়েছে। কুদ্দুস এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে। বাথরুমে ঢোকারআগে লোকটার চেহারায় নরম একটা ভাব ছিল। এখন রীতিমতো ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ধীর পায়ে কুদ্দুসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সালাম।

এই ঘরে কোন জানালা নেই। বাইরের কোন শব্দও আসে না। তবু হঠাৎ সালামের কাছে মনে হলো বাইরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও যেন কোন একটা আলোড়ন হচ্ছে, কোথায় সেটা ধরতেপারছে না।

'তুমি কি কাউরে জানাইছো তুমি কই আছো?'

কাটা কাটা প্রশ্ন করলো কুদ্দুস।

সালাম প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল কুদ্দুসের দিকে।

'আমি কারে জানাবো। আমি আপনের কথা বুঝতেছি না।'

'ঐ শংকর তোমার কি হয়?'

শংকরের নাম কিভাবে জানে কুদ্দুস এটা বুঝতে পারছে না সালাম। তবে বুঝতে পারছে এই লোকের কাছে কোন কিছু গোপন করা ঠিক হবে না। এই লোক ঠিকই বুঝতে পারবে।

'শংকর আমার কেউ না।'

'তাইলে তোমার পেছন পেছন আসছে ক্যান?'

'পেছন পেছন আসছে মানে?'

'তুমি তারে নিয়া আসছো।'

'কিন্তু আমি তো তার কাছ থেইক্যা পালাইছি। সেই দুপুরেই।'

'সে তোমার কী ক্ষতি করছে?'

'লোকটারে আমার কাছে সুবিধার মনে হয় নাই।'

এই সময় ঘরের দরজায় খুটখাট শব্দ শোনা গেল। মনে হচ্ছে কেউ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়েআছে। দরজা খোলার চেষ্টা করছে। কুদ্দুস কান খাড়া করে চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। সালামকে ইশারায়

বসতে বলল। শব্দটা থেমে যেতে বলল, 'আমার সাথে মিছা কথা বইলা পারপাইবা না, সালাম মিয়া।'

'আমি মিথ্যা কথা বলছি না।'

'তাইলে ঐ শংকর এমনি এমনি চইলা আসছে।'

'আপনে ক্যামনে বুঝলেন শংকর আসছে?'

উঠে দাঁড়াল কুদ্দুস। কিছু একটা বলছিল বিড়বিড় করে। বোঝা যাচ্ছিল খুব বিরক্ত। তবে সেই বিরক্তি নিজের ওপর না সালামের ওপর এটা বুঝতে পারল না সালাম।

'রেডি থাকো।'

'কিসের জন্য...?'

সালামের কথা শেষ হতে না হতেই দরজায় প্রচণ্ড শব্দ হলো। মনে হচ্ছে কেউ সর্বশক্তিতে ঝাপিয়ে পড়েছে দরজার ওপর। বারবার প্রচণ্ড ধাক্কায় পুরো ঘরটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কোন মানুষ শরীরে এতো শক্তি ধরে বলে ধারনা ছিল না সালামের। ঐপাশ থেকে শংকর যদি দরজার ওপর এই আক্রমণ করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে শংকর কোনভাবেই সাধারন কোন মানুষ নয়। সাধারন মানুষ এতো শক্তি রাখে না।

কিছুক্ষণ ক্রমাগত আঘাতের পর সব থেমে গেল হঠাৎ করে। দারুন এক নীরবতা নেমে এলো ঘরজুড়ে। ঠিক একই সময় ঘরের সব বাতিগুলো নিভে গেল। নিকষ অন্ধকার। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না সালাম। এই সময় টের পেল তার কাঁধে কেউ হাত রেখেছে। চমকে পিছু ফিরল।

বুঝতে পারল কুদ্দুস চলে এসেছে। এতো দ্রুত কিভাবে ঐ সোফা থেকে তার পেছনে চলে এলো লোকটা বুঝতে পারল না। কাঁধে চেপে ধরে আছে কুদ্দুস। নড়াচড়া করতে পারছে না সালাম। বুঝতে পারছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

'শশশশ,' কানের কাছে মুখ নিয়ে কুদ্দুস সাবধান করল ওকে।

একই সাথে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল কেউ।

অধ্যায় ১২

ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় নতুন বাতি বসেছে। সোডিয়াম বাতি। এই বাতির হলদেটে আলোয় হাঁটতে হাঁটতে সংসব ভবনের সামনে মানিক মিয়া এভিনিউতে চলে এসেছেন মুরশেদ মিয়া। এখানে চওড়া রাস্তা, গাড়িঘোড়া চললেও বেশ ফাঁকা জায়গা চারদিকে। সংসদ ভবনের সামনে লম্বা ফুটপাত, অনেক সিঁড়ি। সেই সিঁড়িতে বসে আড্ডা জমিয়েছে অনেকে, কেউ কেউ স্বাস্থ্যরক্ষায় হাঁটতে বের হয়েছে। কেউ কেউ বের হয়েছে উদ্দেশ্যহীন। তিনি নিজে যেমন উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় বের হয়েছেন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হাঁটাহাঁটি করার প্রয়োজন নেই তার।

হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুটা ক্লান্ত হয়ে সিঁড়িতে বসলেন মুরশেদ মিয়া। সিড়ির অন্যপ্রান্তে একদল ছেলে তারস্বরে গান গাচ্ছে। তবে সেই গানের বেশিরভাগ অংশ বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে অসুবিধা হচ্ছে না। বাতাসের বেগ বাড়ছে। তিনি সিঁড়িতে বসে সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরালে চিন্তাভাবনা করতে সুবিধা হয়, এছাড়া আর কোন উপকারিতা পাননি।

লুঙ্গিপরা একটা লোক এসে সামনে দাঁড়াল হঠাৎ। মুখ দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল, চেহারাটা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না। ফতুয়ার দুপাশে ছোট পকেট আছে। একটা পকেট থেকে দেয়াশলাই নিয়ে লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং প্রস্তুত হয়ে রইলেন। আক্রমন আবার যেকোন সময় যেকোন দিক থেকে আসতে পারে। তবে লুঙ্গিপরা লোকটা সিগারেট ধরিয়ে দেয়াশলাইটা খুব আদবের সাথে দিয়ে চলে গেল। তিনি হাঁপ ছাড়লেন। এখনো তেমন রাত হয়নি, চারপাশে প্রচুর মানুষজন। এরমধ্যে তিনি কোন ঝামেলায় যেতে চান না।

তবে ঝামেলায় যেতে না চাইলেও ঝামেলা চলে আসে। গত কিছুদিন ধরে বারবার শুধু নিজের জীবনের পেছনদিককার ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করেন। কেন জানি মনে হয় আজকে যে সমস্যা হচ্ছে তার বীজ বোনা

হয়েছে তার সুদূর অতীতে। অতীত এখন অনেকটাই ঝাপসা। এই ঝাপসা অতীত ঘেটে দেখতে হবে। বহুদিন পর কেন্দুং-এর কথা মনে পড়ছিল। উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে বয়স যখন মাত্র বাইশ, ততোদিনে পৃথিবীর বিভিন্ন অদ্ভুত চরত্রের সাথে তার দেখা হয়ে গিয়েছিল।

কেন্দুং-এ কুকি সম্প্রদায়ের সাথে থাকতে থাকতে ওদের ভাষা সংস্কৃতির অনেকটাই জানা হয়ে গিয়েছিল, অভ্যাসে পরিনত হয়েছিল। সে যে পূর্ব বঙ্গের লোক, ভাত ছাড়া তার চলে না, সেই মানুষটিই খুব ভক্তি করে কুকিদের প্রথামত খাবার খেত। সেই খাবারের পুরোটাই আসতো প্রকৃতি থেকে। কিন্তু সর্দারের মেয়ের হঠাৎ আরোগ্যের পরই তিনি ঐ অঞ্চল থেকে চলে আসেন। কারন এটা নিশ্চিত ছিল, এরপর সর্দার গ্রামের যে কেউ অসুস্থ হলে তার কাছে নিয়ে আসবে এবং তাকে তিনি মানা করতে পারবেন না। মৃত্যুপথযাত্রী একটা মেয়ে এতো দ্রুত সেরে উঠবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি, গ্রামবাসীদেরই বা দোষ দিয়ে কী হবে!

সেই অদ্ভুত পদ্মফুল, সেই অবয়বহীন মানুষের মুখ তিনি কখনো ভোলেননি।

সিগারেটটা যখন শেষের পথে তখন টের পেলেন বাতাস শীতল হয়ে এসেছে। বৃষ্টি নামবে যেকোন সময়। এখানে আশ্রয় নেয়ার কোন জায়গা নেই। গাছপালা আছে প্রচুর। কিন্তু তা বৃষ্টিতে ভেজা থেকে থামাতে পারবে না। তিনি উঠে পড়লেন। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। ঐপাশের আড্ডা ভেঙে গেছে। বৃষ্টি থেকে বাচতে যে যার মতো আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করছে আশপাশে।

শুধু বৃষ্টি শুরু হলো না, সাথে সাথে বড়বড় শিল পড়তে শুরু করেছে। ছোটবেলায় একসময় শিল কুড়াতেন বন্ধুদের সাথে। সেসব কথা মনে পড়াতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজাবাজারের দিকে হাঁটতে থাকলেন।

ঢাকায় ফিরতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তিনি বাধ্য। মাসে একবার এসে দেখে না গেলে হয় না।

বাসায় যখন ফিরলেন তখন রাত ন'টা বাজে। বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছেন। গেট খোলা ছিল। সোজা তিনতলায় উঠে গেলেন। রাতে তিনি কিছু খান না বলে মনজুর আর ওর বউ কোন ঝামেলা করে না।

ঘরে ঢুকে আগে দরজা লাগালেন। তারপর বাতি জ্বালালেন। মাথা

মুছলেন বেশ সময় নিয়ে। ভেজা কাপড়-চোপড় পাল্টে নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালেন। রাত বারোটার দিকে কাজে নামতে হবে। এখনো ঘন্টা তিনেক বাকি। বৃষ্টিতে ভিজে শরীরটা শীতল হয়ে এসেছে। তাই বিছানায় হেলান দিলেন। ঘন্টাখানেকের মতো একটা ঘুম দিলে একদম তরতাজা হয়ে উঠবেন। চোখ বুজতেই ঘুম এলো। তিনি আবার অনেক দূর কোন অতীতে হারিয়ে গেলেন।

উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের দিকে মুরশেদ মিয়ার বয়স চব্বিশ। তরতাজা যুবক। মাথা ভর্তি ঝাকড়া চুল, পেশিবহুল দেহ। সাধারন বাঙ্গালীদের তুলনায় বেশ লম্বা। গ্রাম ছাড়ার পর অনেক জায়গায় ঘুরেছে আর মানুষজন দেখেছে। পথের ধারে যখনই কোন লোককে দেখেছে জাদু দেখাচ্ছে কিংবা কোন খেলা দেখাচ্ছে, ওদের সাথে কথা বলেছে। জাহাঙ্গীর জাদুকরের কথা জানতে চেয়েছে। কেউ বলতে পারেনি। এরকম একজন জাদুকরকে কেউ চেনে না এটা মানতে কষ্ট হলেও কিছু করার নেই। ভারতবর্ষ অনেক বড়। কেউ হারিয়ে যেতে চাইলে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে দিল্লির কাছাকাছি এক গ্রামে জাহাঙ্গীর জাদুকরের খবর পাওয়া গেল। তার দেয়া বর্ণনার সাথে ওদের দেখা লোকের সাথে একদম মিলে যায়।

দিল্লিতে পুরনো এলাকায় ছোট একটা রুম ভাড়া করেছে মুরশেদ মিয়া। হিন্দিতে কথা বলে, তার উচ্চারন চমৎকার। কেউ ধরতে পারে না। সবাইকে বলে বিহার থেকে এসেছে। কেউ সন্দেহ করে না। বিহারে মুসলমান আর হিন্দুদের মধ্যে ঝামেলা লেগেই থাকে। অনেক মুসলমান তখন বিহার ছাড়ছিল। কাজেই সন্দেহ করার কারনও নেই। সারাদিন সে ঘুরে বেড়ায়। দিল্লি- এক ঐতিহাসিক শহর। এক তাজমহলের সামনে দিনের পর দিনে বসে থেকেছে। সেই সাথে পুরনো দিল্লির অলিগলিতেও ঘুরে বেড়িয়েছে। পুরনো ঢাকার সাথে মিল পাওয়া যায় এই এলাকার।

এখানে তার কোন কাজ নেই। কেন্দুং-এ মেয়েকে বাঁচানোর উপহার স্বরুপ কুকি সর্দার বেশ কিছু উপহার দিয়েছিল। এছাড়া টাকা-পয়সায় খুব বেশি টান পড়ে গেলে চকবাজার চত্বরে কিছু খেলা দেখায়। খুব সাধারন খেলা। তাস কিংবা দড়ির খেলা। দিল্লির লোকজন এসব খুব পছন্দ করে। খেলা শেষ হলে ওরা কিছু টাকা ছুঁড়ে দিতে কার্পণ্য করে না। কিন্তু এসব টুকটাক খেলা দেখানোতে মন নেই মুরশেদ মিয়ার। তার দরকার আরো বড়

ধরনের কিছু। শুধু হাত সাফাই বা কথা দিয়ে লোকজনকে মুগ্ধ করতে আরো ভালো লাগে না। দরকার সত্যিকারের কোন জাদু।

সেই সত্যিকারের জাদুর খোঁজে আছে মুরশেদ মিয়া। জাহাঙ্গীর জাদুকরের খোঁজে দিল্লির বাইরের কয়েকটা গ্রামেও গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে যেসব জাদুকরের দেখা পাওয়া গেল, ওদের মধ্যে জাহাঙ্গীর জাদুকর ছিল না। এছাড়া অন্য যেসব জাদুকরের কাজ দেখেছে তাদের মধ্যে কাউকে সেরকম দুর্দান্ত কিছু মনে হলো না। এসব সাধারন জাদু দেখানোর প্রতি তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

একদিন সন্ধ্যায় খুব বৃষ্টি নেমেছিল। সেদিন জাদু দেখাতে দিল্লির শেষ প্রান্তের এক অভিজাত এলাকায় জাদু দেখাচ্ছিল মুরশেদ মিয়া। টুকটাক জাদু দেখিয়ে অল্প কিছু রোজগার হয়েছে মাত্র। লোকজন জমা হয়েছিল বেশ। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টিতে সব ভেঙে গেল। বৃষ্টি নামাতে লোকজন সরে যাচ্ছিল দ্রুত। জিনিসপত্র দ্রুত গুছিয়ে নিচ্ছিল মুরশেদ মিয়া। আরো কিছুক্ষণ জাদু দেখাতে পারলে রোজগারটা ভালো হতো। কিন্তু বৃষ্টির ওপর তো কারো হাত নেই।

তবে সব কিছু গুছিয়ে উঠবার আগেই ঝমঝম বৃষ্টি নামল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। দিল্লি পৌরসভার লোকজন সম্ভবত রাস্তার পাশের বাতিগুলো জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনশান রাস্তায় নিজেকে একা আবিষ্কার করলো মুরশেদ মিয়া। কেউ নেই কোথাও। জিনিসপত্র অনেকটাই ভিজে গিয়েছিল। সাথে একটা কাপড়ের ব্যাগে সব ঢুকিয়ে নিয়ে ব্যাগটা কাঁধে ঝোলাল সে। এখান থেকে পুরনো দিল্লিতে নিজের ডেরায় ফিরতে বেশ সময় লাগবে। ট্যাক্সি ছাড়া কোন উপায় নেই। এই ভর সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ করেই দিল্লির সব ট্যাক্সি যেন রাস্তা থেকে উবে গেছে।

কাপড়ের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে যতোটা সম্ভব বৃষ্টি বাচিয়ে হাঁটতে শুরু করলো মুরশেদ মিয়া। অনেকদিন বৃষ্টিতে ভেজা হয় না। একদিন ভিজলে তেমন কোন সমস্যা হবে না। দিল্লির এই এলাকায় জনবসতি তেমন গড়ে উঠেনি। কেন যে আজ এতোদূর চলে এলো কে জানে। মনে মনে নিজেকেই ধমক দিচ্ছিল সে। অবচেতন মনে হয়তো জাহাঙ্গীর জাদুকরকে এখনো খুঁজে চলেছে। তাই শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে চষে বেড়াচ্ছে নিজের অজান্তেই।

দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে হাটায় মনোযোগ দিল মুরশেদ মিয়া। শার্টের পকেট সিগারেট ছিল। কিন্তু এরমধ্যে সেটা বৃষ্টিতে একদম ভিজে গেছে। সিগারেটটা শার্টের পকেট থেকে বের করে রাস্তার পাশে ড্রেনে ফেলে দিল। যেভাবে বৃষ্টি নেমেছে আর সেই সাথে বজ্রপাত আর বাতাস শুরু হয়েছে তাতে খুব সহজে প্রকৃতির এই খামখেয়ালি থামবে না। হাঁটতে হাঁটতে বারবার মনে হচ্ছিল কেউ তার পেছনে পেছনে আসছে। এই বৃষ্টির মধ্যে কে আসবে পেছনে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'একবার পেছনে তাকাল। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না। রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা। কেউ পিছু নিলে অবশ্যই চোখে পড়ার কথা। গত কিছুদিন ধরেই এই অনুভূতিটা খুব জ্বালাচ্ছে। সব সময় মনে হয় কেউ তাকে দেখছে। কেউ অনুসরন করছে। জাদু দেখানোর সময় ভিড়ের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে কাউকে খোঁজে মুরশেদ মিয়া। মনে হয় এই লোকগুলোর ভিড়ে বিশেষ কেউ একজন তাকে আলাদা করে দেখছে। তার অনুভূতি সাধারনত মিথ্যে হয় না। অবশ্যই কেউ না কেউ তাকে অনুসরন করছে। প্রয়োজনে সে নিশ্চয়ই সামনে আসবে। তখনকার জন্য প্রস্তুত মুরশেদ মিয়া।

হাঁটতে হাঁটতে প্রাসাদের মতো একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির সামনে বেশ বড় লোহার গেট। গেটের একপাশে ছোট একটা রুম। সেখানে উর্দিপড়া, ভারী গোঁফওয়ালা এক দারোয়ানকে দেখা গেল। ঐ রুমের কার্নিশের নীচে দাঁড়ালে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারবে বলে দ্রুত ওর নীচে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যাপারটা সম্ভবত দারোয়ানের পছন্দ হয়নি।

'হাটো ইহাসে!'

হাঁক দিলো দারোয়ান।

না শোনার ভান করলো মুরশেদ মিয়া।

দারোয়ান ছাতা মাথায় নিয়ে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসেছে। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ রেগে আছে।

'বৃষ্টি থামুক, তারপর চলে যাবো,' নরম গলায় বলেছিল মুরশেদ মিয়া। হিন্দিতেই বলেছিল, দারোয়ান লোকটা সম্ভবত নেপালি হবে। ওর বাংলা বোঝার সম্ভাবনা খুবই কম।

'মালিক খুব তেড়া লোক, অচেনা মানুষ পছন্দ করে না, তুমি যাও,' দারোয়ান বলেছিল।

'সে তো এখানে নেই, তাহলে কেন ঝামেলা করছো, বৃষ্টি থামলেই চলে যাবো,' মুরশেদ মিয়া বলেছিল।

'তার চোখ খুব কড়া, ঐ জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখছো হয়তো। তুমি যাও তো,' দারোয়ান রীতিমতো ধাক্কা দিতে তেড়ে এলো।

রাগ হলেও কার্ণিশ থেকে সরে এলো মুরশেদ মিয়া। দাঁড়িয়ে রইল। গেটের পরে লম্বা একটা রাস্তা। সেই রাস্তার শেষ মাথায় জমকালো বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। দোতলা একটা বাড়ি। পাশ্চাত্যের স্থাপত্যে তৈরি। নীচতলাটা অন্ধকার। তবে দোতলার এক কোণায় একটা রুমে বাতি জ্বলছে। সেখানে জানালায় কেউ একজন তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমি ভেতরে যাবো, তোমার মালিক আমাকে ডাকছে,' দারোয়ানকে বলল মুরশেদ মিয়া।

দারোয়ান অবাক হলো তার কথায়। তবে মুরশেদ মিয়ার কথায় পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল জানালায় দাঁড়ানো মানুষটা হাত ইশারায় মুরশেদ মিয়াকে ভেতরে যেতে বলছে।

বিরক্ত হলেও কিছু করার নেই। গেট খুলে দিলো দারোয়ান। মুরশেদ মিয়া ভেতরে ঢুকল। সারা শরীর ভেজা বলে শীত করছে বেশ। কাঁধের ব্যাগটা ভিজে গিছে। সামান্য যা কিছু দিয়ে টুকটাক জাদু দেখাতো সব এখানেই আছে। আবার এগুলো সব নতুন করে কিনতে হবে।

দারোয়ানের পেছন পেছন সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মুরশেদ মিয়া। বড় কাঠের দরজা। নানা কারুকার্য করা। সাপ, সিংহ, শেয়াল এই ধরনের প্রানীগুলো আধিক্য এসব কারুকার্যে। দারোয়ান টোকা দিতেই বড় দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। অল্প বয়েসী একটা ছেলেকে দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেমানুষ এতো সুন্দর হয় এর আগে এই ছেলেকে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। পরনে কালো কোট-টাই, মাথার চুল কুচকুচে কালো, ব্যাকব্রাশ করা। এই ছেলেই কী জানালা থেকে ডেকেছে? এই বাড়ির মালিক?

'ভেতরে আসুন,' ছেলেটা বলল।

ইতস্তত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল মুরশেদ মিয়া। বৃষ্টিতে ভেজা বলে সে যেখানেই যাচ্ছিল জায়গাটা ভিজে যাচ্ছিল। এরকম ঝকঝকে তকতকে একটা বাসা শরীর বেয়ে চুইয়ে পড়া বৃষ্টির পানিতে নোংরা করতে ইচ্ছে করছিল না।

'ভিজুক, কোন সমস্যা নেই।'

ছেলেটার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকল মুরশেদ মিয়া। ছেলেটা দরজাটা ধীরে ধীরে লাগিয়ে দিল।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে মুরশেদ মিয়া এটা বড় একটা হল রুম। দুপাশ দিয়ে সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। রুমের মাঝখানটা ফাঁকা, দু'পাশে চমৎকার দুই জোড়া সোফা। মাথার ওপর ঝাড়বাতি জ্বলছে।

ছেলেটা একটা সোফায় গিয়ে বসল। মুরশেদ মিয়াকে ইশারা করল অন্য একটা সোফায় বসতে।

'আপনি বাঙালি?'

'হ্যাঁ।'

'এতোদূর দিল্লিতে কী করছেন?'

ছেলেটা পরিস্কার বাংলায় কথা বলছে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় লোকজনই বাংলা বলতে পারে, কিন্তু তাদের কথায় একটা টান থাকে যা থেকে বোঝা যায় বাংলা তাদের মাতৃভাষা নয়। কিন্তু এই ছেলের সেরকম কোন টান নেই। মুখভর্তি কালো দাড়িগোঁফ, টানা নাক, তীক্ষ চোখ, আর সেই চোখের শীতল চাহনি দেখে কেন জানি অস্বস্তি লাগছিল মুরশেদ মিয়ার। মনে হচ্ছিল, ঐ চোখের আড়াল থেকে যে দেখছে তাকে, সে অন্য কেউ। এই ছেলে নয়। এই ছেলের দেহের ভেতর প্রাচীন কেউ আছে, খুবই অভিজ্ঞ কেউ।

'বেড়াতে এসেছি, দিল্লি খুব সুন্দর।'

'পেশা কী?'

'পথে পথে খেলা দেখাই। তাসের জাদু, দড়ির জাদু এইসব।'

'তাতে আয় রোজগার হয়?'

'আমার খুব বেশি চাহিদা নেই, তাই চলে যায়।'

'খুব বেশি চাহিদা নেই কেন?'

'জানি না,' আমতা আমতা করে বলল মুরশেদ মিয়া, 'আমি চলে যাচ্ছিলাম। এই বাড়ির মালিক আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনি কি তাকে জানাবেন একটু।'

'এই বাড়ির মালিক আমি,' বলে হাসল ছেলেটা, 'আমিই আপনাকে ডেকেছি।'

'কেন ডেকেছেন জানতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন,' বলল ছেলেটা, 'তবে তার আগে একটা কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ?'

'আগে আমরা খাওয়া-দাওয়া করবো। তারপর।'

'কিন্তু..'

'না শুনতে আমি অভ্যস্ত নই, মুরশেদ মিয়া।'

মুরশেদ মিয়া চমকাল। এই ছেলেকে সে তার পরিচয় বলেনি। পরিচয় জানার প্রশ্নই আসে না।

'আপনি আমার নাম কিভাবে জানেন?'

'আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি,' ছেলেটা বলল, 'তবে সেসব কথা পরে। আগে খাওয়া-দাওয়া। আপনি রাতে কিছুই খাননি।'

দরজার দিকে তাকাল মুরশেদ মিয়া। ইচ্ছে করছিল একছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে।

কিন্তু পরক্ষনেই আবার মনে হলো, শক্তিতে এই ছেলে তার সাথে কোনমতেই পারবে না। কাজেই থেকে যাবার ঝুঁকি নেয়া যায়। দেখা যাক না, আসল ঘটনা কী?

দোতলার সেই কোনার ঘরে বসে আছে মুরশেদ মিয়া। একজন লোক এসে তোয়ালে দিয়ে গিয়েছিল। তা দিয়ে মাথা, হাত-পা মুছে একটু সুস্থির হয়েছে। এই রুমটা আসলে বড় একটা ডাইনিং রুম। মাঝখানে বড় ডাইনিং টেবিল। ঘরের এক কোনায় কারুকাজ করা কাঠ দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা। সেখানে নানা মাপের নানা ধরনের বোতল রাখা। না বললেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না এগুলো মদের বোতল। এখানেও চমৎকার একটা ঝাড়বাতি জ্বলছে। একপাশে সুন্দর বারান্দা। বাইরে থেকে ফুরফুরে বাতাস আসছে। লাল পাগড়ি আর সাদা উর্দি পরনে একজন এসে খাবার-দাবার সব বেড়ে দিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে মাত্রই সব রান্না করে নিয়ে আসা হয়েছে। একসাথে খাবারের এতোগুলো পদ এর আগে দেখেনি কখনো। তাই এক দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ দেখে নিলো। বেশ কয়েকবছর হলো গ্রাম ছেড়েছে। তারপর আর সেভাবে ভালো মন্দ খাওয়া হয়নি। আজ চোখের সামনে এতো খাবারের সমাবেশ দেখে রীতিমতো লোভই লাগল।

কাবাব, পোলাও, বিরিয়ানী, ফিরনি, মাছের ঝোল, বড় চিংড়ি, ডিমের তরকারি সবই আছে। ছেলেটা তেমন কিছু নিচ্ছে না। অল্প ক'টা ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। খাওয়া নিয়ে মুরশেদ মিয়ার কোন লজ্জা নেই। সে নিজের মতো তুলে নিচ্ছে। খিদেও পেয়েছিল বেশ। এই বৃষ্টি কখন থামবে সেই অপেক্ষায় থাকলে আজকে রাতে হয়তো খাওয়া হতো না। না খেয়ে ঘুমানোর অভিজ্ঞতা একেবারে নেই তা নয়, তবে সে অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর কিছু নয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষে বারান্দায় গিয়ে বসল দুজন। বৃষ্টি এখনো থামেনি। ঝিরঝিরি পড়ছে। বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে মুরশেদ মিয়া টের পেল তার খুব ঘুম আসছে। তবে এই বৃষ্টিতে বাইরে বেরুতে হবে এটা ভাবতেই অস্বস্তি হচ্ছিল। এখান থেকে পুরনো দিল্লিতে তার থাকার ঘর অনেক দূরে।

'আপনি এখানে থেকে যেতে পারেন,' ছেলেটা বলল। সে এখন সুদৃশ্য কাঁচের গ্লাসে সোনালি তরল পান করছে। এরকম একটা গ্লাস মুরশেদ মিয়ার হাতেও আছে।

'আপনি কে? আমাকে কিভাবে চেনেন?' জিজ্ঞেস করল মুরশেদ মিয়া।

ছেলেটা একটা চুরুট ধরালো।

'আমি সেটা এখন বলবো না, আপনি আজ এখানে থাকেন, তারপর আস্তে আস্তে সব জানবেন।'

'যদি না থাকি?'

'কেন্দুং-এ একটা ঘটনা ঘটেছিল, আপনার মনে আছে?'

'কোন ঘটনা?'

'আপনি মৃতপ্রায় একটা মেয়েকে বাঁচিয়ে তুললেন।'

'সে ঘটনা আপনার জানার কথা নয়।'

'এমন অনেক কিছুই আমার জানার কথা নয়, কিন্তু আমি জানি।'

'হ্যাঁ, ঘটনা মনে আছে।'

'আপনি কাউকে দেখেছিলেন, এমন কাউকে যাকে আপনার দেখার কথা নয়।'

'হ্যাঁ। দেখেছিলাম।'

'ভালো। আপনি এখানেই থাকবেন। তারপর দেখা যাক।'

'তারমানে আমি এখানে বন্দি।'

'এভাবে বলবেন না। আপনি উপযুক্ত সঙ্গি পাবেন। আপনার ভালো লাগবে।'

বিস্ময়ের সাথে মুরশেদ মিয়া বারান্দায় তৃতীয় একজন উপস্থিতি লক্ষ্য করলো। গ্লাসটা শক্ত করে ধরে রেখেছিল, না হলে হাত থেকে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। জাহাঙ্গীর জাদুকর দাঁড়িয়ে আছে। পরনে দামী পোশাক, হাতে একটা ছড়ি, মাথায় লম্বা কালো টুপি। মুরশেদ মিয়ার দিকে অভিবাদন দেয়ার মতো ঝুঁকল একটু।

'আপনাকে স্বাগতম, মুরশেদ। অনেক দিন পর দেখা!' জাহাঙ্গীর জাদুকর বলল।

***

চোখ খুললেন মুরশেদ মিয়া। তার বয়স এখন সত্তুর হলেও স্মৃতি এখনো প্রতারণা করেনি। বরং এখনো আগের মতো সতেজ, স্বাভাবিক। চোখ বুজলে এখনো সেই মানুষগুলোর মুখ পরিস্কার দেখতে পান। সেই কবে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে এতোদিন পর স্মৃতিচারনের একটা উদ্দেশ্য আছে। ইদানীং যা ঘটতে যাচ্ছে তার সাথে ফেলে আসা অতীতের কোন সংযোগ আছে। সেই সংযোগটা ঠিক কোথায় তা বের করতে হবে।

বিছানা ছেড়ে উঠলেন মুরশেদ মিয়া। ঠিক বারোটায় তিনি শুরু করবেন কাজটা। তার আগে একটু মানসিক প্রস্তুতি নেয়া যাক।

ঘরের ঠিক মাঝখানে চোখ বন্ধ করে বসলেন তিনি। মন স্থির করলেন একটা বিন্দুতে। সমস্ত মনোযোগ ধীরে ধীরে সেই বিন্দুতে এসে স্থির হলো। শরীর শীতল হতে শুরু করেছে। তিনি অনুভব করলেন বড়সড় একটা বিপদ কোথাও ওৎ পেতে আছে। সুযোগ বুঝে আক্রমণ করবে। এই মুহূর্তে সাহায্য দরকার। সাহায্যের জন্য ওর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই।

অধ্যায় ১৩

আমাদের সব কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এমনকি আমরা অনেক সময় যা চোখে দেখি, কানে শুনি বা অনুভব করি সেখানেও আমাদের কিছু করার থাকে না। অনুভূতি খুব বিভ্রান্তিকর জিনিস। অন্তত এই মুহূর্তে সালাম তাই ভাবছে।

সে দাঁড়িয়ে আছে বড় একটা হল রুমের মাঝখানে। আশপাশে কেউ নেই। মাথার ওপর ঝকঝকে ঝাড়বাতি, দু'পাশে সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে গেছে। বড় বড় থাম, মাথার অনেক উপরে ছাদ। হলরুমটা শুন্য, তবে হঠাৎ মনে হলো, পর্দার পেছন থেকে, দরজার পাশ থেকে কিংবা থামগুলোর আড়াল থেকে অজস্র চোখ তাকে দেখছে।

তার পরনে দামী পোশাক। সাদা শার্ট, নরম কাপড়ের তৈরি কোট, প্যান্ট, পায়ে শক্ত, চকচকে জুতো। পুরো শরীর জুড়ে হাল্কা একটা সুগন্ধ। মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো।

আয়নার মতো ঝকঝকে মেঝেতে হাঁটতে গিয়ে টের পেল প্রতিটা পদক্ষেপের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে চারপাশে। শুন্যে সে প্রতিধ্বনি দূরে কোথাও মিলিয়ে যাচ্ছে।

অথচ একটু আগেও সে এখানে ছিল না। মুহূর্ত পূর্বে সে ছিল কুদ্দুসের সাথে। সেখানে দরজা ভেঙে কেউ ঘরের ভেতর ঢুকে ছিল। তারপর কী হলো?

'সালাম, তোমাকে স্বাগতম,' ভারি কণ্ঠে কেউ বলল।

কণ্ঠটা কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারল না সালাম। চারপাশে তাকাল। কেউ নেই। 'তুমি খুব সাধারন কেউ নও, তুমি বিশেষ কেউ। বিশেষ কিছু।'

কথাগুলো ঠিক মাথার ভেতর শুনতে পেল সালাম। কেউ যেন তার মস্তিষ্কের ভেতর বসে কথাগুলো বলছে। দৌড় দিল সালাম। মনে হলো

একটা থামের আড়ালে কাউকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু গিয়ে দেখল কেউ নেই।

কেউ খেলছে তার সাথে? কিংবা সে স্বপ্ন দেখছে? এর বাইরে আর কিছু ভাবতে পারছে না সালাম।

'তুমি একা নও, নিজের শক্তিকে বোঝো। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

'কিসের শক্তি! কী বলছেন? আপনি কে?'

উত্তর এলো না। চারদিকে আবার শুনশান নিরবতা। যতোটা সম্ভব কম শব্দ করে দরজার দিকে এগুলো সালাম। কেউ কড়া নাড়ছে।

দরজার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল সালাম। কড়া নাড়ার শব্দটা বাড়ছে। মনে হচ্ছে বিপদগ্রস্ত কেউ আছে দরজার ওপাশে। তার উচিত দরজা খোলা। কিন্তু মন বলছে দরজা খুললে এমন কিছু বা কাউকে দেখবে যা তার দেখা উচিত নয়।

দরজা খোলার জন্য হাতলে হাত রাখল সালাম। কড়া নাড়া থেমে গেছে। বাইরে কোথাও অনেক জোরে বাজ পড়ল। চমকে হাত সরাল সালাম। দরজা খুলে গেছে আপনাআপনি। অতি বয়স্ক একজন মানুষ দরজার সামনে দাঁড়ান। লোকটার চোখে মুখে দারুন বিস্ময়!

'তুমি তো আজব প্রাণী দেখা যায়!'

সালাম চোখ খুলে দেখল কুদ্দুস ঝুঁকে আছে তার দিকে। লোকটার চোখেমুখে বিরক্তি আর বিস্ময় একসাথে খেলা করছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সালাম। বুঝতে পারছে না কী হয়েছে, কোথায় আছে! তবে বুঝতে সময় লাগল না। পুরো লণ্ডভণ্ড হওয়া একটা ঘরে আছে সে। চারপাশে জিনিসপত্র এমনভাবে এলোমেলো হয়ে আছে মনে হচ্ছে এখানে কোন বড়সড় কোন ঝড় বয়ে গেছে।

'কি হইছিল? আমি কি ঘুমাই গেছিলাম নাকি?'

'হ। কিন্তু ঘটনা কী?'

'কিসের ঘটনা?'

'তুমি পিছে কারে নিয়া আসছো?'

'কে এসেছিল?'

'যে আসছিল তারে আমি উপযুক্ত শিক্ষা দিছি,' কুদ্দুস বলল।

সালাম লক্ষ্য করে দেখল কুদ্দুসের অবস্থা খুব একটা সুবিধার নয়। মাথার সব চুল এলোমেলো, চোখ-মুখ লাল হয়ে আছে। পরনের শার্ট-প্যান্টের এখানে সেখানে ছিঁড়ে গেছে। পেটের একপাশে রক্তের ছোপও দেখা যাচ্ছে। গলায় পাঁচ আঙুলের ছাপ স্পষ্ট।

'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'ঠিক আছি। কিন্তু এরা আবার আসবে।'

'কারা?'

'তোমার পিছনে যারা লাগছে।'

'আমার পেছনে লাগবে কেন?'

'সেইটা তুমিই ভালো জানো।'

সালাম সোফায় শুয়ে ছিল। উঠে পড়ল। দরজার দিকে তাকাল। এই দরজা ভেঙে কেউ ভেতরে ঢুকেছিল। তারপর কুদ্দুসের সাথে দারুন একটা লড়াই হয়। অথচ এই পুরো ঘটনার সময় সে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। এটা কিভাবে সম্ভব? লড়াইয়ের পরিণতি কী হয়েছে সেটা আন্দাজ করতে পারছে। এখানে কে এসেছিল এটাও আন্দাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে না। সমস্যা হচ্ছে শংকর কিভাবে এতোদূর পিছু নিয়ে চলে এলো! সেই রাজাবাজার এলাকায় ওকে শেষবার দেখেছিল।

এই ঘরটাকে দু'ভাবে দেখেছিল সালাম। একটা ছিল খুবই ঝকঝকে, আরেকটা ছিল প্রায় দীনহীন ভাঙাচোরা অবস্থা। অথচ এখন এই দুটো অবস্থার কোনটাই নয়। ঘরটা খুব স্বাভাবিক একটা ঘর। জিনিসপত্রের বাড়াবাড়ি নেই। সবকিছু স্বাভাবিক।

দরজাটা কোনমতে ঠিক করেছে কুদ্দুস। তবে ঘরের অবস্থা ঠিক করতে সময় লাগবে। জিনিসপত্রের বেশিরভাগই ভেঙ্গেচুড়ে গেছে। মেঝেতে জায়গায় জায়গায় রক্তের ছোপ।

'তুমি এখন ঘুমাও, সকালে তোমারে নিয়া কাজ আছে,' কুদ্দুস বলল।

'কী কাজ?'

'সেইটা পরে শুনবা।'

'আপনে কী করবেন?'

'আমি ঘরদোর গুছামু। তুমি যাও, ঘুমাও।'

ইচ্ছে না থাকা স্বত্ত্বেও বিছানার এক কোণায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সালাম।

ভেবেছিল ঘুম আসবে না, অথচ বালিশে মাথা ঠেকানোর সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম ভাঙল পাখিদের কলকাকলিতে। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে সালামের মুখে। বিছানায় উঠে বসেই ঘরের দিকে তাকাল সালাম। দেখল পুরো ঘর গোছানো। কোথাও এলোমেলো কিছু নেই। সোফায় শুয়ে আছে কুদ্দুস। গতরাতের কাপড়-চোপড় পরনে। লোকটাকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। ঢাকায় আসার পর থেকে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা হয় না। এখানে বড় উঠোন নেই, বাড়ির পাশে পুকুর নেই। সকালের ভেজা ঘাসে হাঁটার অনুভূতি এখানে পাওয়া যাবে না। এখানে শুধুই ব্যস্ততা।

দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল সালাম। মনে হচ্ছে এটা ঠিক ঢাকা শহর নয়, মিরপুর তো নয়ই। বাইরে সরু একটা মেঠো পথ। চারপাশে অজস্র গাছপালা। যতোদূর চোখ গেল কোথাও কোন মানুষজন বা বাড়িঘর চোখে পড়ল না। অথচ গত রাতে কুদ্দুসের সাথে যখন এই বাড়িতে এসেছিল, তখন মিরপুর দশ নাম্বার মোড় থেকে খুব বেশি দূর হাঁটতে হয়নি।

মেঠোপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পাশের মাঠে নেমে গেল সালাম। ভেজা ঘাসের ওপর হাঁটার ইচ্ছে ছিল। অন্তত হলেও সেই ইচ্ছেটা পূরণ হয়ে গেল। শিশিরভেজা ঘাস মাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল সালামের। মাঠের শেষ প্রান্তে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালাগুলো অনেকদিন ধরে না দেখা দু:স্বপ্নটাকে মনে করিয়ে দিল!

ঠিক এইরকম একটা মাঠের স্বপ্নই সে দেখে যেখানে কালো আলখেল্লাধারি কেউ একজন লাঠি হাতে নিয়ে তাকে মারতে আসে। এটাই সেই মাঠ! ঐ সে ঘন বন!

'রাস্তায় দাঁড়ায়া কি করো?'

প্রশ্নটা শুনে পেছনে তাকাল সালাম। দেখল কুদ্দুস দাঁড়িয়ে আছে। মুখভর্তি টুথপেস্ট আর হাতে টুথ ব্রাশ নিয়ে

উত্তর দেয়ার আগে সালাম টের পেল সে কোন মাঠে দাঁড়িয়ে নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে একটা রাস্তার পাশে। পাশ দিয়ে দ্রুত গতিতে একটা মোটর বাইক চলে গেল, আরোহী খুব বিরক্তি নিয়ে তাকাল তার দিকে। রাস্তার মাঝখান থেকে সরে না এলে বাইকের ধাক্কা খেতে হতো নিশ্চিত। ঠিক এই

রাস্তা দিয়েই গতরাতে এসেছিল। অন্ধকারে এসেছিল, তবু চিনতে ভুল হচ্ছে না। রাস্তার দু'পাশেই এক তলা দোতলা বাড়িঘর। কয়েকটা টিনের ঘরও আছে। লোকজন বাসাগুলো থেকে বেরুতে শুরু করেছে। তবে সবাই ব্যস্ত। কেউ সালামের দিকে তাকিয়ে নেই।

অথচ একটু আগেই একটা মাঠ দেখছিল সালাম, মাঠের শেষ প্রান্তে সেই ঘন বন! এখন আবার সব হাওয়া।

'আমি কি কোন মানসিক সমস্যায় ভুগছি?' মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করল সালাম। তবে এই প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

'আগে হাত-মুখ ধোও, তারপর নাস্তা করি,' কুদ্দুস বলল।

'আমার মাথায় কিছু একটা হইছে,' সালাম বলল, 'আমি উল্টাপাল্টা দেখতাছি।'

'উলটাপাল্টা কি দেখ?'

'আপনেরে বুঝায়া বলতে পারতেছি না।'

'বললেই বুঝবো।'

'আমি যা দেখি সেইটা আপনে বুঝবেন না। ধরেন, একটু আগেই দেখলাম আমি মাঠের মইধ্যে দাঁড়াইয়া আছি। ঐ দিকে একটা ঘন জঙ্গল।'

'আর কি?'

'কালা জোব্বা পড়া কেউ আমারে মারতে আসতেছে।'

'তার চেহারা দেখা যায়?'

'না।'

'এমন কিছু দেখছো যা দিয়া পরে তারে চিনতে পারবা?'

'তার চেহারাই তো দেখা যায় না। আর কিসের কথা বলছেন?'

'যেমন ধরো কোন চিহ্ন। তার কালো জোব্বায়, বা হাতে, পায়ে। কোথাও এমন কিছু দেখতাছ যা তুমি আগে দেখছো।'

'অন্ধকারের মইধ্যে দেখি। তাই চোখে পড়ে না,' সালাম বলল, 'তার হাতে একটা লাঠি থাকে। ঐ লাঠিটা দিয়া সে আমার মাথায় মারে।'

'তার সাথে তোমার গণ্ডগোলের কারন কী?'

'দুনিয়ার কারো লগেই আমার গণ্ডগোল নাই। তার সাথে গণ্ডগোল হইবো কোন কারনে।'

'অনেক কারনেই একজনের লগে আরেকজনের গণ্ডগোল থাকে। যা তারা নিজেরাই জানে না।'

'আপনে বলতে চান, ঐ লোকের সাথে আমার কোন ঝামেলা আছে?'

'হ, বড় ঝামেলা,' দাঁত বাশ করতে করতে কুদ্দুস বলল, 'কী ঝামেলা আছে সেইটা বাইর করাই আমাদের কাজ।'

'আপনে এই কাজ কেন করবেন? এই ঝামেলা তো আপনের না। আপনে তো কিছু দেখেন না।'

'কে কইছে? আমি যা দেখি তা অনেকেই দেখে না।'

'যেমন?'

'থাক বাদ দেও। রেডি হও।'

'কিসের জন্য?'

'তোমারে নিয়া অনেক দূরে যামু।'

'কোথায়?'

'যেইখানে তোমার পেছনে লাগতে আসবে না কেউ।'

'বলেন না কই?'

'বিরক্ত করবানা। আমার এই ঘাঁটি তোমার কারনে ফাঁস হইয়া গেছে। এইখানে আর এক ঘন্টা থাকাও নিরাপদ না। ওরা আসছে।'

'কারা আসছে?'

কুদ্দুস কড়া চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে ঢুকে গেল। এই প্রথমবারের মতো সালামের মনে হলো, কুদ্দুসকে ঠিক যেরকম আত্মভোলা, পাগল ধরনের মানুষ মনে হয়েছিল, কুদ্দুস ঠিক তা নয়। কুদ্দুস ঠিক কী তা এখনো বুঝতে পারছে না। গতরাতে এই ঘরে একটা আক্রমণ হয়েছিল এটা নিশ্চিত। সেই আক্রমণ যে আবার হবে না তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। এই ঘর থেকে সরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে।

ঘরে ঢুকে পড়ল সালাম। বাথরুম থেকে ঝামেলা মিটিয়ে নাস্তা সারল। সোফার এক কোণায় তার ছোট ব্যাগটা পড়ে আছে। সেখানেই তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর জিনিসপত্র। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে কুদ্দুসের সাথে বাইরে এসে দাঁড়াল।

এক বেবিট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। উঠে পড়ল দুজন। ঠিক কোথায় যাচ্ছে

কোন ধারনা নেই সালামের। তবে মনে হচ্ছে, সালামের সাথে থাকলে কোন বিপদই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আপাতত সামান্য এই আত্মবিশ্বাসটাই সম্বল। একটু এদিক-সেদিক দেখলেই আবার পালাতে দ্বিধাবোধ করবে না।

জায়গাটা ঢাকার ভেতরেই। মিরপুর থেকে বেশি দূরেও নয়। তবে জায়গাটা এখনো গ্রামের মতো। নীরব, শান্ত। চারপাশে গাছগাছালি, পাখি। অনেকদিন পর চমৎকার এই গ্রাম্য পরিবেশে এসে বেশ ভালো লাগছিল সালামের। তবে অনেক পথ ঘুরে, কাদামাখা পথে হেঁটে, ক্ষেতের আইল ধরে এগিয়ে যে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তা দেখে কিছুটা হলেও কেপে উঠল সালামের বুক।

প্রাচীন একটা বাড়ি। শুধু ইট দিয়ে গড়া একটা ইমারত। যত্ন নেয়া হয় না বোঝাই যায়। বট-অশ্বত্থের শেকড়-বাকড় পুরো বাড়িটাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে যেন। দিনে-দুপুরেও এখানে কোন শব্দ নেই। এমনকি এতো গাছ থাকা সত্ত্বেও কোন পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না। বাড়িটার সামনে ছোট একটা উঠোন। উঠোনের প্রবেশমুখে কুদ্দুসের সাথে দাঁড়িয়ে আছে সালাম।

এখানে কোথায় থাকার ব্যবস্থা? এই বাড়ি যে থাকার অযোগ্য তা ভেতরে না ঢুকেও বলে দেয়া যায়। মরে গেলেও তো এখানে থাকবে না সে। কুদ্দুস এখানে আগে এসেছে কিংবা হয়তো নিয়মিত যাতায়াত আছে। তাই এখানে আসার পথ সহজে চিনতে পেরেছে। কোন কোন পথ ধরে এখানে এসেছিল কিছুই মনে নেই সালামের। এখান থেকে একা ফিরতে হলে কোনমতেই ফিরতে পারবে না এটা নিশ্চিত।

বাড়িটা দোতলা। কোন এক কালে হয়তো বিশাল কোন জমিদার বাড়ি ছিল। কালের স্পর্শে এখন শুধু কংকালটা টিকে আছে।

কুদ্দুস চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কোন কথা বলছে না। যেন কারো অপেক্ষা করছে। উখখুশ করছিল সালাম। সে কথা বলতে যাবে চোখের ইশারায় নিষেধ করলো কুদ্দুস। তাকিয়ে থাকতে বলল সামনের দিকে।

বাড়িটার দিকে একটানা তাকিয়ে থাকতে বিরক্ত লাগছিল। কুদ্দুসের চেহারায় বিরক্তি নেই। বরং সেখানে ভয় মিশ্রিত এক ধরনের শ্রদ্ধা লক্ষ্য করেছে সালাম। এই লোকটাকে এখনো বুঝতে পারছে না। লোকটার চাল-

চালন, কথা-বার্তা কিংবা আচরন খুব স্বাভাবিক ধরনের হলেও মানুষটা খুব সাধারন কেউ নয়। গতকাল রাতে যে আক্রমনটা হয়েছিল, সেটা কিভাবে যেন ঠেকিয়ে দিল। এমনকি সালাম যাতে সেই আক্রমন-প্রতি আক্রমনের কিছু না দেখে সে জন্য সালামকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। হ্যাঁ। সালাম বিশ্বাস করে গতরাতে সে যে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল, এটা মোটামুটি অসম্ভব ব্যাপার। সালাম রাত জাগতে পছন্দ করে ছোটবেলা থেকেই। রাত হচ্ছে রহস্যের রাণী। অনেক রহস্যের জট খোলে রাতে। তাই রাতটা শুধু ঘুমিয়ে কাটাতে চায় না সে। অথচ একটা ঘটনার মাঝখানে কি চমৎকারভাবে সে ঘুমিয়ে পড়ল এবং একটা স্বপ্নও দেখে ফেলল!

উঠোনের একপাশ থেকে ধীরে ধীরে পা ফেলে যে অবয়বটা হেঁটে আসছিল, তাকে দেখে হাঁটু গেড়ে বসল কুদ্দুস। সালামকেও ইশারা করল বসার জন্য। কিছু না বুঝেই হাঁটু গেঁড়ে বসল সালাম। সামনের দিকে তাকাল।

লোকটা হেঁটে আসছে। তবে দেখে মনে হচ্ছে হাওয়ায় ভেসে আসছে যেন। কালো কাপড়ে পুরো শরীরটা মোড়া। হাত দুটো সামনের দিকে বাড়ান। মুখভর্তি সাদা দাঁড়ি, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা জটা চুল। জোড়া ভ্রু, কপালে লাল তিলক কাটা। চোখ দুটো আধখোলা। মুখে স্মিত হাসি। মুখমন্ডল লম্বাকৃতি। চেহারাটা দেখে বুকের মধ্যে কোথাও ভয় খেলে গেল। এই চেহারাটা আগে কোথাও দেখেছে সালাম। অথচ মনে করতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর মনে পড়তেই স্থির হয়ে গেল সে।

গতকাল স্বপ্নে দরজা খুলে এই বৃদ্ধটিকেই দেখেছিল। ঠিক এই চেহারা। পরনের পোশাক পর্যন্ত এক। এই চেহারা সে কিভাবে ভুলবে!

অধ্যায় ১৪

মুরশেদ মিয়ার ধ্যান ভাঙল বারোটার কাছাকাছি। ঢাকা এতো ব্যস্ত শহর যে এই রাতেও আশপাশে থেকে শব্দ ভেসে আসে। রিক্সার টুংটাং কিংবা বেবিট্যাক্সির চাকার ভনভনানি থেকে এই শহরের বাসিন্দাদের মুক্তি নেই। রাত মানেই এখানে নিশ্ছিদ্র নিরবতা নয়।

তিনি মেঝে থেকে উঠে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন ঘরে। বাতি জ্বালালেন। বিছানার ওপর ব্যাগ ছিল। ব্যাগ খুলে লাঠিটা বের করলেন। আজ অনেকদিন পর ডান দিকের প্রথম রুমের তালা খুলবেন। না খুলে উপায় নেই। গত পনেরো বছরে এই নিয়ে তিনবার খুলেছেন ঐ রুমের তালা। ভেতরে ঢুকেছেন মাত্র একবার।

আজ চতুর্থ বারের মতো ঢুকতে যাচ্ছেন বলে বুকের মধ্যে আলাদা একটা চাঞ্চল্য অনুভব করছেন। ভেবেছিলেন চাঞ্চল্য জিনিসটা তার জীবন থেকে একেবারেই হারিয়ে গেছে। ধারনাটা ভুল। সেই তরুণ বয়সে যে চাঞ্চল্য অনুভব করতেন নতুন কিছু করতে গিয়ে আজ অনেকদিন পর তা অনুভব করছেন।

ডানদিকে একটা কাঠের আলমারি আছে। আলমারিটা খুললেন। নীচের ড্রয়ারটা খুললেন। ফাঁকা একটা ড্রয়ার। পুরো ড্রয়ারটা টেনে বের করে আনলেন। ফাঁকা জায়গাটা হাত বুলালেন কিছুক্ষণ। ডান পাশে ছোট দানার মতো একটা জিনিস আছে। অনেকক্ষণ হাতড়ে সেটা পেলেন। পরপর তিনবার চাপ দিলেন সেখানে। ফাঁকা অংশে আরেকটা ড্রয়ার বেরিয়ে এলো। এই ড্রয়ারটা লুকানো এবং ভাঁজ করা অবস্থায় থাকে আলমারির ভেতরে। বিশেষ ঐ জায়গায় পরপর একই লয়ে চাপ না দিলে এই ড্রয়ার বের হয় না। ড্রয়ারটা কাঠের নয়। পাতলা এলুমিনিয়াম আর লোহার মিশ্রণে তৈরি। ঠিক মাঝখানে লম্বা, খাঁজকাটা পুরনো আমলের একটা চাবি। আলতো করে চাবিটা তুলে আনলেন।

চাবিটা সোনালি রঙের হলেও এটা স্বর্ণের নয়, পিতলের। এর গায়ে

অসংখ্য খাঁজ। খাঁজগুলোতে হাত বুলাতে বুলাতে আলমারিটা লাগিয়ে দিলেন।

বিশেষ কিছু সময়ে এবং বিশেষ ব্যক্তির হাতেই এই চাবিটা কাজ করবে। তিনি হেঁটে ডানদিকের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দরজায় বিশাল একটা তালা ঝুলছে। চাবি ঢোকানোর গর্তটা ছোট একটা লোহার পাত দিয়ে ঢাকা। লোহার পাতটা এমনি সাধারন দেখতে মনে হলেও সাধারন নয়। এটা বিষধর একটা জিনিস। চাবি ঢোকানোর আগে এই পাতটা সরাতে হয়। কিন্তু সবাই এই পাত সরাতে পারে না। মুরশেদ মিয়ার বদলে অন্য কেউ এই পাত সরাতে গেলেই এই পাত আঘাত করবে। লোহার এই পাতটা দারুন মাত্রায় বিষ ধারন করে। এর আঘাত থেকে যে ক্ষত তৈরি হবে সেখান দিয়ে দ্রুতই সেই বিষ সারা শরীরে ঢুকে মেরে ফেলবে। এর আগে একবারই এমন ঘটনা ঘটেছিল। মনজুরের বাবার সময় এক কাজের লোক সাধারন এক চাবি দিয়েই এই ঘরে ঢুকতে চেয়েছিল। ভেবেছিল তালাবদ্ধ এই ঘরে নিশ্চয়ই কোন সোনা-দানা লুকিয়ে রেখেছেন মুরশেদ মিয়া। নইলে এই ঘর নিয়ে এতো রাখ-ঢাক কেন। কিন্তু সে বোঝেনি এই তালা খুলতে গেলে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। যাই হোক, পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই এই লোকটার লাশ দেখে মনজুরের বাবাকে জানান। তারপর সেই লাশের সুব্যবস্থা করতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল। বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসতে হয়েছিল। মনজুর এই ঘটনা জানে না। তবে ওর মনে অস্পষ্ট কিছু ভয় আছে এই বদ্ধ ঘরগুলো নিয়ে। সে তাই নিজে কখনো উপরে আসে না এবং সহজে কাউকে আসতে দেয় না। ব্যতিক্রম ওর স্ত্রী। মেয়েটা এতো একরোখা যে ওকে আটকানোর সাধ্য মনজুরের নেই। আর মুরশেদ মিয়া জানেন মনজুরের স্ত্রী আর যাই করুক, লুকিয়ে এই ঘর খুলে দেখার মানসিকতা ঐ মেয়ের নেই।

দরজার তালাটা হাতে নিয়ে দারুন শীতল লাগল মুরশেদ মিয়ার কাছে। এই তালাটা তিনি নিজ হাতে বানিয়েছেন। অন্য কারো হাতে এই তালা কোনদিনই খুলবে না, যতই এই চাবি থাকুক না কেন। তালাটা লোহার তৈরি এবং ভারি। দারুন সব কারুকার্য করা। কারুকাজগুলো করতে নিজের স্মৃতিশক্তির সাহায্য নিতে হয়েছে। কোন এক কালে পুরো ভারতবর্ষ ঘুরে বেরিয়েছিলেন বলে এখানকার সবগুলো আদিশক্তি নিয়ে তার পরিস্কার

ধারনা আছে এবং সেই ধারনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই তালায়।

চাবিটাও নিজ হাতে বানানো। এই রকম চাবি আরেকটা আছে। সেটা আরেকটা বন্ধ ঘরের জন্য। আপাতত সেই ঘর খোলার কোন টার্গেট তার নেই। আপাতত এই ঘরটা খুলে দেখতে হবে। সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

লোহার পাতটা হাত দিয়ে সরালেন। দীর্ঘদিন পর তার হাতের স্পর্শ পেয়েছে তালাটা। তালার গর্তে চাবি ঢুকিয়ে মোড়চ দিলেন। দুইবার ডানদিকে, একবার বামদিকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বা দিকে মোচড় দিতেই তালা খুলে গেল।

তালাটা খুলে মৃদু ধাক্কা দিয়ে দরজা খুললেন। ভেতরে নিকষ অন্ধকার।

***

দীর্ঘদিনের গুমোট একটা ভাব ঘরে। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে শুধু। সময় এখানে কেমন স্থির হয়ে আছে যেন। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতে ঘরের বাম দিকের কোণার দিকে তাকালেন। দেয়ালের সাথে মিশে থাকা ছায়াটা চোখ এড়াল না।

এর আগেও এই ঘরে পা রেখেছেন। অকুতোভয় মুরশেদ মিয়া তবু সেই ছায়া দেখে একটু কেঁপে উঠলেন। এগুবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। এক পা এক পা করে বাম দিকের কোণার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ছায়াটা একপাশে খানিকটা সরে গেল। তিনি দাঁড়ালেন। ঘরে আগে কোন শব্দ ছিল না। এখন একটা ফিসফিসানি ভেসে বেড়াচ্ছে।

'মুক্তি দে, মুক্তি দে, তোর রক্ত খাবো, মুক্তি দে...'

ছায়াটা দেয়ালের সাথে প্রায় মিশে আছে। তিনি আরেকটু এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসলেন। সাথে সাথে ছায়াটা তীব্র বেগে এগিয়ে গেল। ছায়াটা একটা যন্ত্রনাকাতর মুখের। সেই কুৎসিত আর বীভৎস দেখতে চেহারাটা মুরশেদ মিয়ার মুখের দুই ইঞ্চি সামনে আটকে গেল। ধারাল দাঁত বের করে মুরশেদ মিয়ার মুখটা খুবলে খাওয়ার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শেকলে বাঁধা বলে কোনভাবেই সেই অল্প দূরত্বটা কমাতে পারল না।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মুরশেদ মিয়া। নিরাপদ দূরত্বে বসে পড়লেন।

'মুক্তি দে, আমারে ছাড় হারামজাদা, আমি তোর হাড়মাংশ খাবো...'

যন্ত্রনাকাতর মুখটা থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসছিল। প্রচন্ড রাগ আর ঘৃণা সেই মুখটার প্রতিটি কোষে মিশে আছে।

'আর কয়েকটা দিন,' ফিসফিস করে বলল মুরশেদ মিয়া।

'আমি তোকে পিষে মারবো, তোর নাড়ি-ভূড়ি টেনে টেনে ছিঁড়বো...' কর্কশ কণ্ঠে কথাগুলো ভেসে এলো।

'আর কয়েকটা দিন, তারপর এই যন্ত্রণা থেকে তোর মুক্তি মিলবে,' মুরশেদ মিয়া বললেন, 'আমি তোকে আর কষ্ট দেবো না।'

'তুই একটা কুকুর, তুই একটা হারামি...'

স্রোতের মতো গালি বেরিয়ে আসছিল ঐ কুৎসিত মুখটা থেকে।

'এরপরের অমাবস্যায়। আমি তোকে চিরতরে মুক্তি দেবো।'

'আমাকে মুক্তি দিলে তুইও মরবি রে হারামজাদা, তোর হাড়-মাংস খাবো...'

এসব হুমকি-ধামকিতে অভ্যস্ত মুরশেদ মিয়া। তিনি আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। কুৎসিত মুখটা এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছে তাকে আক্রমন করতে, কিন্তু এমন বাঁধনে বেঁধেছেন সর্বশক্তিতে চেষ্টা করেও ঐ বাঁধন খুলে আর এক সূতোও এগুতে পারবে না।

ফতুয়ার পকেটে দেয়াশলাই ছিল। সেটা জ্বালালেন মুরশেদ মিয়া। আগুন জ্বলে উঠতেই ছায়াটা কিছুটা দূরে সরে গেল। মনে হলো আগুনকে ভয় পেয়েছে।

'এই আগুনের কসম, দুনিয়াতে তোর মতো কুলাঙ্গারের দরকার নাই। তোর সময় ঘনিয়ে আসছে,' গমগমে ভারি গলায় বললেন মুরশেদ মিয়া। শুন্য ঘরটার দেয়ালে কথাগুলো যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার তার কাছেই ফিরে এলো।

'শালা, কুকুরের বাচ্চা কুকুর,' হিসহিসিয়ে বলল কুৎসিত ছায়াটা, 'তোর হাতে সময় নেই। আমি মুক্তি পাচ্ছি শিগগির। যা করার করে নে। আর সময় নেই।'

পৃথিবীতে আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি থেকে। যে কুৎসিত আর বীভৎস ছায়ার সাথে এই সব কথোপকথন হচ্ছে তাতে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে কে কোন দলে পড়তে যাচ্ছে।

কাঠিটা নিভে যেতে আবার আক্রমন করতে উদ্যত হলো ছায়াটা। কিন্তু

সাথে সাথেই আরেকটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালালেন মুরশেদ মিয়া। ছায়াটা আবার সরে গেল।

'তোকে মুক্ত করবে কে?'

'তুই সাবধানে থাকিস, তোর সময় ঘনিয়ে এসেছে,' চাঁপা গলায় উত্তর এলো।

'আমাকে বল।'

'আর কয়েকটা দিন। সব তৈরি হচ্ছে। আলামত টের পেয়েছিস নিশ্চয়ই।'

'কিসের আলামত?'

'তুই মিথ্যেবাদি, কাপুরুষ।'

মুরশেদ মিয়া আলামত টের পেয়েছেন। সেই রাতে ঐ আক্রমনটার কথাই ইঙ্গিত করছে ছায়াটা। কিন্তু তিনি স্বীকার করলেন না।

এই ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই, এমনকি লাইট বা ফ্যানও নেই। জানালা আছে ডানদিকে একটা। সেটাও সিমেন্ট দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছেন পনেরো বছর আগে। এই ঘরে বাইরে থেকে কোন বাতাস ঢোকে না।

উঠে দাঁড়ালেন। এই রুমটাকে আরো সুরক্ষিত করতে হবে। হুমকি যখন দিয়েছে, তখন বুঝতে হবে কোথাও কিছু হচ্ছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছেন বুঝতে পারছিলেন পেছনে বাঁধন ছেড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে ছায়াটা। জানে পারবে না, তবু চেষ্টা করে। তিনি পেছন ফিরে তাকালেন না।

দরজায় তালাটা ঝুলিয়ে চাবিটা আলমারির ড্রয়ারের সেই গোপন জায়গায় রেখে বিছানায় বসলেন। কেন জানি মনে হচ্ছে ঘুম আসবে না। বয়স বেশি হয়ে গেলে ঘুম আসতে চায় না। সারাক্ষণ কেবল ফেলে আসা জীবনের কথা মনে পড়ে।

সেদিন দিল্লির ঐ অচেনা বাড়িতে আচমকা জাহাঙ্গীর জাদুকরের সাথে দেখা হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি তরুণ মুরশেদ মিয়া। বারান্দায় হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো লোকটা! হয়তো আশপাশেই ছিল। অথচ এই লোকটার জন্যই গ্রাম ছেড়েছে। গত কয়েকবছর ভারতবর্ষের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে।

জাহাঙ্গীর পাশে এসে হাত রেখেছিল কাঁধে। লোকটার চেহারায় তেমন

কোন পরিবর্তন নেই। গায়ের রঙ আগেও ফর্সা ছিল, এখন আরো খোলতাই হয়েছে। দাঁড়ি-গোঁফ আগের চেয়ে ঘন আর একটু ভারি হয়েছে।

'তুমি বন্দি নও, এখানে ভালো থাকবে,' জাহাঙ্গীর বলেছিল, 'আমার খোঁজে এতো জায়গায় গিয়েছো। এবার আমার সাথে থাকো কিছুদিন।'

'আপনি জানতেন আমি আপনার খোঁজ করছি?'

'অবশ্যই জানতাম। দু'একবার তুমি খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলে।'

'তাহলে জানাননি কেন তখন?'

'সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'সঠিক সময়?'

'সব কাজেরই একটা সঠিক সময় আছে। তোমার সাথে আমার যখন দেখা হওয়া দরকার, তখনই দেখা হয়েছে।'

এসব কথার কিছুই বুঝতে পারছিল না মুরশেদ মিয়া। অল্প বয়স্ক ছেলেটা আকাশের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল। দুজনের কথোপকথন পরিস্কার শুনতে পেয়েছে।

'আমরা সবাই পৃথিবীতে এসেছি, আমাদের এই আসার পেছনে বড় কোন উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা জানি না, এমনকি জানতেও চাই না। এভাবে দেখতে দেখতে এক সময় আমরা মরে যাই,' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে ছেলেটা বলল।

'ছোট একটা মৌমাছিও কতো অবদান রাখে প্রকৃতিতে, অথচ আমরা অনেকে জানিই না জীবনে আমাদের কী করতে হবে!'

অল্পবয়সী একটা ছেলের মুখ থেকে কথাগুলো খুব ভারিক্কি শোনাচ্ছিল। কিছু বলল না মুরশেদ মিয়া।

'বড় কিছু করার পরিকল্পনা করার আগে ছোট ছোট কাজ করতে হয়,' ছেলেটা বলল, 'কাল থেকে আপনার প্রশিক্ষণ শুরু হবে। তার আগে জানতে হবে, আপনি সেই বিশেষ শ্রেণির মানুষ কিনা।'

'বিশেষ শ্রেণির মানুষ! সেটা কিরকম!'

'মানুষ একই হাড়-মাংস, রক্তে তৈরি হলেও আমাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। চাইলেও আমরা সবাই সব কিছু করতে পারিনা। সব কিছু হতে পারিনা। শিক্ষা, আত্মবিশ্বাস, তাড়না এসবই মানুষে মানুষে পার্থক্য গড়ে দেয়। কিন্তু এর বাইরেও আরেকটা জিনিস থাকে মানুষের মধ্যে। সেটা

সে টের পায় না। এই জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'কী সেটা?'

'ম্যাজিক, জাদু।'

'মানুষের মধ্যে জাদু থাকে?'

'হ্যাঁ, জাদু থাকে। প্রকৃতি আমাদের মধ্যে জাদু দিয়ে পাঠিয়েছে। এই জাদু হাত-সাফাইয়ের গুন নয়, কাউকে শুধু ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর ক্ষমতা নয়। এটা আরো বড় কিছু।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারার কথাও না। আমি নিজেও কী সব বুঝি।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'তেমন কিছুই না। যা করার আমরাই করবো।'

'যদি দেখা যায় আপনারা যেমন ভাবছেন আমি তেমন কেউ নই।'

ছেলেটা কিছু বলল না। জাহাঙ্গীরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। অল্প বয়সী এই ছেলেটার মধ্যে এক ধরনের কর্তৃত্ব আছে। জাহাঙ্গীর চলে গেল।

'আপনাকে অনেক দিন ধরেই আমাদের হিসেবে রেখেছি,' ছেলেটা বলল, 'আপনার সাথে সবসময় লোক ছিল। সেই কেন্দুং থেকে চলে আসার পর থেকেই। যেমন ধরুন আজ আপনি ঠিক এই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন, কেন বলুন তো?'

'কেন?'

'কারন আমরা চেয়েছি।'

'আমি তো সাধারনত এতোদূর আসি না। বৃষ্টি শুরু না হলে হয়তো অনেক আগে চলেও যেতাম।'

'তা হয়তো যেতেন। কিন্তু আজ আপনাকে আসতেই হতো।'

'বাধ্য করতেন?'

'হ্যাঁ। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আজ আপনাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসবো। ঘটনাক্রমে ঠিক সময়ে বৃষ্টি নেমেছিল। নইলে হয়তো আপনাকে জোর করে আনা হতো।'

'আপনি বারবার 'আমরা' বলছেন। এই 'আমরা' কারা?'

'আমরা কারা সেটা আপনি জানতে পারবেন না। আমরা পুরো পৃথিবী জুড়ে আছি। সবার সাথে মিলেমিশে আছি। আমাদের কেউ কেউ খুবই

পরিচিত, হয়তো দেশ বিদেশের সবাই তাকে চেনে। আবার কেউ হয়তো পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিই একসাথে নিই। সেজন্য আমাদের একসাথে বসারও কোন প্রয়োজন পড়ে না।'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপাতত খুব বেশি কিছু বোঝার দরকার নেই। কাপড়-চোপড় পাল্টে ঘুমাতে যান। সকালে দেখা হবে।'

ছেলেটার কথা শেষ হতেই একজন ভৃত্য বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মুরশেদ মিয়াকে নিতে এসেছে। বাধ্য ছেলের মতো ভৃত্যের পেছন পেছন হাঁটতে থাকল মুরশেদ মিয়া। দোতলার এই রুমটা থেকে বের হয়ে লম্বা করিডোরের পাশে সারি সারি ঘর। একদম শেষ মাথার ঘরের সামনে থামল ভৃত্য।

তবে তালা খুলে ভেতরে ঢোকার আগে পাশের ঘর থেকে একজন বেরিয়ে এলো। অল্পবয়স্ক একটা ছেলে। মাথার চুল ছোট করা ছাঁটা, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। এগিয়ে এসে মুরশেদ মিয়ার হাত ধরল।

'আপনি আজই এলেন?' জিজ্ঞেস করল ছেলেটা। হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেও বোঝা গেল হিন্দি তার মাতৃভাষা নয়। বেশ জড়তা আছে কথায়।

'হ্যা,' মুরশেদ মিয়া বলল।

'আপনি বাঙালি?'

'হ্যা। নেত্রকোণা।'

'বাহ। আমি তো ঢাকার বাসিন্দা।'

'আমার নাম মুরশেদ...'

'আমি সামসুদ্দিন। আমার..'

ছেলেটা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। এরমধ্যে ভৃত্য ঘরের তালা খুলে মুরশেদ মিয়ার দিকে তাকাল। বোঝাতে চাইল সৌজন্যমূলক আলাপ সমাপ্ত করতে। ছেলেটাও বুঝল।

'আমি আসি তাহলে। পরে কথা হবে।'

মুরশেদ মিয়া মাথা ঝাঁকাল। যাক, অন্তত এই দূর দেশে নিজ ভাষায় কথা বলতে পারাও বেশ ভাগ্যের ব্যাপার।

ভৃত্যের পেছন পেছন মুরশেদ মিয়াও ঘরে ঢুকল।

এতো চমৎকার রুম কল্পনা করেনি মুরশেদ মিয়া কখনো। একপাশে

নরম গদিওয়ালা বিছানা, মাথার ওপর হাতে টানা পাখা, মেঝেতে মখমলের মতো নরম কার্পেট। দেয়াল জুড়ে চমৎকার সব চিত্রকর্ম। একপাশে টেবিলে একসেট কাপড় রাখা। ভৃত্য সেই কাপড় দেখিয়ে দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

মুরশেদ মিয়া কাপড় পাল্টাল। নরম সিল্কের জামা আর পাজামা। এতো আরামদায়ক কাপড় পরে বেশ অস্বস্তি লাগছিল।

কিসের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, এই লোকগুলো কারা সে সম্পর্কে কোন ধারনা নেই। তবু মুরশেদ মিয়ার ভয় লাগছে না। বরং সে দারুন উত্তেজিত বোধ করছে। তার ভেতর সত্যি কী ম্যাজিক আছে? থাকলে সে কেন টের পায়নি? ঐ কেন্দুং-এর ঘটনা এতোদূর দিল্লি পর্যন্ত কিভাবে এলো?

বিছানায় শুয়ে বড় জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল মুরশেদ মিয়া।

অধ্যায় ১৫

ছোট একটা ঘর। এই দিনের বেলায়ও সেখানে ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকার দূর করার জন্য কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলোয় অন্ধকার দূর হচ্ছে না। বরং একটা অদ্ভুত আবহ তৈরি করেছে।

বৃদ্ধ মানুষটা পদ্মাসনে বসেছেন। তার উল্টোদিকে কুদ্দুস আর সালাম বসেছে। কুদ্দুসের চেহারায় দারুন ভয় আর শ্রদ্ধার ছাপ। সালাম শুধু অনুসরন করছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না।

বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে সুরে সুরে কিছু একটা বিড়বিড় করছেন। এই শব্দটা ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। একটানা শব্দগুলো শুনতে শুনতে ঘোর লেগে গিয়েছে সালামের। তার চোখ অজান্তেই বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবে যে কোন সময়। চোখ খুলে রাখা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। কুদ্দুসেরও চোখ বোজা। ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

সালাম বৃদ্ধের মুখের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। এ ধরনের ভাষা কোনদিন শোনেনি সে। একটা শব্দও বোঝা যাচ্ছে না। আরো কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর মনে হলো সে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে, অনেক দূরে।

চারপাশে ঘন বন। ঠিক মাঝখানে অল্প কিছু জায়গা ফাঁকা। সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে সালাম। হঠাৎ নিজেকে এভাবে আবিষ্কার করে চমকে উঠেছে। এখানে কিভাবে এলো! তার পরনের পোশাক শতচ্ছিন্ন, হাত পায়ের বিভিন্ন জায়গায় শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ছোপ। পায়ে একজোড়া জুতো। এই ধরনের জুতো তার কখনো ছিল না। হাতে খোলা তলোয়ার। সেই তলোয়ারও রক্তে রঞ্জিত! কাকে খুন করেছে সে?

সালাম কিছুই বুঝতে পারছিল না। তবে এটা নিশ্চিত, এই মুহূর্তে সে খুব বিপদের মধ্যে আছে। হাতে তলোয়ারটা নিয়ে দুদিকে ঘোরাল, বুঝতে

পারল তলোয়ার চালানোতে তার দক্ষতা আছে এবং এই জিনিস দিয়ে সে কাউকে না কাউকে ঘায়েল করেছে। এখন হয়তো পালাচ্ছে। শত্রুরা হয়তো আশপাশেই আছে।

প্রায় অন্ধকার এই জায়গাটার চারপাশে তাকাল সালাম। এই রকম ঘন বন এর আগে কখনো দেখেনি। চারপাশ থেকে কোন শব্দ আসছিল না। বাতাসে মাঝে মাঝে গাছগুলো দুলছিল। কিন্তু এর বাইরে আর কোন শব্দ নেই।

তবু কান পেতে রইল সালাম। শত্রু যে বা যারাই হোক, তারা আশপাশেই আছে। সামনে কোথায় যেতে হবে ধারনা নেই, তবু পা বাড়াল সালাম। তখন পেছনে একটা খসখস শব্দ টের পেল।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। কেউ নেই। শব্দের উৎসের দিকে তাকাতেই দেখল কালো, লম্বা একটা সাপ। সরসর করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তলোয়ারটা উঠানোই ছিল, সাপটা আরেকটু এগিয়ে এসে মাটি থেকে লাফ দিল, ঠিক সালামের গলা বরাবর। আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল বলে তলোয়ারের এক আঘাতে সাপটাকে দু'টুকরো করে ফেলতে কোন বেগ পেতে হলো না। টুকরো দুটো মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর বিপদ আরো বাড়ল। এবার পেছনের দিকে খুট করে শব্দ হওয়ার সাথে সাথেই পেছনে ঘুরল সালাম। বেশ বড়সড় একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরের মুখ থেকে অনবরত লালা ঝরছে। দাঁত বের করে আক্রমন করতে উদ্যত হলো প্রানীটা।

তবে আক্রমন করার আগেই কিসের ইশারায় সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল কুকুরটা। কোত্থেকে ইশারা এসেছে দেখার জন্য ডানে-বামে তাকাল সালাম। চোখের কোন দিয়ে ডানদিকে আবছা একটা ছায়া দেখল।

তলোয়ারটা দুহাতে শক্ত করে ধরে ডান দিকে ঘুরল সালাম। কুকুর যে কোন সময় আক্রমন করতে পারে, সেজন্য সে প্রস্তুত। আবার একই সাথে ডানে কী আছে সেটাও দেখা দরকার।

আবছা ছায়াটা ধীরে ধীরে পরিস্কার হয়ে এলো। সেই বৃদ্ধ! একটু আগেই না এর সামনে বসেছিল!

বৃদ্ধ এগিয়ে আসছেন। তার পরনে কালো আলখেল্লা নেই। সাদা একটা চাদরে পুরো শরীর ঢাকা। পুরো শরীর থেকে অপার্থিব একটা আভা

আসছে। তলোয়ারটা হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল সালাম। যতোই বৃদ্ধ হোক, একটু এদিক-সেদিক হলে আক্রমন করতে দ্বিধা করবে না।

'তুমি আরো বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও,' বৃদ্ধ বললেন বিড় বিড় করে। খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। সালাম তলোয়ারটা নামিয়ে রাখল।

'কিসের যুদ্ধ?'

'আলো আর অন্ধকারের।'

'আমরা কোন পক্ষের?'

এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না বৃদ্ধ। তিনি সালামের কাঁধে হাত রাখলেন।

'সবকিছুর ভারসাম্য দরকার। প্রকৃতিরও সেই ভারসাম্য দরকার। আলো আর অন্ধকার তাই পাশাপাশি থাকে।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'সেটা তুমি জেনে যাবে ধীরে ধীরে। প্রথম কাজ হবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।'

'কে আমাকে মারবে? কেন মারবে?'

বৃদ্ধ হাসলেন। হাত ইশারায় কুকুরটা কাছে ডাকলেন। কুকুরটা প্রভুভক্ত বোঝাই যাচ্ছিল। দ্রুত বৃদ্ধের কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুমি সব জানবে। সময় হয়নি এখনো।'

'আপনি কে?'

'আমি জাদুকর।'

'আপনার নাম?'

'আমার কোন নাম নেই।'

চারপাশে শো শো শব্দ শুরু হয়েছে হঠাৎ করেই। পুরো বনে কিসের একটা আলোড়ন। সালাম চারপাশে তাকাল। এরমধ্যে কী হয়ে গেল বুঝতে পারল না। সামনে বৃদ্ধ মানুষটা নেই। কুকুরটাও নেই। এতো দ্রুত কিভাবে চলে গেলেন?

চারপাশে শব্দ আরো বাড়ছে। মনে হচ্ছে একদল লোক হৈহৈ করে এগিয়ে আসছে। এই ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। সালাম দৌড়াতে শুরু করল।

ঘন গাছপালার ফাঁক গলে দৌড়ে যাওয়া কঠিন ব্যাপার। হাত-পা কেটে যাচ্ছিল। হাতের তলোয়ারটা দিয়ে যতোটা সব ডালপালা সরিয়ে এগিয়ে

যাচ্ছিল সালাম। লোকগুলো আরো কাছে চলে এসেছে। একটু আগে যে ফাঁকা জায়গায় সে দাঁড়িয়েছিল, ওখানে পৌঁছেছে নিশ্চিত।

এতোগুলো শত্রুকে একসাথে সামলানো কঠিন। সালাম দৌড় থামাল না। এটা নিশ্চিত খুব সহজে ধরা পড়বে না সে। দৌড়াতে দৌড়াতে কতোদূর চলে এলো কোন ধারনা নেই। একসময় মনে হলো পেছনে আর কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। একটু দাঁড়াল সালাম। কান পাতল।

নাহ! কোন শব্দ নেই। ওরা হয়তো পিছু নেয়নি কিংবা পথ ভুলে অন্য কোথাও চলে গেছে। বড় করে নিশ্বাস ছাড়ল সালাম। এখানে অন্ধকার কম। গাছগুলো এতোই উঁচু যে সূর্যের আলো নীচ পর্যন্ত আসে না। সন্ধ্যা হতে এখনো ঢের দেরি। পেছনে ধাওয়া করে কেউ আসছে না যখন, তখন একটু ধীরে সুস্থে হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো সালাম।

এখানে বন হাল্কা হতে শুরু করেছে। হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে না তাই। বন যতো হাল্কা হচ্ছে আশপাশের প্রকৃতিও যেন বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণ আগেও আশপাশের গাছপালাগুলো ডাল-পালা, পাতাগুলো ছিল ধুসর বর্ণের। এখানে গাছগুলোতে রঙ লাগা শুরু হয়েছে। চারদিকে ধীরে ধীরে সবুজ আর হলুদের পরিমান বাড়ছে।

আরো কিছুদূর এগুতেই সালাম দেখল সামনে আর গাছপালা নেই। সামনে অশেষ জলরাশি। যেদিকে চোখ যাচ্ছে শুধু পানি আর পানি। আর সেই পানি প্রায় স্থির। মনে হচ্ছে বড় কোন হ্রদের কাছে চলে এসেছে। এই হ্রদ পাড়ি দেয়ার কোন উপায় জানা নেই।

চারপাশ থেকে শীতল বাতাস আসছে। তবে এই বাতাস হ্রদের পানিতে কোন আলোড়ন তুলতে পারছে না। শীতে কাবু হয়ে গেছে সালাম। মনে হচ্ছে এখানে যেকোন সময় বরফ পড়তে শুরু করবে।

হাঁটতে হাঁটতে হ্রদের কিনারে এসে দাঁড়াল সালাম। পা একটু বাড়ালেই পানিতে ভেজানো যাবে। তবে আপাতত পা বা শরীর ভেজানোর ইচ্ছে নেই। হ্রদের কিনারে শুধু বালি আর বালি। পানির রেখা ধরে হাঁটতে গিয়ে নরম বালিতে বারবার পা দেবে যাচ্ছিল।

নিজের ছায়া দেখার জন্য পানির দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল সালাম। পানি এখানে একদম স্থির। তাই ছায়াটা পরিস্কার দেখা গেল। নিজের ছায়া দেখে প্রথমে একটু থমকে গেল। এই চেহারা তো তার নয়। এতো অন্য কারো

মুখ, অন্য কারো শরীর। নিজের মুখে, গায়ে হাত বুলাল। স্বাভাবিকভাবেই ছায়াটাও তাই করল।

ছায়ার এই মানুষটা কে? বয়স ত্রিশের কাছাকাছি একজন। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। কাঁধপর্যন্ত লম্বা চুল। পানির দিকে আরো একটু ঝুঁকে বসল সালাম। দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল সরিয়ে চেহারাটা আবার দেখল। চোখগুলো চেনা লাগছে। হাসল একটু। ছায়াটাও হাসল। অদ্ভুত ব্যাপার হাসিতে মিল আছে। আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সালাম বুঝল এটা তার নিজেরই ছায়া। তবে এখনকার বয়সের নয়। আরো অনেক পরের কোন এক সময়ের, যখন যে আটাশ-ত্রিশ বছরের তরতাজা যুবক।

নিজের ভবিষ্যত রূপ দেখে খুব একটা আনন্দিত হলো না সালাম। বোঝা যাচ্ছে সামনে তাকে এইরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। সেজন্য তৈরি হতে হবে এখন থেকেই।

পানিতে হাত দিয়ে দেখল বরফের মতো শীতল পানি। বাংলাদেশের কোথাও এতো বড় হ্রদ আছে বলে শুনেনি। দিগন্ত বিস্তৃত হ্রদের চারপাশ ঘিরে যে পাহাড়গুলো, তার চূড়ায় সাদা বরফ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে বলে সাদার সেই ঝলকটা নেই।

এই মুহূর্তে কি করতে হবে বুঝতে পারছে না সালাম। সে কি আসলে স্বপ্ন দেখছে না হঠাৎ করেই তার বয়স বেড়ে গেছে?

জংগলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। শত্রু যে বা যারাই হোক, তারা সবাই ঐ জংগলের ভেতর তাকে খুঁজছে। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। জংগলের মাঝখান দিয়েই যেতে হবে।

মানসিকভাবে তৈরি হয়ে নিলো সালাম। জংগলের দিকে পা বাড়াল।

কুদ্দুস এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

'কি মিয়া, কি হইছে?'

আচমকা প্রশ্নে সংবিত ভাঙল সালামের। চারপাশে তাকাল। সেই ছোট ঘরটায় বসে আছে এখনো। একটু আগে যা দেখছিল তা সবই স্বপ্ন অথবা সামনে বসে থাকা ধ্যানমগ্ন বৃদ্ধের কারসাজি।

'কিছু হয় নাই।'

'তুমি এইখানেই থাকবা। আমি যাই।'

'আমাকে একা রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'তুমি এইখানেই নিরাপদ। আমার অন্য কাজ আছে।'

'আমি এখানে থাকবো না।'

কুদ্দুস কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। দীর্ঘক্ষণ পর বৃদ্ধ চোখ খুলেছেন। সালামের দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছু বলবেন মনে হচ্ছে।

'তুমি আমার কাছে থাকো। সামনে তোমার অনেক কাজ।'

সালাম কিছু বলল না। মনে হলো বৃদ্ধের বলা এই কথাগুলো শুধু কথা নয়, আদেশ। এই কথার বাইরে যাওয়ার কোন উপায় নেই তার।

'কুদ্দুস, তুমি যাও। তোমার ওপরও বিপদ আসছে, কিন্তু তুমি সামলাইতে পারবা।'

'আপনি বললে অবশ্যই পারবো,' কুদ্দুস বলল, 'শুধু যদি বলেন বিপদ আসবে কোথা থেকে।'

'যে ঘরে থাকতা সেই ঘর ছাড়ো, নতুন জায়গায় উঠো। তারপর দেখা যাক।'

কুদ্দুস মাথা নাড়াল। তারপর উঠে পড়ল।

'সন্ধ্যা নামার আগেই এই এলাকা ছাড়ো,' বৃদ্ধ বললেন কুদ্দুসকে।

কুদ্দুস দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে সালামের দিকে তাকাল একবার। অভয়ের হাসি হাসল।

কুদ্দুস চলে যাওয়ার পর সব আবার নীরব হয়ে এলো। এই প্রথম জমির ম্যাজিশিয়ানের কাছ থেকে পালানোর জন্য আফসোস হতে লাগল সালামের। ওখানে সে ভালোই ছিল। শংকরের উদ্দেশ্যে যাই হোক, সে সম্পর্কে কোন ধারনা না করেই পালানো ঠিক হয়নি। এখন এই অদ্ভুত গা ছমছমে জায়গায় এমন এক বৃদ্ধের পাল্লায় পড়েছে সেটা আগে বুঝতে পারলে কখনোই পালাতো না।

বাইরে বেশ গরম থাকলেও ঘরটা বেশ শীতল। কোন ফাঁক ফোকর দিয়ে নরম একটা হাওয়া আসছে। এতে বসে থাকতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। সময় এখানে যেন স্থির হয়ে আছে। বৃদ্ধ আবার চোখ বুজে ধ্যানে বসেছেন, সালাম উল্টোদিকে বসে মাঝে মাঝে নখ খুটছে, মাঝে মাঝে অন্ধকারে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। চারপাশের দেয়ালগুলোতে লক্ষ্য করে দেখল সেখানে নানা রকম নক্সা কাটা। নীল আর সাদা রঙের চক দিয়ে

নক্সাগুলো করা হয়েছে। এখানে যেহেতু আর কেউ নেই, বোঝা যাচ্ছে এগুলো সবই বৃদ্ধ লোকটার কাজ।

উঠে গিয়ে নক্সাগুলো দেখতে যাবে, দেখল বৃদ্ধ চোখ বন্ধ অবস্থাতেই তাকে বসে থাকতে ইশারা করল। বাধ্য হয়ে যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল সালাম। বসে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

কতোক্ষণ ঘুমিয়েছে বুঝতে পারেনি, চোখ খুলে দেখল সে একটা বিছানায় শুয়ে আছে। বিছানাটার চাদরটা ধবধবে সাদা, বালিশগুলো নরম। অনেক বড় একটা রুমের ঠিক মাঝখানে বিছানা পাতা। চারপাশে দেয়ালে ঝুলছে অসংখ্য মোমবাতি। বিছানা থেকে নামতেই টের পেল নীচে সুন্দর কার্পেট বিছানো। তার পরনেও সাদা ফতুয়া আর পায়জামা। কখন এই কাপড় পাল্টাল কিছুই মনে নেই সালামের। অনেক দীর্ঘ একটা ঘুম হলে শরীরটা যেমন ঝরঝরে লাগে তেমন অনুভব হচ্ছিল।

ঘরটা বেশ বড়। মাঝখানের বিছানাটা ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র নেই। হেঁটে দরজার সামনে এগুলো সালাম। কাঠের দরজা। একটু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। দরজা খুলে বাইরে তাকাল। দুদিকে সরু করিডোর চলে গেছে। করিডোরটার দেয়ালে দেয়ালে মোমবাতি জ্বলছে বলে সব পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।

বাঁ দিকে যাবে না ডান দিকে যাবে চিন্তা করতে করতে ডান দিকে পা বাড়াল সালাম। করিডোরের একদম শেষ প্রান্তে বাঁক ঘুরতেই দেখল বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন।

এই প্রথমবারের মতো বৃদ্ধের মুখে হাসি দেখল সালাম।

'ঘুম ঠিক মতো হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'তোমার কী কোন ধারনা আছে তুমি কে?'

'আমি সালাম। এর বাইরে আর কোন ধারনা নেই।'

'শুধু সালাম হয়ে থাকার জন্য তো তোমার জন্ম হয়নি। তুমি এসেছো আমাদের রক্ষাকর্তা হিসেবে।'

'কিসের রক্ষাকর্তা?'

'এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন দরকার পড়ে তোমার মতো কাউকে, যে সেই ভারসাম্য রক্ষা করে।'

'কিসের ভারসাম্য? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আলো আর অন্ধকারের ভারসাম্য।'

'আপনি এই আলো আর অন্ধকার নিয়ে আগেও বলেছেন। আবার বললেন।'

'কখন বলেছি?'

সালাম কিছু বলল না। এর আগে বৃদ্ধের সাথে কথা হয়েছিল একটা ঘোর কিংবা স্বপ্নে। সেই ঘোর কিংবা স্বপ্নের কথা একে এখন না বলাই ভালো।

'আমার ক্ষুধা পেয়েছে,' সালাম বলল।

'তোমার ঘরে খাবার পৌঁছে যাবে। এখন যাও।'

সালাম ঘুরে করিডোর ধরে আবার নিজের ঘরে ফিরে এলো। দরজাটা খোলাই ছিল। দেখল বিছানার ওপর একটা বড় থালায় কিছু খাবার রাখা। কে, কখন এসে এগুলো রেখে গেল!

কলা, আপেল, কমলা, আঙুর আর কিছু পেয়ারা। খিদে পেয়েছে দেখে দ্রুত কয়েকটা সাবাড় করল। এমনিতে দুই বেলা ভাত না হলে তার খিদে মেটেনা। তবে আজ কয়েকটা আপেল কমলাতেই পেট যেন ভরে গেল। একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছে। অথচ খাবারগুলো খাওয়ার সাথে সাথে আবার ঘুম পেতে লাগল।

ঘুম তাড়ানোর জন্য কিছুক্ষণ ঘরে পায়চারি করল সালাম। ঘরটায় কোন জানালা নেই। আলো বাতাস ঢোকার কোন ব্যবস্থা না থাকলেও ঘরের ভেতর নরম একটা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এখন দিন কী রাত, সেটাও বোঝা যাচ্ছে না।

ঘর থেকে বেরুলেই সেটা বোঝা যাবে। সালাম দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা বাইরে থেকে আটকানো। বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেয়ার পরও দরজা খুলল না। এভাবে বাইরে থেকে দরজা আটকে দেয়ার মানে কী? সে কি এখানে বন্দি নাকি!

বেশ কিছুক্ষণ দরজায় ধাক্কাল সালাম। এই ধাক্কার শব্দ বৃদ্ধের কানে যাওয়ার কথা। দরজায় কান পাতল। বাইরে কোথাও গম্ভীর একটা শব্দ হচ্ছে। যেন একসাথে অনেকগুলো মানুষ এক সুরে কোন মন্ত্র পড়ছে। এই

অঁজ পাড়া গায়ে, পরিত্যক্ত মন্দিরের মতো জায়গায় এতো মানুষ আসবে কোত্থেকে।

সালাম আরো একবার জোরে ধাক্কা দিল। এবার দরজা খুলে গেল। ধীরে ধীরে দরজার বাইরে পা রাখল। সতর্ক হয়ে আছে। মনে হচ্ছে এমন কিছু দেখবে যা দেখার জন্য সে প্রস্তুত না। কিন্তু এর আগের বারের মতো খালি করিডোর চোখে পড়ল। মোমবাতিগুলো জ্বলছে। একসাথে অনেক মানুষের একই সুরে কিছু পড়ার শব্দটা থামেনি, বরং সেই শব্দের জোর আরো বেড়েছে।

সালাম এবার করিডোর ধরে বাম দিকে এগিয়ে গেল। এদিক থেকেই শব্দটা আসছে। বেশ বড়সড় একটা ঘর। ঘরের মাঝখানে গোল হয়ে বসে আছে কিছু মানুষ, পরনে কালো আলখেল্লা, মাথা পর্যন্ত ঢেকে রাখা। তারা মাথা নাড়িয়ে সুর করে কিছু একটা বলে যাচ্ছে। সম্ভবত কোন মন্ত্র, ভাবল সালাম। তবে ভাষাটা একদম অপরিচিত লাগল। একটা শব্দও পরিচিত নয়। ঠিক মাঝখানে বসে আছেন বৃদ্ধ। চোখ দুটো বোজা। হাতে একটা লম্বা তলোয়ার। মোমবাতির আলোয় তলোয়ারটার গা চকচক করে উঠল।

সালাম দরজার সামনে দাঁড়াতেই থেমে গেল সব। বৃদ্ধ চোখ খুলে তাকালেন। চারপাশে গোল হয়ে বসা মানুষগুলোও। এদের মধ্যে একজন তার মাথার ওপর থেকে কালো আলখেল্লার অংশটুকু সরিয়ে ফেলল। তার দেখাদেখি বাকিরাও তাই করল। গুনে দেখল সালাম, দশজন। আরো অবাক হলো যখন দেখল সবার একই চেহারা। সবাই ঠিক তার মতো দেখতে। মনে হচ্ছে আয়নার নিজের দশটা প্রতিবিম্ব দেখছে।

ওদের মধ্যে একজন হাসল। দেখাদেখি বাকি দশজনও হাসল। দৃশ্যটা দেখে স্থির থাকতে পারল না সালাম। জ্ঞান হারাল।

অধ্যায় ১৬

সকালে ঘুম থেকে উঠে চমকে উঠলেন মুরশেদ মিয়া। দরজা খোলা। বাতাসে পর্দা উড়ছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে চেয়ারে একজন বসা। পরনে সুট-কোট। কালো চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ান। বয়স ত্রিশের নীচে। শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা সুবিধার নয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

এরকম একটা ব্যাপারের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। তবু নিজেকে সামলে নিলেন। ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়লেন। বাথরুমে গিয়ে প্রাতকৃত্য সেরে নিলেন। মুখে পানির ঝাপটা মেরে নিজেকে স্থির করলেন।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন যেভাবে দেখে গিয়েছিলেন সেভাবেই বসে আছেন ভদ্রলোক। হাতে একটা ছোট ডায়রি। বুক পকেটে একটা কলম শোভা পাচ্ছে।

'এভাবে কারো ঘরে ঢুকে বসে থাকাটা আমার নিজেরই পছন্দ না,' লোকটা বলল, 'কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায় মাথায় এলো না।'

বিছানায় বসলেন মুরশেদ মিয়া। বিরক্তবোধ করলেও সেটা প্রকাশ করলেন না। ভদ্রলোক তার পরিচয় দেয়নি এখনো, কিন্তু তিনি জানেন এই লোক কে। এর আগেও কয়েকবার এসেছে। তিনি দেখা করেননি। এবার সম্ভবত মনজুরকে কোনভাবে বুঝিয়ে উপরে চলে এসেছে।

'আমার নাম ডঃ কামাল আরেফিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ম্যাজিক আমার শখ।'

ডঃ আরেফিনের মুখের দিকে তাকালেন মুরশেদ মিয়া। লোকটার চেহারায় কোন জটিলতা নেই, তবে মানুষই পারে নিজের স্বরুপ লুকিয়ে রাখতে।

'আমার কাছে কি দরকার একটু বলবেন?' মুরশেদ মিয়া বললেন, মুখে হাসি নিয়ে।

'আমার কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা দরকার। কেন জানি মনে হয় আপনি সেই ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। এভাবে চলে আসাতে দুঃখিত। আসলে অনেকদিন ধরেই আসছি, তবে আপনার দেখা পাচ্ছিলাম না। তাই আজ আর ঝুঁকি নিলাম না।'

'আমি ব্যাখ্যা দিতে পারবো বলে মনে হলো কেন?' মুরশেদ মিয়া বললেন, 'চা খাবেন?'

'হ্যা। চা দিতে বলেন।'

মুরশেদ মিয়া জানালা দিয়ে নীচে তাকালেন। মনজুর উঠোনে বসে আছে। ওকে দুটো আঙুল দেখাতেই বুঝে গেল দু'কাপ চা দিতে হবে।

'আপনি নিজেকে লুকিয়ে রাখলেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি।'

'এমন কী কাজ করলাম বলেন তো! আমি গ্রামের মানুষ, ক্ষেত-খামার করে চলি।'

ডঃ আরেফিন ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। বেশ কিছুক্ষণ লাগল তার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে।

'আপনার এই ছবিটা আমি পেয়েছি,' শার্টের পকেট থেকে সাদাকালো একটা ছবি বের করে আনলেন ডঃ আরেফিন। ছবিটা আসলে পুরনো আর একটা দামী ম্যাগাজিনের ছেড়া পাতা।

ছবিটা হাতে নিলেন মুরশেদ মিয়া। তার যুবক বয়সের ছবি। দিল্লির কোন এক রাস্তার পাশে জাদু দেখাচ্ছিলেন। কোন এক ব্রিটিশ ফটোগ্রাফার তুলেছিল। সে ফটোগ্রাফার ভারতের স্ট্রিট ম্যাজিক নিয়ে ইংল্যান্ডের কোন পত্রিকায় ফিচার করেছিল। পঞ্চাশের দশকের কথা। এই ছবি এতোদিন পর কোথা থেকে উঠে আসলো! এই ডঃ আরেফিনই বা এটা পেল কোত্থেকে।

'অনেক কাল আগে টুকটাক জাদু দেখাতাম।'

'আপনি জাদু এখনো দেখান। তবে সবার সামনে না,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'আপনার এরকম মনে হলো কেন?'

'এই ম্যাগাজিনটা পেয়েছিলাম লন্ডনে আমার ভাইয়ের বাসায়। সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম কী মনে করে। তারপর সেদিন আরেকটা ছবি পেলাম।'

'সেটা কিসের ছবি?'

'দেখাচ্ছি। কিন্তু তার আগে কিছু কথা বলে নেয়া দরকার,' ডঃ আরফিন বললেন।

'বলেন।'

'আমি জাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র এসবে বিশ্বাস করি না। আলকেমি, অমরত্ব সম্পর্কে অল্পস্বল্প পড়াশোনা করছি। যতোটুকু বুঝতে পারছি, এসব ব্যাপারে অলৌকিক কিছু মিথ চালু আছে সারা পৃথিবীতে। প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ, বিশেষ করে ভারত থেকে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত সবখানেই নানান সব মিথ প্রচলিত।'

কথা বলা থামালেন ডঃ আরেফিন। মনজুর নিজে দু'কাপ চা নিয়ে এলো। মুরশেদ মিয়ার দিকে সরাসরি তাকাল না। একজন অতিথিকে এভাবে উপরে আসতে দিয়ে সে কিছুটা লজ্জিত বোঝা যাচ্ছে।

চায়ে চুমুক দিলেন ডঃ আরেফিন।

'আধুনিক জাদু, একধরনের বিজ্ঞান, সেই সাথে শারীরিক, মানসিক দক্ষতার ফল। এখানে যা দেখানো হয়, তার পেছনে জাদুকরদের অনেক পরিশ্রম থাকে। কতোটুকু দেখাবে আর দেখাবে না এটুকু শিখতেই নিরলস চেষ্টা লাগে, সত্যি কিনা?'

'হ্যা। সত্যি,' মুরশেদ মিয়া ছোট করে উত্তর দিলেন।

'আপনার নাম পরিচয় আমি পেয়েছি আসলে ছোট একটা নোটবই থেকে। এই নোটবইটা আমার বাবার। দীর্ঘদিন একটা ঘরে পড়ে ছিল। কিছুদিন আগে এই নোটবুকটা পেলাম। দেখেন তো চিনতে পারেন কিনা?'

কোটের ভেতরের পকেট থেকে চামড়ায় বাঁধানো দামী একটা নোটবুক বের করে দিলেন মুরশেদ মিয়ার দিকে। জিনিসটা হাতে নিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ ডঃ আরেফিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এতোক্ষণ পর তিনি কিছু ব্যাপার বুঝতে পারছেন।

'তুমি সামসুদ্দিন আরেফিনের ছেলে!'

'হ্যা। তার দুই ছেলের একজন। বড় ভাই লন্ডনে থাকেন।'

'তোমার পরিচয় আগে দিলেই পারতে।'

'তা পারতাম। কিন্তু... যাক। বাবাকে চিনতে পেরেছেন দেখে ভালো লাগল। কিন্তু একটা পুরনো নোটবুক দেখেই চিনে ফেললেন দেখে অবাক হয়েছি।'

'এই নোটবুকটা আমারই কেনা। তোমার বাবাকে উপহার দিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা।'

'তোমাকে একটা কথা বলি, এই নোটবুকে তোমার বাবা কী কী লিখেছেন জানি না। তবে সেগুলো নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো।'

'কিন্তু এখানে এমন সব বিষয় লেখা! সে সম্পর্কে জানার একমাত্র উপায় আপনি। বাবা মারা গেছেন প্রায় দশ বছর হলো। উনি কখনো এসব কিছু নিয়ে মুখ খোলেননি।'

'তোমার আগ্রহ কী নিয়ে?'

'সত্যিকারের জাদু নিয়ে।'

'সত্যিকারের জাদু বলতে কিছু নেই পৃথিবীতে।'

'বাবা লিখেছেন তার দেখা আসল জাদুকর আপনি। তিনি আপনাকে নিজ চোখে শুন্যে ভাসতে দেখেছেন।'

'এরকম লিখেছে? একদম ভুল লিখেছে। ও সম্ভবত দেখতে ভুল করেছে। এছাড়া আর কি হবে।'

'আপনার সাথে বাবার পরিচয়পর্ব নিয়ে প্রায় চার-পাঁচ পাতা লেখা। সেখানেই আপনার বিস্তারিত বিবরণ ছিল। সেই পরিচয় পর্বের শেষেই লেখা আছে তিনি আপনাকে শুন্যে ভাসতে দেখেছেন।'

'মানুষ কী শুন্যে ভাসতে পারে! তুমিই বলো?'

'আপনি অদৃশ্যও হয়ে যেতে পারেন! আবার চাইলে যে কোন পশু-পাখির রুপ ধারন করতে পারেন, এটাও লেখা নোটবইয়ে।'

'সামসুদ্দিনের তো এমন কিছু লেখার কথা নয়। ওকে তো আমি সুস্থ মস্তিষ্কের ছেলে বলেই জানতাম।'

'আমার বাবা যথেষ্টই সুস্থ ছিলেন। জাদু, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব এসব নিয়ে উনার দারুন আগ্রহ ছিল। আমরা দুই ভাইই সেই আগ্রহ পেয়েছি। বড় ভাই অবশ্য এসব নিয়ে ঘাটাঘাটি করার সময় পায় না। কিন্তু আমার সময় আছে।'

'হাতে সময় থাকলেই সেটা নষ্ট করা উচিত না। আমার মতো বৃদ্ধ বয়সে সেটা টের পাবা।'

ডঃ আরেফিন হাসলেন। হাসলে তার গালে টোল পড়ে, তা দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মুরশেদ মিয়া। ঠিক সামসুদ্দিন আরেফিনের মতো দেখতে হয়েছে। ওর ওপর তার রাগ হচ্ছে না। কোন এক সময় খুব কাছের মানুষ ছিল। তারপর এক সময় যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তিনিই

যোগাযোগ বন্ধ করেছিলেন। কারণ মনে হয়েছিল, তার সাথে জড়িত লোকজনদের কোন না কোনভাবে ক্ষতি হতে পারে। সামসুদ্দিন দিনের পর দিন তাকে চিঠি পাঠিয়েছে, সেসব চিঠি তিনি পেয়েছেন। কিন্তু উত্তর দেননি। একসময় হয়তো হাল ছেড়ে দিয়েছিল। সামসুদ্দিন মারা গেছে শুনে খারাপ লাগল। বুঝতে পারলেন তার নিজেরও সেরকম বয়স হয়েছে, মরে যাওয়ার মতো। কিন্তু চাইলেই তো মৃত্যু এসে ধরা দেয় না। মৃত্যু অনেক সাধনার বিষয়।

তিনি নোটবুকটা খুললেন না। ডঃ আরেফিনের হাতে দিলেন। খুব সাবধানে নোটবুকটা খুললেন ডঃ আরেফিন। ভেতরের পাতাগুলো হলুদ হয়ে গেছে। তবে সব পাতা অক্ষত। কালো কালিতে গোটা হরফে ইংরেজিতে লেখা অনেকগুলো বাক্য ঝাপসা হয়ে গেছে। তবে বেশিরভাগই পড়া যায়।

'আমার বাবা সামসুদ্দিন আরেফিন কিছুটা যাযাবর ধরণের মানুষ ছিলেন। ঢাকায় জন্ম নিলেও উনি পুরো ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন। আপনার সাথে উনার দিল্লিতে দেখা হয়েছিল। সে ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা আছে। কিন্তু বাবা আপনার শুন্যে ভাসার কিংবা অদৃশ্য হয়ে থাকার ক্ষমতার ব্যাপারে যে বিবরন দিয়েছেন, সেটা নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছি।'

'আমি চাচ্ছি না,' মুরশেদ মিয়া বললেন, 'তুমি যা ভাবছো তা নয়। আমি কিভাবে শুন্যে ভাসবো?'

'আপনি একসময় জাদু দেখাতেন এটা তো সত্যি?'

'হ্যা। সেটা সত্যি।'

'কী ধরণের জাদু?'

'রাস্তাঘাটে যেমন দেখায়, তেমনই।'

'আপনাকে আমি মুরশেদ চাচা বলি, কিছু মনে করবেন না তো?'

'না। তুমি তো আমাকে চাচাই ডাকবে।'

ডঃ আরেফিন নোটবইয়ের পাতা উল্টাতে থাকলেন। পরপর কয়েকটা পাতায় শুধু ড্রইং। কলমের কালিতে ড্রইংগুলো করা বলে জায়গায় জায়গায় কালি লেপ্টে গিয়ে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ড্রইংগুলোর ওপর ছোট ছোট করে নাম দেয়া। সেসব নাম বেশিরভাগই অপরিচিত। এছাড়া ড্রইংগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি সাধারন ড্রইং থেকে ভিন্ন। এখানে যেসব জিনিস আকা

হয়েছে পৃথিবী থেকে তার বেশিরভাগই হারিয়ে গেছে, কিংবা কোন এক কালে এসবের অস্তিত্ব থাকলেও এখন আর নেই।

'এই ড্রইংটা সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

কলমে আকা ছবিটা একটা মানুষের। উপরে রোমান হরফে কিছু লেখা। সেই লেখা বেশ ঝাপসা। এর আগেই লেখাটার অর্থোদ্ধার করেছেন ডঃ আরেফিন। সেটার সহজ বাংলা দাঁড়ায়, 'মৃত্যুর মহান জাদুকর।'

ড্রইংটা দেখলেন মুরশেদ মিয়া। কলমের কালিতে করা একটা মানুষের স্কেচ। তবে পুরোটা মানুষ না, মুখটা মানুষের। মাথায় আফ্রিকায় চড়ে বেড়ানো গ্যাজেল হরিণের এক জোড়া শিঙ। শরীরের বাকি অংশ একটা হরিণের।

'এ তো 'মৃত্যুর মহান জাদুকর'। প্রাচীনকালে কোন সভ্যতার মানুষের সময়ে এই মৃত্যুর মহান জাদুকরের আবির্ভাব তা জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয় ভারতীর উপমহাদেশের কোথাও হবে সেটা। এইরকম একটা ছবি আফগানিস্তানের পাহাড়ি এলাকায় প্রথম পাওয়া গিয়েছিল। ধারণা করা হয় সেই ছবিটা তৈরি হয়েছিল খৃষ্টের জন্মেরও অনেক অনেক আগে। অন্তত পাঁচ হাজার বছরের কম হবে না।'

'একটা হাতে আঁকা ছবি দেখে আপনি এতো কিছু বলে দিচ্ছেন কিভাবে?'

'আমাকে দেখতে মুখ্যুসুখ্যু মনে হলেও একসময় প্রচুর পড়তাম। সেসব এখনো মাথার ভেতরে রয়ে গেছে।'

'এই ছবিটা বাবা কেন এঁকেছিলেন বলে আপনার ধারণা?'

'কোন ধারনা নেই। তুমি আমাকে এতোদিন পর এই জিনিস দেখাচ্ছো এটাই যথেষ্ট। বাকিটা খুঁজতে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'কেন ঠিক হবে না।'

'কারন 'মৃত্যুর মহান জাদুকর' এমন একটা ব্যাপার, যাকে নিয়ে কোন আলোচনা করা ঠিক নয়। তিনি আদি-অনন্তকাল ধরে পৃথিবীতে ছিলেন। হয়তো এখনো আছেন।'

'এখনো আছেন? কিন্তু এরকম কিছু তো ভারতীয় উপমহাদেশের কোন মিথে নেই।'

'ভারত কেন, পৃথিবীর সবচেয়ে আদি সভ্যতা ঘাঁটলেও হয়তো এই

বিশেষ জাদুকরের পরিচয় পাওয়া যাবে না। কেননা তিনি সবসময়ই বিশেষ গন্ডিতে আবদ্ধ ছিলেন। তারাই তার কথা জানতো যাদের তিনি উপযুক্ত মনে করতেন।'

'তারমানে আপনি এবং আমার বাবা দুজনেই তার কথা জানার জন্য উপযুক্ত ছিলেন?'

ডঃ আরেফিনের প্রশ্নে একটু থতমত খেলেন মুরশেদ মিয়া।

'আমাদের জানার দরকার ছিল। কারন আমরা তার বিরুদ্ধ শক্তি।'

'বিরুদ্ধ শক্তি কেন? তারমানে তার স্বপক্ষের শক্তিও আছে?'

'কারন তিনি ধ্বংস আর মৃত্যুর প্রতীক। মানবসমাজে তার আগমন আর মৃত্যুর আগমন একই কথা। স্বপক্ষের শক্তি আছে, আর তারা শক্তিশালী হচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে নতুন করে এই জাদুকর আবার আসতে যাচ্ছে পৃথিবীতে।'

'এটা তো শুধু আপনার ধারণা মাত্র। এরকম কোন প্রমান কি আছে আপনার কাছে?'

'অনেক প্রমান আছে। সেসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। এখন তুমি যাও। আমার কাজ আছে।'

'কিন্তু আমার অনেক কিছু জানার ছিল,' ডঃ আরেফিন বললেন নাছোড়বান্দার মতো।

'তোমাকে যতোটুকু বললাম সেটুকুই অনেক বেশি। এটুকু জানারও দরকার ছিল না।'

ডঃ আরেফিন চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন। কিন্তু মুরশেদ মিয়া আর কথা বলবেন না বলে ঠিক করেছেন। সামসুদ্দিন আরেফিনের ছেলে বলেই এতোটা বকবক করেছেন। এমন অনেক কথাই বলেছেন যা নিজস্ব গন্ডীর বাইরের কাউকে বলা যায় না।

আরো প্রায় মিনিট দশেক বসে থেকে ডঃ আরেফিন চলে গেলেন। ছেলেটার ধৈর্য্য দেখে অবাক হলেও ওকে খুব বেশি প্রাধান্য দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুরশেদ মিয়া।

দুপুরের দিকে মতিঝিলের দিকে যাবেন বলে ঠিক করলেন। ওখান থেকে একটা খবর পাওয়ার কথা।

অধ্যায় ১৭

ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে বসল সালাম। উঠেই চারপাশে তাকাল। বিছানায় শুয়ে আছে, গতকাল রাতে যেখানে শুয়েছিল। চারপাশে সব স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে নিচে নামল। পা রাখল মখমলের মতো কার্পেটে। মাথা ব্যথা করছে। গত রাতে যে দৃশ্যটা দেখেছিল সেটা মনে পড়ছে বারবার। দশটা একই রকম মুখ! সব তার চেহারা! কী অদ্ভুত ব্যাপার! কী অদ্ভুত স্বপ্ন! মানুষ এরকম ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে!

ভাবতে ভাবতে দরজার সামনে দাঁড়াল। এখন সকাল হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে বাইরের আলো ঢোকে না। তাই কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আলোর জন্য মোমবাতিই ভরসা। করিডোর জুড়ে মোমবাতিগুলো জ্বলছে আগের মতোই।

খিদে পেয়েছে বেশ। করিডোর ধরে ডানদিকে যাবে না বাম দিকে যাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে ডান দিকেই পা বাড়াল। এদিকে বেশ কিছু মানুষজনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

করিডোরের শেষ মাথায় গিয়ে আবার ডানে গেল সালাম। কিছুদূর যাওয়ার পর লোকজনের কণ্ঠস্বর আরো বেশি শোনা যেতে লাগল। লোকজনের কথাবার্তা শুনতে শুনতে একসময় বড় একটা কক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল। বড় দরজার সামনে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে সসম্মানে দরজা খুলে দিল।

ভেতরে ঢুকে ঝকঝকে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সালামের। এখানে দিনের আলো ঝলমল করছে। মাথার ওপর ছাদ নেই, বরং সেখানে সকালের খোলা আকাশের আলো আসছে। গতকাল যখন কুদ্দুসের সাথে এখানে এসেছিল, ভাঙা মন্দিরটা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি আশপাশে। এরকম একটা জায়গা কিভাবে চোখে পড়েনি কে জানে!

পুরো কক্ষ জুড়ে সারি সারি টেবিল চেয়ার পাতা। সেখানে নাস্তা চলছে। লোকজন কথা বলতে বলতে খাওয়া-দাওয়া করছে। সবার পরনে কালো পোশাক, মাথা কামানো। সবাই পুরুষ আর বয়সে তরুণ। প্রায় পাঁচশো তরুণ একসাথে খেতে বসেছে। গল্পে-হাসি-ঠাট্টায় চারপাশ ভরে উঠেছে।

সালাম এদের তুলনায় বয়সে অনেক ছোট। সে এগিয়ে যেতে লাগল, ছেলেগুলো খেতে খেতে, গল্প করতে করতে কেউ কেউ তার দিকে তাকাল। কেউ হাত নাড়াল, কেউ তেমন গুরুত্বই দিলো না। বয়স্ক একজন মানুষ এগিয়ে এলো তার দিকে। হাতের ইশারায় তাকে অনুসরন করতে বলল। লোকটাকে অনুসরন করে একদম শেষ মাথায় একটা টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সালাম।

এই টেবিলটা বাকি সব টেবিলের চেয়ে আকারে ছোট। গুনে গুনে এগারোটা চেয়ার পাতা। মাঝখানের একটা চেয়ার খুব সম্মানের সাথে বের করে আনল বয়স্ক মানুষটা। সেখানে বসল সালাম। সেখানে বসার সাথে সাথে পুরো রুমের আলোড়ন থেমে গেল। গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়া বাদ দিয়ে সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বেশ অস্বস্তি লাগছিল সালামের।

এবার দেখা গেল ঘরের ডান দিকের দরজা দিয়ে এক সারি করে কয়েকজন ঢুকছে। গতরাতে তাহলে সে স্বপ্ন দেখেনি! ঠিক তার মতো দেখতে দশটা ছেলে সারি বেঁধে আসছে টেবিলের দিকে। ওদের সবার পরনে একই পোশাক, হলুদ আলখেল্লা। এক এক করে ওরা সবাই সালামের চারপাশে বসে গেল। কেউ কোন কথা বলছে না। সবাই স্থির হয়ে বসে আছে। যেন কোন নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

ঘরের একপাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন বয়স্ক মানুষ। সেই বৃদ্ধকে এখনো দেখা যাচ্ছে না। সবাই সম্ভবত তাঁরই প্রতীক্ষা করছে। পুরো ঘরটায় শুনশান নিরবতা। সেই নিরবতা ভেঙে দূরে কোথাও ঘন্টা বেজে উঠল। শো শো শব্দ শোনা যেতে লাগল, যেন ভয়ানক কোন ঝড় বইছে।

সালাম দেখছে সব কিছু। বুঝতে পারছে না। এ কোথায় নিয়ে এসেছে কুদ্দুস? এরা কারা? তার মতো দেখতে এই দশজন ছেলে কিভাবে কোত্থেকে হাজির হলো? খুব ছোটবেলায় শুনেছিল পৃথিবীতে নাকি একই চেহারার

সাতজন মানুষ হয়। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন। দশজন হাজির। এতোগুলো লোকের মাঝখানে নিজেকে খুবই হোমরাচোমরা মনে হলেও মনে মনে দারুন শংকিত সালাম। মনে হচ্ছে বড় কোন একটা খেলার অংশ সে। অথচ খেলাটা কি সে নিজেই জানে না।

সময় ধীরে গতিতে যাচ্ছে। সূর্যের আলো নেই এখন। চারপাশে ছায়া ছায়া অন্ধকার। এই অন্ধকারের মাঝে সালাম লক্ষ্য করলো ছায়ার মতো অনেকগুলো অবয়ব প্রবেশ করেছে ঘরটায়। অন্ধকার কোনগুলোতে জড় হয়েছে। ওদের চেহারার দেখা যাচ্ছে না, এমনকি ছায়া ছায়া ঐ অস্তিত্বগুলো সত্যিই আছে কিনা সন্দেহ হচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে এখনো কিছু খায়নি। খিদে পেয়েছে। টেবিলের ওপর শুধু কিছু পানির জগ, গ্লাস রাখা। খাবার-দাবার কিছু নেই। বাকি টেবিলগুলোতে অবশ্য খাবার-দাবারের ছড়াছড়ি। যদিও ওরা এখন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বাকি সবার মতো চুপচাপ বসে আছে।

আরো প্রায় পাঁচ মিনিট এভাবেই কেটে গেল। অস্থির লাগছিল সালামের। মনে হচ্ছিল দৌড়ে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু সমস্যা হলো, কোনদিক দিয়ে বের হতে হবে জানা নেই। এই ঘরগুলো সম্ভবত মাটির নীচে বানানো। কিন্তু এই ঘরটায় সূর্যের আলো কী করে এলো? ঢাকায় আসার পর থেকেই একের পর এক ঝামেলায় জড়ানোর সাথে সাথে বিস্ময়কর অনেক কিছুই চোখে পড়েছে। কোনকিছুতেই সে আর অবাক হচ্ছে না।

বড় একটা বিস্ফোরণের মতো শব্দ হলো কোথাও। যেন বিশাল কোন বোমা ফাটিয়েছে কেউ। সবাই চমকে গেলেও কেউ জায়গা ছেড়ে উঠল না। সালাম দেখল ঘরের ঠিক মাঝখানে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। তার ওপর কোত্থেকে আলো এসে পড়েছে। পুরো রুমে আর কোথাও কোন আলো নেই।

'সুধিজন,' গমগমে গলায় বললেন বৃদ্ধ। ঘরটা এমন ভাবেই তৈরি করা যে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

'এখানে একজন নতুন এসেছে, বাকি সবাই পুরাতন,' বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, 'তাই এই কথাগুলো তোমাদের আবার বলার প্রয়োজনবোধ

করছি। যারা এই কথাগুলো শুনতে চাওনা, তারা চলে যেতে পারো।'

কোথাও কোন শব্দ হলো না। তারমানে সবাই শুনতে চায়। কী এমন কথা এটা যে বারবার শোনার পরও আবার শুনতে হবে। কিংবা এরা হয়তো ভয়ে যাচ্ছে না। কান খাড়া করল সালাম।

'আমি সবসময়ই বলি, আমাদের একজন মহৎ নেতা দরকার, একজন মহৎ জাদুকর। যে আমাদের সবসময় আগলে রাখবে, দেখাশোনা করবে। আমাদের কাজ হবে তার কাজে লাগা। তিনি স্বর্গের দূত নন, স্বর্গ থেকে বিতারিত এক অসীম আত্মা। জগত সৃষ্টির সময় থেকেই তিনি আছেন এবং থাকবেন। তবে যুগে যুগে সময়ে সময়ে তাকে প্রতিনিধিত্ব করার মতো লোক লাগবে। তিনি শেষবার সক্রিয় হয়েছিলেন পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় আগে। তিনি আবার সক্রিয় হবেন। এই বার আমাদের ভারতবর্ষে এবং খুব বেশি সম্ভাবনা বাংলাদেশেই তিনি আসবেন।'

আশপাশে মৃদু আলাপ-আলোচনা শোনা গেল।

'আপনাদের তৈরি করা হয়েছে তার সেনা হিসেবে। তিনি সম্মুখ সমরে যাবেন, আপনারা থাকবেন তার পেছনে। পারবেন না?'

চারপাশে 'হ্যা-সূচক' শব্দ শোনা গেল। কয়েকজন অতি উৎসাহে দাড়িয়েও পড়ল। তাদের সবাইকে হাত ইশারায় শান্ত হতে বললেন বৃদ্ধ।

'আমাদের একটাই লক্ষ্য। তাকে রক্ষা করা। আপনাদের সামনে এগারোজনকে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন আছে আদি ও অকৃত্রিম। বাকিদের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, আমি উত্তর দিতে পারবো না। এই একজনকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আপনার সবাই সেটা জানেন। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমরা কাজে নামবো। আপনারা প্রস্তুত তো?'

বৃদ্ধে শেষের প্রশ্নটা বেশ জোরের সাথে করলেন যে তার সাথে একমত প্রকাশ করতে সবাই টেবিল চাপড়াতে শুরু করল। বৃদ্ধ হাত উঁচু করে সবাইকে থামতে বললেন।

'জগতটা হবে এক এবং অভিন্ন। সৃষ্টির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মানবজাতি কখনো একসাথে এক আকাশের নীচে শান্তিতে থাকতে পারেনি। এবার হয়তো পারবে।'

বৃদ্ধের সাথে একমত প্রকাশ করতে উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। সবাই এতো খুশি কেন বুঝতে পারছে না সালাম। বিরক্ত লাগছে।

উচ্ছাস, আনন্দ স্তিমিত হয়ে এলো কিছুক্ষনের মধ্যে। বৃদ্ধ মানুষটা আবার কিছু একটা বলবেন, সবাই উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

'আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি পুরো পৃথিবীকে এক করার, তার শুরুটা এখান থেকেই হবে, তারপর আমরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বো। আমরা প্রথাগতভাবে লড়াই করবো না, আমাদের লড়াইটা হবে সবার অগোচরে। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে এই অঞ্চলে আমাদের প্রভাব বাড়ানো। সেটা করতে হলে আগে আমাদের শত্রুদের সরাতে হবে। আমাদের শত্রু কে আপনারা কী জানেন?'

প্রশ্নটা ঘরে উপস্থিত সবাইকে করা হলেও কেউ উত্তর দিলো না। সালাম দেখল বৃদ্ধ হাটতে শুরু করেছে এখন। এক এক করে প্রত্যেক টেবিল যাচ্ছে, সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। 'আমাদের শত্রু আমরাই! জাদু এখন হাতের খেলা মাত্র। অথচ সেই আদিযুগে জাদুই ছিল বেঁচে থাকার উপায়। গোত্রে যেসব মানুষ জাদু জানতো, তারাই পেতো সর্বোচ্চ সম্মান। মানুষ চলতো সেইসব অতিমানবদের দিক-নির্দেশনায়। তখন ধর্ম, রাজনীতি ছিল না। ছিল জাদু। অথচ আমাদেরই কিছু সঙ্গি ভাবে যে মানব সমাজে জাদু শুধুমাত্র একটা কৌশল মাত্র। ওরা এটা ভুলে গেছে যে জাদু দিয়ে পৃথিবীকে এক করা সম্ভব। যেটা শত শত বছরের রাজনীতি দিয়ে সম্ভব না। আমরা তাই আগে ওদের হিসেব করবো। আগে ওদের অস্তিত্ব বিলীন করবো। তাহলে আমাদের পথে কেউ আর বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

'আমাদের শত্রুকে আমরা কিভাবে চিনবো?' অল্প বয়সী একটা ছেলে প্রশ্ন করলো। সালাম ভাবল প্রশ্ন করাতে বিরক্ত হবেন বৃদ্ধ, কিন্তু মনে হলো প্রশ্ন শুনে খুশিই হয়েছেন তিনি।

'ওরা এখন আমাদের কাছ থেকে আলাদা। তবে ওদের চেনার আলাদা কোন উপায় নেই। এমনকি আমাদের এই ঘরে ওদের লোক থাকতে পারে, যাকে আমরা চিনি না। কিন্তু ওদের কিছু কাজকর্মে ওদের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে যায়।'

'সেটা কি রকম?'

'এই অঞ্চলে ওদের গুরু মুরশেদ মিয়া। মুরশেদ মিয়ার দলবল পুরো দেশে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এরা কারা তা খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়। কিছুদিন আগে মুরশেদ মিয়াকেও আমরা বাগে পেয়েছিলাম। কিন্তু লোকটা বেঁচে গেছে। আমাদের একজন সঙ্গি মারা গেছে। তাই বলে আমরা পিছিয়ে যাইনি। আমাদের আক্রমন অব্যহত থাকবে।'

'মুরশেদ মিয়ার ইতিহাস কী? উনি আমাদের বিপক্ষে কেন?'

'এই লোক ছোট একটা দলের সদস্য। সেই দলটা এখন আর নেই। কিংবা আছে। কিন্তু গত কয়েক দশকে তিনি আর তার দল জাদুবিদ্যাকে এগিয়ে যেতে দেননি। তারা একে নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এখন মানুষ ধরেই নিয়েছে জাদু একটা খেলা মাত্র। কিন্তু ওরা এর আসল শক্তি জানে না। এই বিদ্যা দিয়ে আমরা একসময় পুরো পৃথিবী দখল করে নেবো। তিনিই এখন আমাদের একমাত্র বাঁধা।'

'তাহলে তো মুরশেদ মিয়াকে সরিয়ে দিলেই সব ঝামেলা শেষ?'

'সব ঝামেলা শেষ এটা বলা যাবে না। কারন মুরশেদ মিয়ারা সহজে মরে না। মরলেও তার চিহ্ন রেখে যায়।'

'আপনি একজন একজন করে না পাঠিয়ে একটা দল পাঠাতে পারেন, যারা তাকে ঘায়েল করতে পারবে।'

'আমি একশোজনের একটা দল পাঠাতে পারি। কিন্তু বেশি লোকজন হলে সেটা পৃথিবীর সাধারন লোকজনের মধ্যেও কৌতুহল তৈরি করবে। আমরা চাইনা আমাদের এই সংগঠনের অস্তিত্ব এখনই জানাজানি হোক। সাধারন মানুষ বিন্দুমাত্র জানে না, পৃথিবীতে সত্যিকারের জাদু বলে কিছু আছে। তারা তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ, টোনা, বান, এসবে বিশ্বাস করে, কিন্তু ওদের ধারনাও নেই সত্যিকারের জাদুর কী অসীম ক্ষমতা। প্রকৃতি আমাদের যে শক্তি দেয় সেই শক্তিকে

কাজে লাগিয়েই এই জাদু। ওরা যদি সেটা টের পেয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীর জন্য মহাবিপদ। এক দেশ আরেকদেশের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করবে জাদু দিয়ে। বর্তমান সময়ে অস্ত্রের বদলে জাদু দিয়ে যদি পৃথিবী দখল করা যায়, তারচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার আর কী হতে পারে। সেই কার্যক্রমের শুরু করতে যাচ্ছি আমরা এখান থেকে।'

'আমাদের জমশেরের মতো কাউকে দরকার,' বৃদ্ধের সহকারিদের একজন বলল।

'যে নেই তাকে নিয়ে আশা করার মানে নেই, যা আছে তা-ই নিয়ে এগুতে হবে,' বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধ বললেন।

'সে কোথায়?'

বৃদ্ধ ঘুরে দাঁড়ালেন তার সহকারির দিকে। কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

'এই প্রসঙ্গে আর কোন কথা নয়, সবাই এখন খাওয়া-দাওয়া করো,' এটুকু বলে বৃদ্ধ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সালাম চুপচাপ বসে শুনছিল। তার বাবা জমশেরের নাম এই লোকগুলো কিভাবে জানে? বুঝতে পারছে আগামী দিনগুলোতে অনেক কিছু অপেক্ষা করে আছে তার জন্য। আপাতত খাওয়ায় মন দেয়ার চেষ্টা করলো। মন বসছে না। তার দু'পাশে বসে থাকা বাকি দশজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে হাত তুললে ওরা হাত তুলছে। সে ডানে তাকালে ওরাও ডানে তাকাচ্ছে। এরকম অনুকরণ করার মানে কী? এতোগুলো ছেলে একই রকম দেখতে কিভাবে জোগাড় করলো এরা!

এসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে ভাবতে সালাম দেখল রুমটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে এক এক করে।

কোনমতে অল্প কিছু খেল সালাম। গলা দিয়ে কিছু নামছে না। মনে হচ্ছে চারপাশে হাজার চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। এরচেয়ে অস্বস্তিকর অনুভূতি আর কিছু হতে পারে না।

খাওয়া-দাওয়া শেষে নিজের ঘরে এসে পড়ল সালাম। ভাবছিল, সারা দিন কিভাবে কাটাবে। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ পাওয়া গেল না। ভৃত্য শ্রেণীর একজন এসে দরজার সামনে দাঁড়াল, বলল তাকে সঙ্গে যেতে বলা হয়েছে। কোথায় যেতে বলা হয়েছে এটা জিজ্ঞেস করাতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। সালাম লোকটাকে অনুসরন করে হাঁটতে থাকল। সরু, চাপা করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে, বারবার ডানে-বামে যেতে যেতে সালামের মনে হচ্ছিল সে কোন গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে। এখান থেকে এই জীবনে আর বের হওয়া যাবে না।

ঠিক কতোক্ষণ হেঁটেছে মনে নেই, শুরুতে ডান-বাম কোনদিক দিয়ে হেঁটেছে সেটা মনে রাখার চেষ্টা করেছিল। পরে আর হিসেব রাখতে পারেনি। একটা দরজার সামনে ভৃত্য দাঁড়াল অবশেষে। একপাশে সরে গিয়ে দরজার হাতলে হাত রাখল।

করিডোরের মোমবাতির আলোতে সবকিছু কেমন রহস্যময় লাগছে। সালাম দরজার সামনে দাঁড়াল। এই দরজার ওপাশে কি আছে? সালাম দেখল দরজার হাতলে টান দিয়ে সেটা ধীরে ধীরে খুলল ভৃত্য।

উজ্জ্বল আলোয় চোখ ঝলসে গেল সালামের। এক পা বাইরে রাখতেই বুঝল পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সে দাঁড়িয়ে আছে একটা খোলা মাঠে। সবুজ ঘাসের মাঠ। চারপাশে উজ্জ্বল সব রঙের ছড়াছড়ি। চারপাশ থেকে কেমন মিষ্টি একটা বাতাস বইছে। মাঠের ঠিক মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার চেহারা দূর থেকে পরিস্কার বোঝা না গেলেও কেমন পরিচিত লাগছে। লোকটার পরনে ধবধবে সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট, মাথায় সাদা টুপি। সালাম ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল লোকটার দিকে।

অধ্যায় ১৮

বিকেলের দিকে মতিঝিলে অনেক ভিড়। তিনি আরামবাগে আছেন এই মুহূর্তে। মোহামেডান ক্লাবের সামনের রাস্তায়। একটা চায়ের স্টলের বেঞ্চে পা তুলে বসে আছেন। আয়েশ করে চা খাচ্ছেন। অফিস ফেরত মানুষগুলোর ব্যস্ততা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন আর নিজেকে বাহবা দিচ্ছেন যে তাকে এই নটা-পাঁচটার গন্ডিতে পড়তে হয়নি।

সময়ের সাথে সাথে মানুষ পরিপক্ক হয়ে বলে শুনেছেন। কিন্তু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন শংকর লাল। বেশ বয়স হয়েছে, চল্লিশের মতো। কিন্তু এখনো কাজ-কারবারে কোন স্থিতি আসেনি। এখনো সময়ের অপচয় করে অনায়াসে, এই জিনিসটাই তিনি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন।

চা খেতে খেতে সিগারেট ধরালেন একটা। দোকানদার মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে তাকে। এই বয়সের একটা লোকের বিছানায় থাকার কথা, কিংবা লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাটার কথা। তার বদলে দিব্যি তিনি চা-সিগারট খাচ্ছেন পায়ের ওপর পা তুলে।

'চাচা, আপনের বাড়ি কই?' অতিরিক্ত কৌতুহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করল দোকানদার।

'বাড়ি কই জাইন্যা কি করবা? বাড়ি যাইবা?'

'না, মানে এমনেই।'

'এমনে এমনে কথা কয় বুকারা। তুমি কি বুকা?'

দোকানদার মাথা নেড়ে বোঝাতে চাইল সে বোকা নয়। তিনি অন্যদিকে তাকালেন। বোকা লোকদের সাথে অযথা কালক্ষেপণ করা উচিত নয়। দোকানটা প্রায় ফাঁকা। উল্টোদিকের বেঞ্চে একজন বসে আছে। ভীষন গোমড়া মুখ করে। এই লোকটাকে দেখেও বিরক্ত লাগছে। তিনি উঠে গিয়ে লোকটার পাশে বসলেন। কাঁধে হাত রাখলেন। এতে চমকে উঠে একটু সরে বসল লোকটা।

'চাকরিতে সবসময় হয় না, আপনে ব্যবসা করেন,' মুরশেদ মিয়া বললেন।

'চাকরিতেই টিকতে পারিনা, আর ব্যবসা!' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লোকটা বলল।

'ব্যবসাতেই পারবেন। আপনে সূতা, কাপড় এইগুলার ব্যবসা করেন।'

'সূতা, কাপড়ের ব্যবসা? আমার তো পুঁজি নাই।'

'ব্যবসা করতে পুঁজি লাগে কম, সাহস লাগে বেশি।'

'আপনের কেন মনে হইল আমার চাকরিতে সমস্যা, আপনে কেমনে জানেন?'

'মতিঝিল এলাকায় ঘোরাঘুরি করলে মানুষ চিনা যায়। কার কী সমস্যা না জানলেও কওয়া যায়।'

'হইতে পারে। আপনে সত্যিই বলছেন আমি কাপড়ের ব্যবসায় নামবো? কিন্তু বংশের একটা মানইজ্জত আছে না?'

'যখন টেকা কামাইবেন, মানইজ্জত এমনেই বাড়বো।'

লোকটার মাথার মধ্যে চিন্তাটা ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি চলে আসলেন আবার আগের বেঞ্চে। এই লোক একসময় কয়েকটা ফ্যাক্টরির মালিক হবে, শত শত কর্মচারি কাজ করবে তার ফ্যাক্টরিতে। এটা তিনি চোখ বুজেই দেখতে পেলেন। লোকটাকে শুধু একটা দিক-নির্দেশনা দেয়া দরকার ছিল। সেই কাজটা করা হয়েছে।

আরেকটা সিগারেট ধরাতেই শংকরকে দেখলেন, বেশ আস্তে ধীরে এগিয়ে আসছে। সাথে লম্বা, কুঁজোমতো একটা লোক। এই লোক কে? শংকরকে বলা আছে তার সাথে দেখা করার সময় অন্য কাউকে যেন না রাখে। কিন্তু ঐ যে, শংকর এখনো অনেক কাজেই বোকামি করে। এবারও করলো। অন্য সময় হলে হাল্কা ধমক দিলে হতো। কিন্তু এবার আর ধমক দেবেন না। ছোটখাট একটা শাস্তি দিতে হবে।

শংকর কাছাকাছি এসেই দৌড় দিল। দৌড়ে একবারে মুরশেদ মিয়ার পায়ের কাছে এসে বসল। মুরশেদ মিয়া পরম স্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে। অনেকদিন পর শংকরের সাথে দেখা। এর আগে শংকরের দায়িত্ব ছিল দেশের দক্ষিণাঞ্চলে। কিছুদিন আগেই ঢাকায় এসেছে। ঢাকায় এসেই দারুন একটা খবর দিয়েছিল। সেই

খবরের সত্যতা যাচাই করতেই এতোদূর এসেছেন মুরশেদ মিয়া।

শংকরের দেখাদেখি লম্বা, কুঁজোমতো লোকটাও হাঁটু গেড়ে বসেছে। একে খুব ভালো করে চেনেন মুরশেদ মিয়া। জমির ম্যাজিশিয়ান নাম। ছেলে খারাপ না। একসময় বেশ নাম-ডাক করেছিল। কিন্তু ওর প্রতিভা নির্দিষ্ট গন্ডিতে সীমাবদ্ধ। এরচেয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না।

'তুই কি মানুষ হইবি না?' শংকরকে বললেন মুরশেদ মিয়া।

উত্তরে শংকর দাত বের করে হাসল। মানুষ হওয়ার প্রতি তার খুব একটা আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না।

'এই লম্বুরে নিয়া আইছিস কেন?'

'ও সারাদিন আমার লগে থাকে। একলা থাকতে ডরায়।'

'কেন? কি হইছে?'

'কি জানি? ওর কথা বাদ দেন। আপনার শরীর কেমন?'

'তুই আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছিস। ঘটনা খুলে বল।'

'তেমন কিছু না।'

'ঐ পোলা কই?'

'নাই।'

'নাই মানে?'

'ও পলাইছে। কিছু টের পাইছে মনে হয়। আর সবচেয়ে বড় সমস্যার কথা হইল...'

মুরশেদ মিয়া শংকরকে থামালেন হাতের ইশারায়।

'জমির, তুমি দূরে যাও। ওর লগে কথা আছে।'

জমির ম্যাজিশিয়ান বিষন্ন বদনে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

'হ্যা, বলো।'

'কুদ্দুসের হাতে পড়ছে!'

'এইখানে কুদ্দুস আসলো কোথা থেকে? ওরে তো আমি ঢাকা শহরে থাকতে নিষেধ করছিলাম।'

'সে আপনের নিষেধ শোনে নাই। পোলাটা ওর লগেই আছে। তয় ঠিকানা পাল্টাইছে। যে বাড়িতে এটাক করছিলাম, ঐ বাড়ি এখন ফাঁকা।'

'তুই মাইর খাইয়া পলাইয়া আসছিস?'

'না, মানে... কিছু কিছু জায়গায় সে আমার চেনে বেশি জানে।

আপনেরই তো শিষ্য ছিল।'

'ছিল, কিন্তু তোরে আমি বেশি সময় দিছি।'

'আমি ওরে ছাড়মু না।'

'কি করবি?'

'ওরে ধইরা আপনের পায়ের কাছে ফালামু।'

মুরশেদ মিয়া হাসলেন। 'আমার ওরে লাগবো না। তুই পোলারে জোগাড় কর।'

'আপনে ঢাকায় আছেন কয়দিন?'

'যতোদিন তোর কাজ না হয়।'

'আমারে সাত দিন দেন।'

'সাত দিন অনেক সময়,' কিছু একটা ভাবলেন মুরশেদ মিয়া, 'ঠিক আছে, সাতদিনই। এর বেশি না।'

'তাইলে এখন যা।'

মুরশেদ মিয়া বসে রইলেন একা। জমির ম্যাজিশিয়ানকে সাথে নিয়ে শংকর চলে গেল।

যাওয়ার আগে আবার পা ধরে সালাম করল। তার দেখাদেখি জমিরও করল। এসব পছন্দ করেন না মুরশেদ মিয়া, কিন্তু এরা মানে না।

'আপনে কোন পীর-ফকির নাকি?' চায়ের দোকানদার প্রশ্ন করলো এবার। এতোক্ষণ সে চুপচাপ দেখছিল। তবে কথাবার্তা নিচু স্বরে হচ্ছিল বলে কিছু শুনতে পায়নি।

'সবাই পীর-ফকির হইতে পারে না, আমি এই দুটার কোনটাই না। আমি হইলাম প্রকৃতির লোক, বুঝলা?'

'বুঝি নাই। চা খাইবেন আরেক কাপ?'

'না।'

মুরশেদ মিয়া আরো কিছুক্ষণ বেঞ্চে বসে রইলেন। রাস্তাঘাট এখন ফাঁকা হয়ে এসেছে। লোকজন কিছু ভিড় করে আছে পাশের আরেকটা দোকানে। সেখানে বাজি ধরে ক্যারাম খেলা হচ্ছে। বেশ হৈচৈ হচ্ছে।

হৈচৈ করতে হয় এমন কিছু মুরশেদ মিয়ার পছন্দ নয়। তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। মাথার ভেতর পুরনো স্মৃতিরা আবার ভিড় করতে শুরু করল।

প্রথমদিন ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল তরুণ মুরশেদের। একে তো নতুন জায়গা, তার ওপর এতো নরম গদীর ওপর কখনো ঘুমানো হয়নি বলে দারুন অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কোন চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে জানালা খুলে দিতেই সুন্দর আলোয় ভরে গেল পুরো ঘরটা। দ্রুত বাথরুমের ঝামেলা সেরে আয়নার সামনে দাঁড়াল। লম্বা, একহারা গড়ন, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, এলোমেলোভাবে গজিয়ে উঠা চুল-দাঁড়িতে তাকে খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না। একপাশে একটা চেয়ারে কাগজের প্যাকেট চোখে পড়ল। প্যাকেট খুলে দেখা গেল, সেখানে নতুন কাপড়-চোপড়। এগুলোর মধ্যে থেকে সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি বেছে নিলো।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করল মুরশেদ মিয়া। এতো বড় প্রাসাদের মতো বাড়িতে কতোজন মানুষ থাকে? কাল যে অল্প বয়স্ক ছেলেটার সাথে কথা হলো সে-ই কি এই বাড়ির মালিক? কিসের প্রশিক্ষনের কথা বলেছিল যেটা আজ থেকে শুরু হবে?

এসব ভাবতে ভাবতেই দরজায় টোকা পড়ল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল মুরশেদ মিয়া। গতকাল রাতের ভৃত্যটাই দাঁড়িয়ে আছে।

'নীচে আসতে হবে। সেখানেই নাস্তার ব্যবস্থা।'

মুরশেদ মিয়া তৈরিই ছিল। বের হয়ে এলো রুম থেকে। বাইরে বেরিয়ে দেখল লম্বা করিডোরের ডান পাশে সারি সারি করে অনেকগুলো রুম। প্রতিটা রুম থেকে একজন করে বেরিয়ে এসেছে। তাদের সবাই চোখে-মুখে দারুন বিস্ময়। ওরাও হয়তো আমার মতো, কী হচ্ছে এখানে, কেন হচ্ছে কিছুই জানে না, ভাবল মুরশেদ মিয়া। একজনের দিকে তাকিয়ে হাসল। সে ছেলেটাও হাসল। মুরশেদ মিয়ার ইচ্ছে হলো ঐদিকে এগিয়ে গিয়ে ওর সাথে গল্পস্বল্প করে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। নীচের উঠোন থেকে কেউ একজন বাঁশিতে ফুঁ দিল। ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে আশপাশের সবাই দ্রুতগতিতে সিড়ির দিকে এগুতে থাকল। মুরশেদ মিয়ার এতো তাড়াহুড়া নেই। সে ধীর গতিতে মানুষগুলো সাথে মিশে নীচে নামতে থাকল। তার পেছন পেছন যে ছেলেটা হেসেছিল সে-ও আসছে। মাঝারি আকারের ছেলেটা ধবধবে ফর্সা। কপালের ডান দিকে বড় কালো তিল আছে।

'আপনি কি বাঙালি?'

'হু,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন। কোন বাঙ্গালির সাথে পরিচিত হলেই তারা

হাঁড়ির খবর নেয়ার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হচ্ছে না।

'কবে এলেন?'

'গতকাল সন্ধ্যায়।'

'ভালো। এখনো সেভাবে প্রশিক্ষণ হচ্ছে না। কেন জানি মনে হচ্ছিল ওরা আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিল।'

'আমার জন্য! কই আমি তো জানি না। আর ওরা কারা?'

'এলায়েন্স অফ ম্যাজিক পিপল। এই বাড়িটাই তো সব। এখানেই ক্লাস হয়, এখানেই সব কিছু।'

'কিন্তু আমি তো এখানকার কিছু জানি না। আমাকে তেমন কিছুই বলা হয়নি।'

'আচ্ছা, আপনাকে তো আমার পরিচয় বলা হয়নি। আমার নাম সামসুদ্দিন আরেফিন। পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা। ঢাকার।'

'আমিও পূর্ববঙ্গের। আমার নাম মুরশেদ মিয়া।'

'চলেন, একসাথে নীচে যাই। আপনি আমার সাথেই থাকেন।'

সবার সাথে একসাথে সিড়ি বেয়ে নীচের দিকে নামতে নামতে কতোজন আছে গোনার চেষ্টা করল মুরশেদ মিয়া। তাকে নিয়ে মোট সাত জন।

সবাই একসাথে নেমে এলো নীচে। এগিয়ে গেল সামনে খোলা লনের দিকে। সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। সামসুদ্দিন আরেফিন আর মুরশেদ মিয়া পাশাপাশি দাঁড়াল।

জাহাঙ্গীর জাদুকর আর গত রাতের অল্প বয়েসী ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

মুরশেদ মিয়ার বিরক্ত লাগছে। সারাজীবনে সে কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধার ধারেনি। যেটুকু পড়েছে নিজের ইচ্ছেয় পড়েছে। পড়তে হবে, পরীক্ষা দিয়ে পাস করে সার্টিফিকেট নিতে হবে, চাকরি করতে হবে, এরকম সাধারন বিরক্তিকর ব্যাপারস্যাপার তার অপছন্দের বলেই প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা থেকে সে শত হস্ত দূরে থেকেছে। কিন্তু এখন না জেনেই আবার ক্লাস করতে হবে। যতোই বলুক, এলায়েন্স অফ ম্যাজিক পিপল, নিশ্চয়ই এখানে রীতিমতো পড়াশোনাটা হবে।যাই হোক, দীর্ঘক্ষণ পর নীরবতা

ভাঙল অল্প বয়সী ছেলেটা।

'আজ আমাদের সাত জনের হিসেব পূরণ হয়েছে,' বলল সে, 'এর আগে আপনার যে শিখেছিলেন বা জেনেছিলেন, সব ভুলে যান। আমরা আবার নতুন করে শুরু করবো।'

বেশ কয়েকজন ফিসফিস করছিল, তাদের কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠছিল, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না ছেলেটা। 'আমাকে আপনারা সবাই চেনেন, আমি ফরিদ সালাহ উদ্দিন। সংক্ষেপে ফরিদ ডাকলেও সমস্যার কিছু নেই। আগামী কয়েকদিন আমিই হবো আপনাদের শিক্ষক, গাইড, পথপ্রদর্শক। আমি যা শেখাবো আপনারা তাই শিখবেন। আমার সহকারি থাকবেন জনাব জাহাঙ্গীর।'

কোন সাড়াশব্দ হলো না। মুরশেদ এক দৃষ্টিতে ফরিদের দিকে তাকিয়ে আছে। এতো অল্প বয়সী একজন ছেলে তাদের শিক্ষক। এই বয়সেই সে এতো জ্ঞান পেল কী করে? কৌতুহল বেড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে খুব বিরক্ত লাগা শুরু হয়েছিল, এখন সেখানে বিরক্তি নেই। বরং প্রচন্ড কৌতুহল কাজ করছে।

ফরিদ দুই আঙুলে কিছু একটা ইশারা করলো। মুরশেদ মিয়া দেখল একটু আগেও ফরিদ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশের জায়গাটা ছিল ফাঁকা। এখন সেখানে বেশ বড়সড় একটা ব্ল্যাকবোর্ড দেখা যাচ্ছে। স্কুল-কলেজে এই ধরনের বোর্ড থাকে ক্লাসরুমে, বিশ্ববিদ্যালয়েও থাকে সম্ভবত, ধারনা করল মুরশেদ মিয়া।

এরপরের কয়েকঘন্টা মুরশেদ মিয়ার জীবনের সেরা সময় হয়ে থাকল। সাত জন ছাত্রের প্রায় সবাই বিশেষ গুণের অধিকারি। এরা আগে থেকেই কমবেশি জানে কী শিখতে যাচ্ছে, কিন্তু তার জন্য ব্যাপারটা অভূতপূর্ব।

প্রথম এক ঘন্টা শেখানো হলো প্রকৃতি নিয়ে। প্রকৃতি মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করে এবং মানুষ কিভাবে প্রকৃতি থেকে সব পেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। এই আলোচনা থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হলো মুরশেদ মিয়ার কাছে, তা হলো, প্রকৃতি সব কিছুর হিসেব পাই পাই করে মিটিয়ে দেয়। প্রকৃতির সেই শক্তি আছে। প্রকৃতির সেই শক্তি ধারন করার জন্য যে গুণাবলী দরকার সেটা অধিকাংশ মানুষেরই নেই। তারা জানেও না কিংবা জানতে চায় না, বাস্তবে খালি চোখে যে পৃথিবী দেখা যায়, আসল

পৃথিবী তার চেয়ে অনেক রহস্যময়। পুরো প্রানীজগত যে একটা শৃংখলার মধ্যে চলে এবং মানুষও সেই শৃংখলার বাইরে নয়, এ কথাটাও অনেক বুঝতে চায় না। তারা আশ্রয় খোঁজে ধর্মে। কিন্তু তরুণ মুরশেদ মিয়া ধর্ম-কর্মের চেয়ে বেশি মানে প্রকৃতিকে। তার ধারনা এই পৃথিবী, চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্ররাজি সবই এই প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের জন্ম-মৃত্যু সবই সেই প্রকৃতিতে উল্লেখ করা আছে। আমরা সাধারন মানুষ সেই প্রকৃতিকে দেখতে পাই না। সামান্য ঝড়-বৃষ্টিতেই আমরা কাতর হয়ে পড়ি সহজে। কিন্তু প্রকৃতি শুধু ঝড়-বৃষ্টির মাধ্যমেই তার ক্ষমতা দেখায় না। সে মানুষের জীবনও নিয়ন্ত্রণ করে। কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আবার পরে বলবে বলে জানিয়েছে ফরিদ সালাহ উদ্দিন।

এরপর খানিকটা বিরতির পর আবার শুরু হলো। এবার শুরুতেই এক এক করে সবাইকে সবার সাথে পরিচিত করানো হলো। এরা সবাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছে। একেকজনের ভাষা ভিন্ন, তবে সবাই কমবেশি হিন্দিটা বোঝে। এছাড়া এদের সবার আলাদা আলাদা কিছু গুণ আছে। যার জন্য নাকি এদেরকে বিশেষভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন আফগানিস্তানের যে মুসলিম ছেলেটা এসেছে ওর নাম গওহর জামাল। বয়স তেইশ চব্বিশ হবে। ফর্সা ধবধবে ইউরোপিয়ানদের মতো দেখতে। চুলগুলো সোনালি। কপালে কাঁটা দাগ। ওর বিশেষ গুণ হচ্ছে ওর মুখ থেকে আগুন বের হয়। এমন অদ্ভুত কান্ড কখনো দেখেনি মুরশেদ মিয়া। বিস্ময়ে তার মুখ হা হয়ে গেল, যখন দেখল গওহরের মুখ থেকে অনবরত আগুন বের হচ্ছে। সেই আগুনে একটা বই পুড়িয়ে ফেলল সবার সামনে। আরেকটা ছেলে আছে মাদ্রাজের। ওর নাম রাম আইয়ার। ন্যাড়া মাথার হাসিখুশি ছেলেটার গুন আরো অদ্ভুত। সেই গুণ দেখানোর জন্য ওকে খালি গায়ে হতে হলো। দেখা গেল পুরো শরীর জুড়ে সজারুর কাঁটার মতো লম্বা লম্বা কাঁটা। সেই কাঁটাগুলো যখন তখন ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে আবার বের হচ্ছে। একটা কাঁটায় হাত দিয়ে দেখল মুরশেদ মিয়া। কাঁটার অগ্রভাগ অতি ধারাল, একটু চেপে ধরলেই আঙুল কেটে যাবে। এরপর এলো কাশ্মীরের আজাদ মালিক। আজাদ মালিকের গুণটাও খুব অদ্ভুত। সে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সবার মাঝখানে। হঠাৎ দেখা গেল সে নেই। গওহরের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। এতো দ্রুত সবার চোখকে ফাঁকি দিয়েছে

যে কেউ টেরই পায়নি কিছু। গওহর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে তাকাতে দেখা গেল জাহাঙ্গীরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এতো দ্রুত কিভাবে চলতে পারে একজন মানুষ, ভাবছিল মুরশেদ মিয়া। এবার পালা শ্যামশংকর ত্রিবেদির। বিহারের বাসিন্দা এই ছেলের বয়স বাইশ-তেইশ হবে। ওর গুণটা এতোটাই অভিনব যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না মুরশেদ মিয়া। শ্যামশংকরের পিঠ থেকে চমৎকার দুটো ডানা বেরিয়ে এসেছে। ডান ঝাপটিয়ে সে ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল। মুহূর্তের মধ্যে এতো উপরে উঠে গেল যে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে পাখা নামিয়ে নেমে এলো শ্যামশংকর। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাখাটা আবার পিঠে ঢুকে গেল। এরপর এলো বিজয় পান্ডে। মোটাসোটা, ছোটখাট একজন মানুষ। যতোক্ষণ এখানে এসেছে হেসেই যাচ্ছে। হাসি ছাড়া ওর মুখে কোন কথা নেই। এবার বিজয় এসে দাঁড়াল মাঝখানে। হাসতে হাসতে মাটির দিকে তাকিয়ে একটা লাফ দিল। এই দৃশ্যটা এতোই অদ্ভুত যে হঠাৎ দেখে মনে হলো একজন মানুষ এভাবে শুকনো মাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন। উত্তরটা পাওয়া গেল কয়েক সেকেন্ডেই। দেখা গেল দশাসই আকারের একটা ডোরাকাটা বাঘ দাঁড়িয়ে আছে সবার মাঝখানে। হঠাৎ এমন হিংস্র প্রাণীর আবির্ভাবে ভয় পেলেও কেউ জায়গা ছেড়ে সরে দাঁড়াল না। বাঘটা এক এক করে সবার কাছে গেল। মুরশেদ মিয়ার সামনে এসে এমন হুংকার ছাড়ল যে মনে হলো পুরো পৃথিবী এই ডাকে কেঁপে উঠেছে। চোখের পলক ফেলার আগেই আবার নিজের স্বাভাবিক রূপে ফিরে এলো বিজয় পান্ডে। মুরশেদ মিয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিলো। মুরশেদ মিয়া ভাবছিল, এগুলো সত্যিই কোন না গুণ না প্রকৃতির খেয়াল!

সামসুদ্দিন আরেফিনের পালা এলো যখন, তখন মুরশেদ মিয়ার মনে হলো এরপর তার পালা। সে কি দেখাবে? তার তো আলাদা কোন গুণ নেই। তবে সেসব নিয়ে না ভেবে আপাতত সবার মাঝখানে দাঁড়ানো সামসুদ্দিন আরেফিনের দিকে তাকাল মুরশেদ মিয়া। সামসুদ্দিন আরেফিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মিটিমিটি হাসছে। তারপর হঠাৎ করেই এক পাক ঘুরল।

ঘুরে দাঁড়ানোর পর যে মানুষটাকে দেখা গেল সে সামসুদ্দিন আরেফিন

না। অন্য আরেকজন। বয়স্ক একজন মানুষ, মাথার চুল সব সাদা। চামড়া ঝুলে গেছে। আরেকপাক খেতেই দেখা গেল এবার দাঁড়িয়ে আছে কালো কুচকুচে অল্প বয়সী একটা ছেলে। কোকড়া চুল, সাদা উজ্জ্বল দাঁত। সেই দাঁত বের করে হাসছে। এরপর আরেকপাক দিয়ে আগের রুপে ফিরে এলো সামসুদ্দিন। বাকি সবার চেয়ে ওর পরিবর্তনটাই বেশি আলোড়ন তৈরি করল। সবাই হাততালি দিচ্ছে। এবার মুরশেদ মিয়ার পালা। ধীর পায়ে সবার মাঝখানে দাঁড়াল সে।

'আপনাদের সবার বিশেষ কিছু গুণ আছে, আমার নেই,' বলল মুরশেদ মিয়া, 'আমি কি দেখাবো?'

ফরিদ সালাহ উদ্দিন এগিয়ে এলো সামনে। 'আপনার গুণ আছে, যেটা আপনি নিজেই জানেন না।'

'কী সেটা?'

ফরিদ সালাহ উদ্দিনের হাতে একটা ছুরি দেখাল গেল। ধারাল ছুরিটায় সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে। আচমকা সেই ছুরিটা সে মুরশেদ মিয়ার পেটে বসিয়ে দিল। এমন আকস্মিক আঘাতে চমকে গেল মুরশেদ মিয়া। নিজের অজান্তেই পালটা আঘাত করে বসল ফরিদকে। তবে ফরিদ লাফ দিয়ে সরে গেল পাশে। হাতে ধারাল ছুরিটা দেখা যাচ্ছে। পেটে হাত দিল মুরশেদ মিয়া। কোন ব্যথা হচ্ছে না। কিন্তু যেভাবে ছুরিটা বসানো হয়েছিল, তাতে সেটা পেটের সামনের দিক দিয়ে ঢুকে পেছন দিয়ে বের হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। সবার সামনে জামা খুলে ফেলল মুরশেদ মিয়া। পেটের দিকে তাকাল। কোন দাগ নেই, কিছু নেই।

'আপনি একজন স্পেশাল মানুষ,' ফরিদ বলল, 'এখানে সবার একটা করে বিশেষ গুণ আছে। কিন্তু আপনার গুণ অনেকগুলো।'

'আমার এতো গুণ অথচ আমিই জানিনা?'

'জানতে পারতেন, যদি কেউ সত্যি সত্যি আপনার পেটে ছুরি বসাতো, কিন্তু তেমন পরিস্থিতিতে পড়েননি এখনো।'

'আর কী গুন আছে?'

ফরিদ চুপচাপ হাঁটতে লাগল। মনে হলো সে একটা আবহ তৈরি করতে চাইছে যেখানে সবাই উৎসুক হয়ে আছে মুরশেদ মিয়ার অন্যান্য ক্ষমতাগুলো সম্পর্কে জানার জন্য।

'আপাতত এই একটাই আপনি জানুন, বাকিগুলো সময়ের প্রয়োজনে আপনা-আপনি বের হয়ে আসবে।'

'যদি সেরকম পরিস্থিতি না আসে?'

'আসবে। আসতেই হবে।'

'আপনি কিভাবে জানেন আমার এই গুণ আছে?'

'আমি জানি।'

মুরশেদ মিয়া দেখল এরপর আর এই বিষয়ে কথা বাড়াল না ফরিদ। হয়তো বলতে চাইছে না।

'আপনারা এখানে সাত জনের একটা দল আছেন,' ফরিদ বলল, 'প্রকৃতির বিশেষ খেয়ালে আপনারা সবাই বিশেষ গুন পেয়েছেন। তবে এসব কিছুর কারনে আপনাদের এখানে এক করা হয়নি। আমরা আপনাদের এক করেছি আরো বড় একটা কারনে। সেই কারনটা এখন আপনাদের বলবো। তবে তার আগে একটা কথা,' একটু সময় নিলো ফরিদ, 'এখান থেকে আপনারা যা শিখবেন, দেখবেন, তা বাইরের পৃথিবীকে জানানো যাবে না। নিজেদের যতোটা সম্ভব আড়ালে রাখতে হবে এবং স্ত্রী-সন্তানের আশা করা যাবে না। এই তিনটা ব্যাপারে কড়া নজরে রাখতে হবে।'

সাতজনের মধ্যে একজন, ওর নাম শ্যামশংকর, হাত তুলল।

'বলেন, কী বলতে চান?'

'আমি তো একটা মেয়েকে ভালোবাসি। ওর নাম উমা। সেও আমাকে খুব ভালোবাসে।'

'শ্যামশংকর, উমার কথা ভুলে যান। সে যেন আপনার কথা ভুলে যায় আমি সে ব্যবস্থা করবো।'

'মানে? আপনি তাকে মেরে ফেলবেন?'

'মারবো কেন? আপনাকে নিয়ে ওর যতো স্মৃতি সব মুছে ফেলবো। এমনকি আপনাকে যারা চেনে, সবার কাছ থেকেই আপনার স্মৃতি মুছে ফেলা হবে। ওরা কখনো জানবেই না শ্যামশংকর নামে কেউ ছিল। এমনকি আপনার স্মৃতিও মুছে ফেলা হবে।'

শ্যামশংকর কিছু একটা ভাবল। 'আমার স্মৃতি মুছবেন না। ওদেরটা মুছে দিন। শৈশব, কৈশোর, যৌবনের স্মৃতি ছাড়া আমি কিভাবে বাঁচবো?'

'ঠিক আছে, আপনার কথা রাখবো। তবে কখনো আপনি যদি তেমন

কিছু করতে যান, তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

'এ কাজটা কে করবে?' জিজ্ঞেস করল মুরশেদ মিয়া। কারো স্মৃতিশক্তিকে মুছে দেয়ার ক্ষমতা কারো আছে এটা তার কেমন জানি বিশ্বাস হচ্ছে না।

'আমি নিজে করবো,' ফরিদ বলল, 'আমার সেই ক্ষমতা আছে। চাইলে এখনই আপনার সব স্মৃতি মুছে ফেলতে পারবো। দেখবেন?'

মুরশেদ মিয়ার দেখার কোন ইচ্ছে নেই। কোন একসময় গ্রামের মেয়ে সখিনাকে তার পছন্দ ছিল। এখন হয়তো জালালের সাথে ঘর সংসার করছে। তবু ওকে নিয়ে যতোটুকু স্মৃতি জমা আছে সেটুকু হারাতে চায় না সে।

'তো, আসল কথায় আসি,' ফরিদ বলল, 'একটা কারনেই আপনাদের সবাইকে এক করা হয়েছে। পৃথিবীর শুরু থেকেই অন্ধকার আর আলো হাত ধরে চলেছে। আলো-অন্ধকারের লড়াইয়ে মানুষ কখনো এক হতে পারেনি। কেউ আলোর পক্ষে গেছে, কেউ অন্ধকারের পক্ষে। আমরা কোন পক্ষে আছি জানি না। কিন্তু এটুকু জানি পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন কিছু আসতে চলেছে। এটা কবে আসবে জানি না। দশ বছর থেকে সামনের একশত বছরের মধ্যে হয়তো আসবে। এই মুহূর্তের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।'

'আমরা কী আর একশ বছর বাঁচবো?'

প্রশ্ন করল রাম আইয়ার। তাকে বেশ চিন্তিত দেখা গেল।

'জীবন-মৃত্যু প্রকৃতির খেলা। তবে যে কাজটা আমরা করতে যাচ্ছি, এখানকার অনেকেই হয়তো বেঁচে থাকবেন না ততোদিন, তবে কেউ কেউ বেঁচে থাকবে। কারন আমি আপনাদের বয়স বেড়ে বুড়ো হওয়ার গতিটা কমিয়ে দিয়েছি। তাই বাইরে থেকে যদি কখনো আপনাকে সত্তুর বছরের বুড়ো মনে হয়, তবু ঘাবড়াবেন না।'

'সেই নতুন কিছুটা কী?'

'একটা বড় পরিবর্তন। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিরক্ত হয়ে মানুষ একসময় প্রকৃতির কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু যে ক্ষতি তারা এরমধ্যে করে ফেলেছে, প্রকৃতি মানবজাতিতে সাহায্য করবে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু কাজটা কী?'

'এমন একজন আসতে চলেছে, যার শক্তি হবে অপরিসীম। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার শক্তি, মেধা এমন পর্যায়ে যাবে যা নিয়ন্ত্রণে না আনলে পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। প্রকৃতি ধ্বংস চায় না। আমরাও চাই না। তাই আমাদের কাজ হবে সেই অবশ্যম্ভাবী বিপদ থেকে পৃথিবীবাসিকে রক্ষা করা। বুঝতে পেরেছেন সবাই?'

'তাকে আমরা কিভাবে চিনবো?'

'তাকে আপনারা সময় হলেই চিনতে পারবেন।'

'আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তাহলে।'

'হ্যাঁ। সেই অপেক্ষা কখন শেষ হবে তা বলা যাবে না। তবে আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

'আর আপনি?'

'আমি তো আছিই।'

বেশ কিছুটা সময় এভাবেই নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলে গেল। দুপুরে বড়একটা ডাইনিং রুমে সবাইকে একসঙ্গে খাবার দেয়া হলো। মুরশেদ মিয়া শুধু একটা কথাই ভাবছিল। ফরিদ বলেছে তার আরো বেশ কয়েকটা গুণ আছে, সেগুলোর জন্যই সে বিশেষ কিছু। কিন্তু সেই গুনগুলো কি?

নিজেকে বিশেষ কিছু কখনোই মনে হয়নি। আর দশটা গ্রামের ছেলের মতোই তার শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের কিছু সময় কেটেছে। কখনো আলাদা কিছু তার সাথে হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুম, সন্ধ্যায় আবার সবাই একসাথে হলরুমে জমায়েত হলো। কেউ কার্ড খেলতে বসল, কেউ ক্যারাম বোর্ড নিয়ে। মুরশেদ মিয়া শুনেছে এই বাড়িতে বড় একটা লাইব্রেরি আছে। ভৃত্যদের একজনকে বলতেই পথ দেখিয়ে দোতলার শেষ দিকের একটা দরজা দেখিয়ে দিল। বোঝা গেল এর বেশি যাওয়ার অনুমতি নেই। দুপুরে ডাইনিং এরপর থেকেই ফরিদকে আর দেখা যায়নি। বাইরের বাগানেও নেই। সম্ভবত এই লাইব্রেরিতেই আছে।

দরজায় হাল্কা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। কার্পেট মোড়ানো বড় একটা ঘরে পা রাখল মুরশেদ মিয়া। একপাশের সব জানালা খোলা। দেয়ালে দেয়ালে নানা রকম চিত্রকর্ম ঝুলছে। ছাদের ঠিক মাঝখানে বড়

একটা ঝাড়বাতি। এর আলোয় দেখা গেল চারপাশে বড় বড় আলমারি, সেসব আলমারির সারি সারি তাক আর সেই তাকভর্তি বই। জানালার পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছেফরিদ সালাহউদ্দিন। হাতে বই নিয়ে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখছে।

মুরশেদ মিয়াকে দেখে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল।

'আমার মনে হচ্ছিল আপনি এখানে আসবেন,' ফরিদ বলল।

'আমারও মনে হচ্ছিল আপনাকে এখানে পাওয়া যাবে,' একটা চেয়ার টেনে বসল মুরশেদ মিয়া।

'এই লাইব্রেরিতে হাজার হাজার বই আছে, আমি সময় পেলে পড়ি,' ফরিদ বলল, 'কিন্তু আমার হাতে এই বইটা দেখছেন এটা আর কোথাও নেই।'

বইটা মুরশেদ মিয়ার হাতে দিলো ফরিদ। চামড়ায় বাঁধানো বইটার নাম সোনার হরফে লেখা, 'দ্য হিস্টরি অব হিউমানস ডার্ক সাইডস।' লেখকের নাম নেই। ভেতরের কয়েকটা পাতা উল্টাল মুরশেদ মিয়া। ভেতরে কাগজটা বেশ পুরু, তবে কোমল একটা ভাব আছে। বইটা হাতে লেখা, ইংরেজিতে। ভেতরে বেশ কিছু হাতে আঁকা ছবিও আছে। ছবিগুলো দেখে বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। সবগুলো ছবিই চরম মাত্রার অস্বাভাবিক। আদিম পৃথিবীর নানা জীবজন্তুর ছবি, কিন্তু সেগুলোর মাথা মানুষের। লাল, নীল, হলুদ রঙে আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে একটা জায়গায় মিল। সেটা হচ্ছে সবগুলোছবিতেই বিশেষ একজন মানুষ আছে। মানুষটার হাতে একটা লাঠি, লম্বা চুল, কঠিন তীক্ষ চোখ। পরনে কালো আলখেল্লা।

'এই বইটা সংগ্রহ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে আমাকে,' ফরিদ বলল, 'এই বইয়ের দ্বিতীয় কোন কপি নেই। হাতে লেখা বইটা এটাই একমাত্র কপি।'

'কোথায় পেলেন এই বই?'

'একজন জাদুকরের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। ভদ্রলোক মারা গেছেন কয়েকবছর আগে। মৃত্যুর আগে আমাকে দিয়ে গেছেন।'

'বইটা কী নিয়ে?'

'মানুষের অন্ধকার দিক নিয়ে। আমরা সবাই বাইরে ভালো মানুষ হলেও আমাদের সবার ভেতরেই খারাপ সত্ত্বা বিরাজমান। অনেকটা ডক্টর এন্ড

মিস্টার হাইডের মতো। আদি যুগ থেকে মানুষ এরকম। কিন্তু তারা সেটা সেভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি।'

'আচ্ছা।'

'আর আমাদের অন্ধকার দিকের একটা অংশ হলো, আমরা সবাই সবকিছুকে নিজের আয়ত্তে পেতে চাই। এই আয়ত্তে পেতে চাওয়ার কারনেই শুরু হয় বিশৃংখলা।'

'ছবিগুলো কিন্তু বেশ ভয়াবহ! কদর্য।' মুরশেদ মিয়া বলল।

'হ্যাঁ। আর এই ছবিগুলোর মধ্যে বিশেষ কিছু আপনি দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। কালো আলখেল্লাধারি একজনকে দেখতে পাচ্ছি।'

'ঠিক। এই আলখেল্লাধারি মানুষটা সবগুলো ছবিতে আছে। ছবিগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে এইসব অদ্ভুত কদর্য প্রাণীগুলোকে সে নিয়ন্ত্রণ করতো।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আপনি কিছু একটা আমাদের কাছ থেকে লুকাচ্ছেন।'

ফরিদ উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পায়চারি করল। ওর হাতে দামী চুরুট। এর আগে ওকে ধূমপান করতে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না মুরশেদ মিয়া। বেশ কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর বসল ফরিদ। মুরশেদ মিয়াকে কাছে ডাকল।

'এই শতাব্দির শেষ ভাগ থেকে পৃথিবী বদলে যাবে,' ফরিদ বলল, 'সবকিছু হবে দ্রুত। বিজ্ঞান সেই উন্নতিটা করবে। কিন্তু অন্ধকারকে মানুষ যে ভয় পায় সেখানে বিজ্ঞানের কিছু করার নেই। সেই অন্ধকারের ইশারা দেয়া আছে এই বইতে।'

'আমাদের কাজ কী হবে সেটা বুঝতে পারছি,' মুরশেদ মিয়া বলল, 'কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আমার নেই।'

'প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, প্রস্তুত হয়ে যাবেন, বইটা আমাকে দিন,' ফরিদ বলল। হাত বাড়িয়ে দিল বইটা নেয়ার জন্য। মুরশেদ মিয়া সেটা ফেরত দিয়ে দিল। ইংরেজি সে পড়তে পারে, কিন্তু খুব বেশি পড়া হয়নি বলে সবকিছু বুঝতে পারেনা।

'আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগল,' মুরশেদ মিয়া বলল।

'আমারও।'

মুরশেদ মিয়া লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে এলো। হলরুম ফাঁকা। বাইরের

ফাঁকা মাঠে বেশ হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল রাম, শ্যামশংকর আর সামসুদ্দিন যে যার ভাষায় গান গাচ্ছে। ওদের এতো আনন্দ দেখে মনে হচ্ছে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। সামনের দিনগুলোতে কী অপেক্ষা করে আছে সে ধারনা এদের কারো নেই, তাই এতো আনন্দ, ভাবল মুরশেদ মিয়া।

গতকাল রাতে যে ঘরে ঘুমিয়েছিল, সেই ঘরের দিকে হাঁটতে থাকল। দুপুরের পর আবার সবাইকে একসাথে নীচে থাকতে বলা হয়েছিল। মাঝখানের এই সময়টা খানিকটা বিশ্রাম নিলে মন্দ হয় না।

অধ্যায় ১৯

তাকে হঠাৎ এখানে দেখবে বলে ভাবেনি সালাম। লোকটা আর কেউ না। কুদ্দুস। এ রকম পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা, ভদ্র, সুন্দর, মার্জিত কুদ্দুসকে দেখেনি। তাই মেলাতে পারছিল না। বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে।

'কি হে সালাম, অবাক হইছো?' স্বভাবজাত হাসিখুশি ভঙ্গিতে বলল কুদ্দুস।

'আপনাকে তো চেনাই যায় না! আমি ভাবলাম কে না কে?

'চলো, হাঁটো আমার সাথে।'

সালাম কুদ্দুসের পেছন পেছন হাঁটতে থাকল। এখানে চারদিকে যতোদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর যাওয়ার পর দেখল সে একা হাঁটছে। কুদ্দুস নেই সামনে। অথচ একটু আগেও লোকটাকে শিস বাজিয়ে কোন একটা গানের সুর তুলতে শুনেছিল।

'আপনে কোথায়?' সালাম বলল। কেউ নেই আশপাশে, তবু কেন যেন মনে হলো এর উত্তর পাওয়া যাবে।

'তুমি কী জানো, তুমি তৈরি করতে পারো?'

'কি তৈরি করতে পারি?'

'আমরা যারে বলি বাস্তবতা, সেই জিনিস।'

কার সাথে কথা বলছে জানে না সালাম। মনে হচ্ছে নিজের সাথেই প্রশ্নোত্তর চলছে।

'বাস্তবতা কেমন জিনিস? কেমনে তৈরি হয়?'

'এই যে এখন তুমি দাঁড়িয়ে আছো খোলা মাঠে, এইটা বাস্তব না। বাস্তব হচ্ছে তুমি এখনো ঐ করিডোরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আছো।'

'কিন্তু কুদ্দুস?'

'সে-ও তোমার বানানো। এইজন্য সে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে আসছে। না হলে এই মুহূর্তে সে গুলিস্তান সিনেমা হলের সামনে আছে। সিনেমার টিকেট ব্ল্যাকে বেচতাছে।'

'তাই নাকি? তা তুমি কে?'

'আমি যে তুমিও সে।'

'তাহলে কোনটা বাস্তব?'

'সেইটা জানি না।'

সালাম চোখ বন্ধ করলো। চারপাশ থেকে অনেক কণ্ঠ ভেসে আসছে। কারা যেন সুর করে ডাকছে।

চোখ খুলল, দেখল সে এখন করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তারই মতো দেখতে বাকি দশজন। এদের সবার চোখ বন্ধ, হাত দুটো জোড় করে বুকের কাছে ধরা।

সালামের দম বন্ধ লাগছিল। মনে হচ্ছিল চক্রাকারে ঘিরে থাকা এই মানুষগুলো তাকে ঠিকমতো নিশ্বাস নিতে দিচ্ছে না। চক্রের একজনকে ঠেলে বেরিয়ে এলো সালাম। চক্র ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে ওরা চোখ খুলল। সালামের পেছন পেছন হাঁটতে থাকল।

নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল সালাম। ওরাও দাঁড়াল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দ্রুত দরজা লাগিয়ে দিল, যাতে ওরা কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে। তবে ওদের কেউ সেই চেষ্টা করল না। দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সালাম। ওর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেনি, তবে চলেও যায়নি। দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে।

বিছানায় বসল সালাম। এখানে রীতিমতো বন্দি লাগছে নিজেকে। তারমধ্যে এই অদ্ভুত দশজন! এরা সম্ভবত সবসময় তাকে অনুসরন করবে। কিন্তু কেন? সে এতো গুরুত্বপূর্ণ কেন? ঘটনা কি?

নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে সবারই কমবেশি ভালো লাগে। যারা গুরুত্বপূর্ণ তারা জানে কেন তারা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সালাম জানে না।

দরজার সামনে থেকে ওরা এখনো সরেনি। কিছু প্রশ্নের উত্তর দরকার। সেই বৃদ্ধই পারবেউত্তরগুলো দিতে। উত্তর দিক না আর দিক, সালাম সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখানে আর নয়। জাদুর প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল, কিন্তু এখানে যে জাদুর কথা বলা হচ্ছে সেটা সম্পুর্ণ ভিন্ন কিছু। এরা পৃথিবীর

মানুষ হলেও এদের জগত আলাদা। এই জগতের বাসিন্দা হওয়ার কোন ইচ্ছেই তার নেই।

সালাম এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। ওরা সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। করিডোর ধরে বাম দিকে গিয়ে গেল সালাম। ওরাও হাঁটতে থাকল তার পেছন পেছন।

বৃদ্ধ একাই বসেছিলেন, চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। সালাম দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পেছনে বাকি সবাই।

'এসো,' চোখ না খুলেই বললেন বৃদ্ধ।

সালাম ভেতরে ঢুকে বৃদ্ধের সামনে গিয়ে বসল। বাকিরা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি এতো অধৈর্য্য হচ্ছো কেন?'

'আপনি কে?'

'আমার পরিচয় দিয়ে কি হবে? আমার এখন আর কোন পরিচয় নেই।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এখানে থাকতে আমার ভালো লাগছে না। আমি যেতে চাই।'

'কোথায় যাবে?'

'ঢাকায়।'

'সেখানে তুমি নিরাপদ নও।'

'আমি তো কিছু করি নাই।'

'মাঝে মাঝে কিছু না করেও মানুষ ঝুঁকিতে থাকে।'

'আমার মতো দেখতে এরা কারা?'

'এরা কেউ দেখতে তোমার মতো নয়। এটা তোমার মনের ভুল। তবে এরা তোমার শক্তি।'

'মানে?'

'মানে বুঝতে একটু সময় লাগবে।'

'কিন্তু এখানে আমি থাকতে চাই না।'

'আপাতত বিকল্প কোন পথ নেই।'

'তারমানে আমি এখানে বন্দি।'

'মোটেও বন্দি নও। কিন্তু এখান থেকে আপাতত তুমি কোথাও যেতে পারছো না।'

'আমাকে যেতেই হবে।'

'বাইরের পৃথিবী তোমার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে। আরো কিছুদিন থাকো।'

সালাম বুঝল কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বৃদ্ধকে টলানো যাবে না। কিন্তু উনি এটা কি বললেন? তার মতো দেখতে যে ছেলেগুলো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওরা দেখতে তার মতো নয়। তার মানে সে ভুল দেখেছে? এটা কিভাবে সম্ভব!

দরজার সামনে গিয়ে ছেলেগুলোর দিকে আবার তাকাল সালাম। বিস্মিত হলো, ছেলেগুলো আসলেও দেখতে তার মতো নয়। সবার বয়স হয়তো কাছাকাছিই। কিন্তু একেকজন একেকরকম দেখতে।

নাকি এটা এই বৃদ্ধের কোন কারসাজি! আর চিন্তা করতে ভালো লাগছে না। দ্রুত হেটে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লাগাল সালাম।

এখান থেকে বের হওয়ার প্ল্যান করতে হবে। যেভাবেই হোক। এখানে থাকা যাবে না। এই লোকগুলো তাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে।

অধ্যায় ২০

টিচার্স কোয়ার্টারে একটা ফ্ল্যাটে একাই থাকেন ডঃ আরেফিন। প্রায় সপ্তাহখানেক হলো গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরেছেন। সারাদিন ক্লাস নিচ্ছেন, সন্ধ্যার পর বিভিন্ন বই-পত্র নিয়ে বসছেন। বেশিরভাগ বইই ইতিহাস, সংস্কৃতি এসব নিয়ে। জাদু-তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে হাবিজাবি অনেক লেখা আছে। সেসব পড়লে নিজেকে কেমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে হয়। এই মুহূর্তে বাবা সামসুদ্দিন আরেফিনের নোটবুক নিয়ে বসে আছেন। বাবার সাথে যে সামান্য স্মৃতিটুকু আছে তাতে কখনোই তাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ বলে মনে হয়নি। কিন্তু এই নোটবুকে যা লেখা আছে সবই জাদু নিয়ে। এগুলো ঠিক স্বাভাবিক জাদুও না। এখানে কোন তন্ত্র-মন্ত্র লেখা নেই, নেই জাদু দেখানোর কোন গুপ্ত কৌশল। এখানে কিছু চিহ্ন আছে, কিছু প্রতীক আছে। এই চিহ্ন বা প্রতীকগুলো সবই তাৎপর্যপূর্ণ। মিশর থেকে ইউরোপ, নর্থ কিংবা-সাউথ আমেরিকা থেকে আফ্রিকা, সব জায়গার প্রত্নতত্ত্বে এ ধরনের চিহ্ন বা প্রতীক পাওয়া গেছে। ল্যাটিন থেকে শুরু করে প্রাচীন হিব্রু আর ভারতীয় কিছু চিহ্নও আছে। নোটবুকে লেখাগুলো পড়ে একটা ধারণাই হয়েছে ডঃ আরেফিনের। তার বাবা সামসুদ্দিন আরেফিন স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন না। হয়তো তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল কিংবা তিনি অন্য কোন জগতে বসবাস করতেন।

নোটবুকের লেখাগুলোর বেশিরভাগই সাংকেতিক। এইসব লেখার মর্ম উদ্ধার করা খুব কঠিন হবে। হয়তো নিজের জন্যই লিখে গিয়েছিলেন এসব তথ্য। শুধু মুরশেদ মিয়াকে নিয়ে কিছু লেখা আছে। সেটুকুই পড়া যাচ্ছে শুধু। সেখানে যা জানা যাচ্ছে তাতে মুরশেদ মিয়াও স্বাভাবিক কেউ নন। বাবার ওপর সামান্য যা কিছু বিশ্বাস ছিল, এই নোটবুক পড়ার পর ডঃ আরেফিন নিশ্চিত, সামসুদ্দিন আরেফিনের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল সেই অল্প বয়সেই।

রাতে নিজের জন্য সামান্য কিছু নিজেই রান্না করে নেন, কোনদিন ক্লান্ত

লাগলে কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েন ডঃ আরেফিন। আজ রান্না করতে ইচ্ছে করছে না। নীলক্ষেতের হোটেলগুলোতে খেতে যাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেখানে ছাত্রদের অনেকেই যায়। ওদের সামনে ঐসব হোটেলে বসে খেতে অস্বস্তি লাগবে। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলেন। এখন শীতকাল নয়, তবু কেমন হিমেল একটা আমেজ রাতের বাতাসে। সন্ধ্যার পর ফুলার রোডে ফুটপাতে আড্ডা বসায় ছেলে-মেয়েরা। আজ সেখানেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

তিনি হাঁটতে লাগলেন চুপচাপ। একটা সিগারেট ধরালেন। রিক্সা চলছে বেশ, কিন্তু হাঁটতে ভালো লাগছে বলে রিক্সা ডাকলেন না। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনে এসে দেখলেন সামনে বড়সড় একটা কালো কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। এতো বিশাল আকারের দেশি কুকুর আগে কখনো চোখে পড়েনি।

কুকুরটা একদৃষ্টিতে তাকে দেখছে। তিনি পাশ কাটিয়ে হাঁটতে থাকলেন। মনে হলো কুকুরটা তার পিছু নিয়েছে। পেছন ফিরে কুকুরটার দিকে তাকালেন। তবে সেখানে কুকুর দেখলেন না। দেখলেন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

এই লোক কোত্থেকে এলো! একটু আগেও তো ছিল না! বুকটা ধ্বকধ্বক করে উঠল। দ্রুত পা চালালেন ডঃ আরেফিন। তবে খুব লাভ হলো না। লোকটা এবার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এতো দ্রুত কিভাবে এলো! একটু আগেও না পেছনে ছিল! তিনি একদৃষ্টিতে দেখলেন লোকটাকে। কালো রঙের শার্ট-প্যান্ট পরা। বেশ মোটাসোটা। বয়স ষাটের কম হবে না। উচ্চতা পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির বেশি হবার সম্ভাবনা নেই।

'আপনি কে? এভাবে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

লোকটা ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে এলো। সোডিয়াম বাতির আলোয় লোকটার চেহারা পরিস্কার দেখতে পেলেন। মুখে অসংখ্য কাটাকাটির চিহ্ন, চোখগুলো বড়বড়। মুখে হাসি নিয়ে লোকটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে। তবে করমর্দন করার দিকে খুব একটা আগ্রহ নেই ডঃ আরেফিনের।

'আরে বাবা, এতো ভয় পাচ্ছো কেন?' লোকটা বলল। বাংলায় বললেও বোঝা গেল বাংলা ওর মাতৃভাষা নয়।

'আমি ভয় পাচ্ছি না। আপনি কে? কি চান?'

'তোমাকে খুঁজে বের করতে অনেক ঝামেলা করতে হয়েছে, বুঝলে?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম।'

'ঠিকানা বলতে ছিল তোমাদের গ্রামের বাড়ির ঠিকানা। সেখানে তো কেউ থাকে না। এক লোককে হাত-পা ধরে তোমার ঠিকানা নিয়ে ঢাকায় এসেছি।'

'আপনি কে? আমার কাছে কী চান?'

'চলো, একটু বসি, এখানে বসতেও আপত্তি নেই,' রাস্তার পাশের ফুটপাত দেখিয়ে লোকটা বলল।

'আমি খেতে যাচ্ছি, আপনার যা বলার দাঁড়িয়েই বলুন।'

'আমারও খুব ক্ষুধা পেয়েছে, চলো, আমিও যাই তোমার সাথে।'

ডঃ আরেফিন তাকালেন আশপাশে। বেশ কিছু লোকজন আছে এখানে, সবাই পথচারি। কোথাও না কোথাও যাচ্ছে। এই লোকের সাথে এখানে সময় নষ্ট করার চেয়ে ব্যস্ত কোন রেস্টুরেন্টে বসা ভালো। অনেক মানুষের সামনে এই লোক নিশ্চয়ই তার কোন ক্ষতি করে বসবে না।

'ঠিক আছে, চলুন,' ডঃ আরেফিন বললেন।

লোকটা তার সাথে সাথে হাঁটতে লাগল। বোঝা যাচ্ছে হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে বয়স্ক মানুষটার। কিন্তু উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত এই লোকের সাথে খুব সাবধানে কথা বলতে হবে।

ফুলার রোড থেকে বা দিকে বেশ কিছুদূর এগুলেই নীলক্ষেত। এই সময় জায়গাটা বেশ জমজমাট। ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত লোকটাকে নিয়ে মোড়ের পাশেই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন ডঃ আরেফিন। কোণার দিকে একটা টেবিলে বসলেন দুজন। চারপাশে অনেক শব্দ, ওয়েটারদের চেঁচামেচি, এরমধ্যেই এই লোকের কী বলার আছে সেটা শোনার জন্য প্রস্তুতি নিলেন।

'এবার বলেন, কী বলতে চান,' ডঃ আরেফিন বললেন।

'আমি কিন্তু বাংলাদেশি না, এমনকি বাঙালিও না,' লোকটা বলল, সামনের গ্লাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

'সেটা আমি শুরুতেই বুঝতে পেরেছি।'

'তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে, জানো?'

'কেন ভালো লাগল?'

'মনে হচ্ছে অনেক বছর পর আবার সামসুদ্দিনকে দেখছি, অনেক মিল।'

'আপনি আমার বাবাকে চিনতেন?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো করে চিনতাম।'

'উনার সাথে পরিচয় কিভাবে আপনার?'

'আমরা একই পথের লোক। পরিচয় অনেক বছর আগে, তখন আমার বয়স অনেক কম।'

'আচ্ছা। আপনি জানেন তো, বাবা মারা গেছেন দশ বছর হলো?'

'শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করা খুব কঠিন।'

'বিশ্বাস করা কঠিন মানে? কী বলতে চান? আমি কী মিথ্যা বলছি।'

লোকটা ডঃ আরেফিনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'রাগ করছো কেন? ওর বয়স তো কমই ছিল।'

'আপনি আসলে কি বলতে চান?'

'আমার পরিচয় বলি, আমার নাম বিজয় পান্ডে। ভারতীয় নাগরিক। আজ থেকে অনেক বছর আগে তোমার বাবা, আমি এবং আরো কয়েকজন বিশেষ একটা কাজে নেমেছিলাম। সেই কাজটার জন্য অনেক বছরের অপেক্ষা ছিল। এখন কাজটা শুরু হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে যেহেতু আমি ওর ঠিকানা জানতাম তাই তোমাদের গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম সামসুদ্দিন মারা গেছে। কিন্তু আমার কেন জানি বিশ্বাস হয়নি। এই কাজ বাকি রেখে ওর মরে যাওয়ার কথা নয়।'

'তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন বাবা বেঁচে আছেন! আমি কী তাহলে কবর খুঁড়ে দেখাবো আপনাকে?' ডঃ আরেফিন রেগে গেছেন। বুঝতে পারছেন রেস্টুরেন্টের অনেকেই এই মুহূর্তে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'স্যরি, এভাবে রেগে যাওয়া ঠিক হয়নি,' ডঃ আরেফিন বললেন আবার, কিছুটা নীচু স্বরে, 'আপনি কেন এসেছেন?'

'তোমার বাবা একটা নোটবুক রাখতেন। ওটা সম্ভবত এখন তোমার কাছে। জিনিসটা আমার দরকার।'

'বাবার নোটবুক আমি আপনাকে কেন দেবো?'

'ওটায় দরকারি কিছু জিনিস লেখা আছে। আমি আগের সব ভুলে

গেছি। ঐ নোটবুকটা পেলে খুব ভালো হয়। আমি তোমাকে আবার ফেরত দিয়ে দেবো।'

'ঐ নোটবুক অন্য কারো হাতে দেবো না আমি।'

'বললাম তো, ফেরত দিয়ে দেবো।'

'আপনি এতো জোর করছেন কেন? দেবো না বলেছি, ব্যস।'

ওয়েটার এসে দাঁড়িয়েছে টেবিলের পাশে। খাবার অর্ডার দিলেন ডঃ আরেফিন। রুই মাছ, ভাত আর ডাল। এই বিজয় পান্ডে মাছ-মাংস খান না। ওর জন্য আলাদা করে রুটি আর সবজি দিতে বললেন। ওয়েটার চলে যাওয়ার সাথে সাথে একটু ঝুঁকে বসলেন বিজয় পান্ডে।

'আমি অনেক ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশে এসেছি। সেটাও শুধু এই নোটবইটার জন্য। তুমি আমাকে দাও, প্লিজ।'

'আপনার নাম জানলাম। এবার বলেন আপনি কী করেন?'

'আমি কি জানো?' প্রায় ফিসফিস করে বললেন বিজয় পান্ডে।

'কী?'

'জাদুকর।'

পানির গ্লাস হাতে নিয়েছিলেন ডঃ আরেফিন। গ্লাসটা রেখে দিলেন। হাসি আসছিল বিজয় পান্ডের কথা শুনে। আরেকটু হলেও গ্লাসটা হাত থেকে পড়ে যেতো।

'আপনি জাদুকর! বাহ! কিসের জাদু দেখান!'

বিজয় পান্ডে কিছু বলার আগেই খাবার নিয়ে হাজির হলো ওয়েটার। এতো দ্রুত চলে আসবে ভাবেননি ডঃ আরেফিন। ওয়েটার চলে যাওয়ার পর তাকালেন বিজয় পান্ডের দিকে। বাবার মতো এই লোকটারও মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটেছে। এর বাইরে আর কিছু ভাবতে পারলেন না।

'জাদু তো এভাবে দেখানো যায় না, তবু তুমি যখন বলছো,' এটুকু বলে কিছু একটা বিড়বিড় করলেন বিজয় পান্ডে। এতে কী লাভ হলো বুঝতে পারলেন না ডঃ আরেফিন। তবে থমকে গেলেন টেবিলে ওয়েটার যে প্লেট রেখে গেছে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে। তার প্লেটে ভাত থাকার কথা, পাশের বাটিতে রুই মাছের ঝোল। কিন্তু সেগুলোর কিছুই নেই। বরং ভাতের প্লেটে একগাদা তেলাপোকা নাড়াচাড়া করছে। আর রুই মাছের ঝোল রাখা বাটিটায় দেখা যাচ্ছে কতোগুলো ছোট ছোট ব্যাঙ। সেগুলো লাফ দিয়ে

বাটির বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। অথচ বিজয় পান্ডের সামনে রাখা প্লেটে রুটি আর একপাশে সব্জির বাটি ঠিকই আছে।

তেলাপোকাগুলো দেখতে গা ঘিনঘিন করছিল। ডঃ আরেফিন পানির গ্লাসের দিকে তাকালেন। সেখানে পানি নেই। ঘন থিকথিকে কালো রঙের তরল দেখা যাচ্ছে। অন্য কেউ হলে এখন হয়তো চিৎকার করে উঠতো। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলেন ডঃ আরেফিন।

'আপনি এটা কিভাবে করলেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'বিশ্বাস করছো না বলেই তো দেখাতে হলো!'

'আমার খাবার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে।'

'তুমি যা দেখছো, আমি তা দেখাচ্ছি। ওখানে ভাত আর মাছের ঝোলই আছে।'

'তারমানে দাঁড়াচ্ছে আপনি জাদুকর, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বাবাও আপনার মতো জাদুকর ছিলেন?'

'হ্যাঁ। তবে তার ক্ষমতা ছিল অন্য দিকে।'

'তিনি যেকোন মানুষের রূপ নিতে পারতেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছো,' বিজয় পান্ডে বললেন, 'এজন্যই আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে সামসুদ্দিন মারা গেছে। এমনও হতে পারে সে অন্য কোন রূপে আমাদের আশপাশেই আছে।'

'কিন্তু আমি নিজের উনার মৃতদেহ দেখেছি। ধর্মীয় নিয়ম অনুযায়ী তার দাফন হয়েছে আজিমপুর কবরস্থানে।'

'আচ্ছা।'

'আপনি খেয়ে নিন, আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।'

'একসাথে খাই চলো, বাইরে যাবে কেন? দেখো, তোমার প্লেটে আর বাটিতে সব ঠিক আছে।'

ডঃ আরেফিন দেখলেন প্লেটে ধোঁয়া উঠা গরম ভাত, বাটিতে বড় রুই মাছের পেটি আর ঝোল দেখা যাচ্ছে। এমনকি পানির গ্লাস থেকেও সেই কালো তরল উধাও। সেখানে স্বচ্ছ, পরিস্কার পানি দেখা যাচ্ছে। একটু আগে যা দেখেছেন সবই ছিল দৃষ্টিবিভ্রম, যা টেবিলের উল্টোদিকে বসে থাকা বিজয় পান্ডে নামের এই বয়স্ক লোকটার কাজ।

বিজয় পান্ডে বেশ মনোযোগ দিয়ে রুটি আর সবজি খাচ্ছেন। ডঃ আরেফিনের গলা দিয়ে ভাত নামতে চাইছে না। বারবার একটু আগে দেখা একগাদা তেলাপোকা, ছোট ব্যাঙ এগুলোই চোখে ভাসছে। তবু খেতে থাকলেন, পেট ঠান্ডা করা দরকার। পেট ঠান্ডা থাকলে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষে বিল দিয়ে বেরিয়ে এলেন ডঃ আরেফিন। সাথে বিজয় পান্ডেও আসছেন। লোকটাকে কড়াভাবে নিষেধ করেছেন নোটবুক দেয়া যাবে না। কিন্তু এই লোক নাছোড়বান্দা। সহজে হাল ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

বাইরে বেশ বাতাস। হাঁটতে হাঁটতে আবার ফুলার রোডে চলে এলেন ডঃ আরেফিন। দাঁড়ালেন। বিজয় পান্ডে বেশ ক্লান্ত হয়ে গেছে এটুকু হেঁটে।

'আপনি কোথায় যাবেন? উঠেছেন কোথায়?'

'আমি পল্টনে একটা হোটেলে উঠেছি। কিন্তু আজকে সেখানে যাওয়া হচ্ছে না।'

'তাহলে কোথায় যাবেন?'

'তোমার ওখানে।'

বিরক্ত হলেও কিছু বললেন না ডঃ আরেফিন। বাবার একসময়ের সঙ্গির সাথে খারাপ ব্যবহার করতে মন থেকে সায় পেলেন না। একটা রাত তার বাসায় থাকলে খুব বেশি অসুবিধা হবে না। এমনিতেও তিনি একাই থাকেন।

ফ্ল্যাটে পৌছাতে সময় লাগল না। ড্রইং রুমে বিজয় পান্ডেকে বসিয়ে নিজের স্টাডিরুমে ঢুকলেন ডঃ আরেফিন। টেবিলের ওপর থেকে নোটবুকটা নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকলেন। 'নেন, দেখে নিন,' ডঃ আরেফিন বললেন, 'যা দেখার দেখে নিন।'

বেশ উৎসাহের সাথে নোটবুকটা হাতে নিয়ে বসলেন বিজয় পান্ডে। একের পর এক পাতা উল্টালেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই তাকে বেশ হতাশ দেখা গেল।

'এখানে সব লেখাই তো সাঙ্কেতিক, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমারও একই অবস্থা।'

'তবে মুরশেদ মিয়াকে নিয়ে লেখাগুলো আছে। ওগুলো পড়া যায়।'

'আপনি মুরশেদ মিয়াকে চেনেন?'

'চিনবো না কেন? এরপর ওকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'খুঁজে বের করতে হবে না। সে কোথায় থাকে আমি জানি।'

'সত্যিই!! আমি তো ভাবছিলাম ওকে খুঁজেই পাবো না কোনদিন।'

'আমি ঠিকানা দিয়ে দেবো। আপনি ওখানে গেলেই পাবেন।'

'ওর কাছে পরে যাবো। আমি যে কাজে এসেছি সেটা আগে শেষ করতে হবে।'

'কী কাজে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করবে না ভেবেও জিজ্ঞেস করে বসলেন ডঃ আরেফিন।

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই,' বিজয় পান্ডে বললেন। 'নোটবুকটা নাও।'

নোটবুকটা নিয়ে স্টাডিরুমের ছোট টেবিলের ড্রয়ারে তালাবদ্ধ করে রাখলেন ডঃ আরেফিন। ফিরে এসে দেখলেন ড্রইংরুম ফাঁকা। ডানদিকের জানালাটা খোলা। অথচ স্পষ্ট মনে আছে এই জানালাটা লাগানো থাকে বেশিরভাগ সময়। বিজয় পান্ডে রুমে নেই। কখন বের হয়ে গেল, কিভাবে বের হলো বোঝা যাচ্ছে না। ফ্ল্যাটের দরজাও ভেতর থেকে আটকানো। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দেখলেন একটা কালো বেড়াল কার্ণিশ বেয়ে বেয়ে চলে যাচ্ছে। জানালাটা লাগিয়ে দিয়ে বেডরুমে চলে এলেন ডঃ আরেফিন। ঘুম আসার কথা নয়, কিন্তু অনেকদিন পর খুব তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়লেন।

অধ্যায় ২১

কুদ্দুসকে মিরপুর এলাকার প্রায় সব মানুষ চেনে। সবার কাছে সে একটা আজব চিড়িয়া। কখনো মিরপুর এলাকায় রাস্তাঘাটে জাদু দেখাচ্ছে, কখনো ফুটপাতে পুরনো বই বিক্রি করছে আবার কখনো চটপটি, ফুচকার দোকান নিয়ে বসে যাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে সে পাগলা কুদ্দুস, বড়দের অনেকেই সন্দেহ করে সে পুলিশের ইনফর্মার কিংবা গোয়েন্দা ধরনের কিছু।

আজ কুদ্দুস দাঁড়িয়ে আছে মিরপুর দশের মোড়ে। গত পাঁচ বছর আগেও মিরপুর এলাকায় মানুষজন কম ছিল। এখন দিন দিন মানুষ বাড়ছে। ভিড় বাড়ছে। চিড়িয়াখানা এলাকায় সন্ধ্যার পর মানুষের দেখা মিলতো না। এখন সে জায়গাটাও আর শান্ত নেই। সারাক্ষণ মানুষের কলরব।

ছোট যে রুমটায় ভাড়া থাকতো, সে রুমটা ছেড়ে দিয়েছে। না ছেড়ে দিয়ে উপায় ছিল না। সে রাতে আক্রমণের পর আবার আক্রমণ হতে পারে। দোষটা অবশ্য তারই। তার উচিত ছিল ছেলেটাকে মুরশেদ মিয়ার কাছে হস্তান্তর করা। কিন্তু বাড়তি কিছু ক্ষমতার লোভ সবারই থাকে কমবেশি। মুরশেদ মিয়া তাকে ঢাকায় থাকতে নিষেষ করেছিল। ঐ লোকের এটাই সমস্যা। সবাইকে নিজের শিষ্য মনে করে। কুদ্দুস প্রথম দিকে মুরশেদ মিয়ার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে। কিন্তু তার মানে এই না যে এতে সে লোকটার চিরগোলাম হয়ে গেছে। যেমন হয়েছে শংকর। এই শংকর একসময় তার বন্ধু ছিল। এখন চরম শত্রু। সেদিন রাতে ওর অবশ্য ভালো রকম শিক্ষা হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কুদ্দুস জানে, শংকর হার মানার পাত্র না। আবার আসবে। যেকোন সময়, যেকোন দিক থেকে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে একটা সিগারেট ধরালো কুদ্দুস। ছেলেটাকে ঐ বৃদ্ধের কাছে হস্তান্তর করে একটা লাভ হয়েছে। বৃদ্ধ তাকে একটা রক্ষা কবচ দিয়েছে। এই রক্ষা কবচ পরা অবস্থায় কেউ তাকে আক্রমন করে সুবিধা করতে পারবে না। কবচটা গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে। এই কবচের

আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, শত্রু আশপাশে থাকলে এটা আগে থেকেই সাবধান করবে। কি পদ্ধতিতে সাবধান করবে এটা অবশ্য বলেনি বৃদ্ধ। বলেছে সময় এলেই বুঝতে পারবে কুদ্দুস। এখন পর্যন্ত কোনরকম সাবধান বার্তা পায়নি। তাই বোঝা যাচ্ছে না কবচটা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা।

দশ নাম্বার মোড় থেকে কাজিপাড়ার দিকে যাওয়ার রাস্তাটার এক কোণায় ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠেছে। লোকজন হাততালিও দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে। ভিড়টা কিসের তা দেখার জন্য দ্রুত এগিয়ে গেল কুদ্দুস। ভিড়ের ঠিক মাঝখানে লোকটাকে আগে কখনো দেখেনি। জাদু দেখাচ্ছে। তাসের জাদু। ছেলেভুলানো এইসব অর্থহীন জিনিস দেখতে জনসাধারনের দারুন আগ্রহ। অথচ এগুলো স্রেফ ফাঁকিবাজি [redacted] আর কিছু না।

ভিড় ঠেলে লোকগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুদ্দুস। দু'একজন এরকম ঠেলাঠেলিতে বিরক্ত হলেও সেগুলোকে গ্রাহ্য করলো না। এখন সরাসরি জাদুকরকে দেখতে পাচ্ছে। অতিরিক্ত লম্বা আর অতি মাত্রায় বাচাল লোকটা নিজেকে জাদুকরদের মধ্যে সেরা বলে বড় বড় কথা বলছে। ইচ্ছে হচ্ছিল ওর মাথায় দুটো ঘা বসিয়ে দিতে। তবে জনসাধারনের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটার জাদু ওরা ভালোই গ্রহন করেছে। এসব হাবিজাবি দেখার চেয়ে জটলা থেকে বের হয়ে আরেকটা সিগারেট ধরানো ভালো। ভিড় ঠেলে বের হতে গিয়েই কুদ্দুস বুঝল সমস্যা হয়ে গেছে। কবচ থেকে কিভাবে সাবধান বার্তা আসবে সেটা আগে বুঝতে না পারলেও এখন বুঝতে পারছে। ঠিক বুকের কাছে দারুন একটা ধাক্কা লাগল। মনে হলো কবচটা থেকে একটা বৈদ্যুতিক শক পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। আক্রমনকারী সম্ভবত আশপাশেই আছে। ভিড় ঠেলে বের হতে পারছে না কুদ্দুস। লোকগুলো এতো ঘন হয়ে একজন আরেকজনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে যে, নিজেকে বের করে আনতে প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হচ্ছিল। কিন্তু তাতেও বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি। একচুলও নড়তে পারেনি নিজের জায়গা থেকে। অন্যদিকে লোকজন যেন আরো বেড়েছে। নিজেকে গোলাকার একটা বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে আবিষ্কার করল কুদ্দুস। ভিড় ঠেলতে গিয়ে এরমধ্যেই ঘেমেনেয়ে একাকার অবস্থা।

শত্রুকে তখনই দেখতে পেল।

লম্বা ঐ জাদুকরের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। শংকর!

অধ্যায় ২২

মুরশেদ মিয়া তিনতলার রুমটায় বসে আছেন। চোখ বন্ধ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ঘুমিয়ে আছেন। বন্ধ চোখের পাতার নীচে চোখের মণিগুলো ডানে-বামে যাচ্ছে দ্রুত। মনে হচ্ছে তিনি কোন স্বপ্ন দেখছেন।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবে ধ্যানমগ্ন থাকার পর চোখ খুললেন। সারা শরীর ঘেমে গেছে। মাথা ব্যথা করছে খুব। বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শরীর আর আগের মতো সাড়া দিতে চায় না। অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি এসে যায়।

সাতজনের একটা দল ছিল। সেই দলের সদস্যদের মধ্যে একজনের খবর জানেন, সামসুদ্দিন আরেফিন। লোকটা এখন আর পৃথিবীতে নেই। বছর দশেক আগে শেষবার যখন দেখা হয়েছিল, খুব আফসোস করেছিল। বলেছিল, যে শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্য এতো আয়োজন, তার মুখোমুখি না হয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হচ্ছে। এরচেয়ে আফসোসের কিছু নেই। তার কাজটা যেন মুরশেদ মিয়া সম্পন্ন করেন। মুরশেদ মিয়া কথা দিয়েছিলেন। অবশ্য কথা না দেয়ার কিছু ছিল না, এ দায়িত্ব তার নিজেরও।

জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে সেই শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখন আর সেই আগের মতো শারীরিক বা মানসিক শক্তি কোনটাই অবশিষ্ট নেই। এছাড়া সঙ্গিসাথীদের মধ্যে বাকি পাঁচজনের সাথেও আর যোগাযোগ নেই। যতোটুকু জানেন, ওরা সবাই বেঁচে আছে। তার মতো ওদেরও বয়স বেড়েছে। একসময় দেশের সীমারেখা ছিল না। এখন ভিন দেশে এসে এই শত্রুকে মোকাবেলা করতে ওরা এগিয়ে আসবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ওরা কি ওদের ওপর দেয়া দায়িত্বের কথা মনে রেখেছে কিনা তাই বা কে জানে। তবে তিনি এই দায়িত্ব পালন থেকে একচুল নড়বেন না। তাতে মৃত্যু হলেও কোন আপত্তি নেই।

এসব ভাবতে ভাবতে বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাইরে প্রবল দিনের আলো। সূর্যের আলোয় সব ঝকঝকে তকতকে দেখাচ্ছে। বাড়িওয়ালা মনজুর একটা চেয়ার নিয়ে উঠোনের মাঝখানে বসে আছে। ওর হাতে একটা বাটি মুড়ি। মুড়ি খেতে খেতে রোদ পোহাচ্ছে ছেলেটা। সারাদিন কাজ কর্ম না থাকলে যা হয় আর কী। মনজুরের এভাবে মুড়ি খাওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ কয়েকবছর আগে দেখা এক বয়স্ক লোকের কথা মনে পড়ল। এই লোকটাও সকাল

থেকে দুপুর পর্যন্ত উঠোনে বসে থাকতো বাটিভর্তি মুড়ি নিয়ে। বগুড়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েছিলেন সেবার। যে বাড়িতে উঠেছিলেন সেই লোকটার বাবা ছিলেন এই বৃদ্ধ। লোকটার সাথে অল্প কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল, তাতে বুঝেছিলেন এই লোক সাধারন কেউ না। কিন্তু মাত্র এক রাত থেকেই চলে আসতে হয়েছিল। আবার সুযোগ হলে ঐ গ্রামে যাবেন বলে ঠিক করলেন।

গেটের সামনে বয়স্ক একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার পোশাক-আশাক কিছুটা অন্যরকম। এই ধরনের শার্ট-প্যান্টের চল নেই ঢাকায়। এই রাস্তায় বেশ কিছু কুকুর থাকে। ওরা নতুন এই অতিথিকে মেনে নিচ্ছে না। ওদের ঘেউঘেউয়ের শব্দে এলাকা মুখরিত। কিন্তু তাতে লোকটাকে খুব বেশি বিচলিত মনে হচ্ছে না। বরং সে ঐ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ঠিক এই জানালাটার দিকে মুখ করে। মনে হচ্ছে সরাসরি তাকিয়ে আছে তার দিকে।

তিনি দ্রুত তিনতলা থেকে নেমে এলেন। উঠোন পেরিয়ে দ্রুত গেটের কাছে গেলেন। বয়স্ক লোকটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে এগিয়ে এলো। তিনি ওর মাথায় টোকা দিলেন। অনেক দিনপর প্রাণখুলে হাসতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু হাসলেন না। লোকটাকে হাত ধরে গেটের ভেতরে নিয়ে এলেন। এভাবে অচেনা আর ভবঘুরে ধরনের একজন মানুষকে বাসায় ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল মনজুর। কিন্তু কিছু বলল না। মুরশেদ মিয়াকে কোন কিছুতে নিষেধ করার মতো সাহস তার নেই। তিনি সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে গেলেন। তার পিছু পিছু লোকটা এলো। ভেতরে ঢুকতেই দরজা লাগিয়ে দিলেন।

'কতো বছর পর?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'মনে হয় এই তো সেদিন,' একটা চেয়ারে বসলেন বিজয় পান্ডে। 'কিন্তু কয়েক যুগ পার হয়ে গেছে।'

'এতো বছর পর ঢাকায় কী মনে করে?'

'তুমিও জানো, কেন এসেছি,' বিজয় পান্ডে বললেন, 'আমার কাছে আরেফিনের ঠিকানা ছিল। গিয়ে দেখি ও অনেক আগেই মারা গেছে।'

'আমার ঠিকানা পেলে কী করে?'

'ওর ছেলের কাছ থেকে নিয়েছি,' বিজয় পান্ডে বললেন, 'এখন এখানকার অবস্থা বলো।'

'এখানে সব ঠিকঠাক,' মুরশেদ মিয়া বললেন, 'তুমি বাকিদের কথা বলো।'

'ওখানে সবাই ভালো আছে, আমরা বছরে একবার দু'বার দেখা করি,' বিজয় পান্ডে বলল, 'তোমার ঠিকানা নেই বলে খবর দিতে পারিনি।'

'সবাই সুস্থ তো?'

'গওহরের খবর জানি না, ওর সাথে অনেক বছর যোগাযোগ নেই। বাকি সবাই সবাই ফিট।।'

'তাহলে বলো, হঠাৎ ঢাকায় কেন?'

'দেখো, মুরশেদ, তুমি জানো কেন আমি ঢাকায়,' বিজয় পান্ডে বললেন, 'আমি একা এসেছি,কাজটা শেষ করতে।'

'আমার ওপর ভরসা ছিল না?'

'তুমি তো যোগাযোগের সব পথ বন্ধ করে রেখেছো, কিভাবে জানবো তুমি আছো? তুমিই বলো।'

'তা ঠিক, কিন্তু তোমার বয়সে কাজটা একটা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় না।'

'মুরশেদ, তুমি আর আমি কাছাকাছি বয়সের,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বিজয় পান্ডে, 'এই একটা কাজের জন্য জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ সুযোগ পেয়েছি, এটা নষ্ট করার কোন মানে নেই।'

'কিন্তু এটা তোমার ক্ষমতার বাইরে।'

'আমার ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কোন ধারনা নেই, মুরশেদ,' বিজয় পান্ডে বললেন, 'একটা সিগারেট দাও।'

মুরশেদ মিয়া ফতুয়ার পকেট থেকে একটা সিগারেট আর দেয়াশলাই

বের করে বিজয় পান্ডের হাতে দিলেন। বিজয় পান্ডে বয়সে তার চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড় হবেন। কিন্তু এখনো দেহের গঠন অটুট। চুল পেকে যাওয়া আর চামড়া ঝুলে যাওয়া ছাড়া বাহ্যিক আর কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না।

'কাজটা কিভাবে করবে?' জিজ্ঞেস করলেন মুরশেদ মিয়া।

'এখনো ঠিক করিনি। আমি তোমার এখানে দু'একদিন বিশ্রাম নেবো। টানা জার্ণি করে ক্লান্ত হয়ে গেছি।'

'তুমি যতোদিন ইচ্ছে থাকো, আমার কোন সমস্যা নেই।'

বিজয় পান্ডে সম্ভবত এই কথাটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। পা থেকে জুতোজোড়া খুলেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিছানায়। মুরশেদ মিয়াকে অবাক করে দিয়ে মিনিট খানেকের মধ্যেই নাক ডাকা শুরু করে দিলেন।

বিজয় পান্ডেকে নিয়ে মজার কিছু স্মৃতি আছে। লোকটাকে দেখা মাত্রই সেসব স্মৃতি টুপ করে জেগে উঠেছে মনের ভেতর। লোকটার ক্ষমতা সম্পর্কে ধারনা আছে।

মুরশেদ মিয়া একটা কাঁথা বিছিয়ে দিলেন বিজয় পান্ডের শরীরে। ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। এরমধ্যে তিনি কিছু কাজ সেরে নিতে পারেন। প্রথম কাজ হচ্ছে শংকরের খবর নেয়া। হাতে হাতে যোগাযোগ করার মতো কিছু থাকলে খুব ভালো হতো। এই মুহূর্তে শংকর কোথায় আছে, কী করছে কোন ধারনা নেই। কেন জানি মনের ভেতর থেকে থেকে কু ডাক দিচ্ছে। শংকরকে বিপদের দিকে তিনিই ঠেলে দিয়েছেন। ওকে আগের দিনই ঠেকানোর দরকার ছিল।

ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন দ্রুত। ছোট একটা উপায়ে শংকর কোথায় আছে কী করছে সব জানা যায়। কিন্তু সেজন্য এই ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় তালাবদ্ধ রুমটায় ঢুকতে হবে। বিজয় পান্ডে এখন গভীর ঘুমে।

এই ঘরের চাবি কোথায় রেখেছেন ঠিক মনে করতে পারছেন না। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর মনে পড়ল। রান্নাঘরের ডানদিকের যে তাকগুলো আছে, তার মধ্যে সবার উপরের তাকের ডানদিকে রেখেছিলেন চাবি। দ্রুত রান্নাঘরে চলে এলেন। উপরের তাক হাতড়ে বের করে আনলেন চাবিটা। উকি দিয়ে ড্রইং রুমে ঘুমন্ত বিজয় পান্ডেকে একনজর দেখে দ্বিতীয় তালাবদ্ধ রুমের সামনে দাঁড়ালেন। অনেক বছর এই রুমের চাবি খোলা হয়

না। তালায় রীতিমতো জং ধরে গেছে। বেশ কয়েকবার এদিক-সেদিক ঘোরাতে ঘোরাতে তালা খুলল। তিনি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। দরজার হা করে খোলা রাখলেন, যাতে সূর্যের আলোর যতোটুকু সম্ভব ভেতরে ঢোকে।

ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। সাজানো গোছানো ঘরটায় ধূলোর আস্তর জমেছে চারদিকে। ডানদিকে একটা বড় টেবিল, সেদিকে এগুলেন। টেবিলের ওপর বড় একটা মোমবাতি। পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে মোমবাতিটা জ্বালালেন। পুরো ঘরে গুমোট একটা পরিবেশ। তিনি মোমবাতির আগুনের ওপর হাত রাখলেন। আগুনের শিখা তার হাতের তালুতে গিয়ে লাগছে। চোখ বুজলেন। শংকর কোথায় আছে, কী করছে সব এখন পরিস্কার জানা যাবে।

অধ্যায় ২৩

কুদ্দুস এখন আর ভিড় ঠেলে বের হওয়ার চেষ্টা করছে না। সে তাকিয়ে আছে শংকরের দিকে। শংকরের দৃষ্টিও তার দিকে। দিনে-দুপুরে এতোগুলো মানুষের ভিড়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছে শংকর। ওর সাহস দেখে একটু অবাকই হয়েছে কুদ্দুস। দিন কয়েক আগে তার বাসায় আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারেনি, মার খেয়ে পিছু হটেছিল। আজ কোন সাহসে এই দিনে-দুপুরে আক্রমণ করার প্ল্যান করেছে সেটাই মাথায় আসছে না।

কুদ্দুস তার দুই হাত মুঠো করে রেখেছে। শংকরের সামনে থাকা লম্বা ম্যাজিশিয়ান লোকটা এই সময় এক অদ্ভুত কান্ড করল। বড় একটা সুটকেস খুলে এক গাদা টাকা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল। সেই টাকা বাতাসে ভাসতে ভাসতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। উপস্থিত জনগন এমনিতেই অস্থির ছিল, এতোগুলো টাকা বাতাসে উড়তে দেখে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বুঝতে পারছে কুদ্দুস, কাজটা ইচ্ছে করেই করেছে ঐ ম্যাজিশিয়ান। যাতে হুড়োহুড়ির মধ্যে তার ওপর ভালো করে আক্রমণ করতে পারে শংকর।

শংকর এগিয়ে এলো। ওর হাতে কোন অস্ত্র বা অন্য কিছু দেখতে না পেয়ে কিছুটা অবাক হলো কুদ্দুস। এক পা পেছনে নিয়ে নিজেকে স্থির রাখল। যাতে আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে পারে। শংকর এগিয়ে এসে একটানা ঘুষি বসাতে লাগল তার চোখে-মুখে। পেশাদার মুষ্ঠিযোদ্ধার মতো পাঞ্চগুলো ঠেকাতে লাগল কুদ্দুস। মাঝে মাঝে নীচু হচ্ছে, মাঝে মাঝে ডানে-বামে সরে যাচ্ছে। এতে কিছু আঘাত এড়ানো গেলেও এরমধ্যে বেশ কিছু আঘাত লাগল পেটে আর চোয়ালে। বুঝতে পারছে এভাবে বেশিক্ষণ ঠেকানো যাবে না শংকরকে। ওর গায়ে অসুরের মতো শক্তি ভর করেছে।

লোকজন উন্মত্তের মতো টাকা ধরার চেষ্টা করছে, এতে কে কার পায়ের তলে চাপা পড়তে যাচ্ছে সেদিকে কোন খেয়াল নেই। চারদিকে হৈ-হট্টগোল। যেকোন সময় পুলিশ চলে আসবে। এটা বুঝতে পেরেই শংকর দ্বিগুন গতিতে আঘাত করছে। দুই হাত দিয়ে ঠেকাতে ঠেকাতে চোখে

অন্ধকার দেখছে কুদ্দুস। এরমধ্যই দেখল লম্বা ম্যাজিশিয়ানটা কিছু একটা এগিয়ে দিচ্ছে শংকরের দিকে। ছোট একটা লাঠির মতো জিনিসটা। তবে এটা শুধু লাঠি নয়। এর ভেতরে আছে লম্বা স্টিলের পাত। লাঠির একমাথায় আলতো চাপ দিলে ধারালো স্টিলের পাতটা বের হয়ে আসবে। আবার ঢুকে যাবে। কেউ দেখে বুঝতেও পারবে না ছোট এই লাঠিটা আসলে অব্যর্থ এক অস্ত্র।

কুদ্দুস বুঝতে পারছে এভাবে আর বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। শংকর এবার শেষ আঘাত করতে এগিয়ে আসছে। ওর হাতের লাঠিটা সামনের দিকে বাড়ানো, কুদ্দুসের পেট বরাবর তাক করা।

শংকরের চোখের দিকে তাকাল কুদ্দুস। ঘৃণা আর ক্রোধ একসাথে খেলা করছে সেখানে। তাকে খুন না করে শান্ত হবে না। দিনে-দুপুরে জনসমক্ষে যেটা করা নিষেধ প্রাণ বাঁচাতে তাই করলো কুদ্দুস। চোখ বন্ধ করে আদি শক্তির কাছে শেষবারের মতো ক্ষমাপ্রার্থণা করল। তারপর দুই হাত বাড়িয়ে দিল শংকরের দিকে। তার দুই হাত এখন আর হাত নেই। সেগুলো এখন ধারাল দুই তলোয়ারের ফলা। সুর্য্যের আলোয় চকচক করছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল শংকর। সে যে লাঠিটা বাড়িয়ে ধরেছিল কুদ্দুসের দিকে, সেটা কুদ্দুসের দুই হাতের আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল। শংকরের দৃষ্টিতে বিস্ময় আর শেষ মুহূর্তের অসহায়ত্ব দেখল কুদ্দুস। কিন্তু তার কিছু করার নেই। সে বুঝতে পারেনি আসলে কার সাথে লড়াই করতে এসেছে। কুদ্দুসের দুই ধারাল হাতের অগ্রভাগ শংকরের পেটের ভেতর ঢুকে গেল। মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো শংকরের। দৃশ্যটা ভয়ংকর। পেট থেকে ধারাল তলোয়ারের মতো হাত দুটো বের করতেই সেগুলো আবার স্বাভাবিক রুপে ফিরে এলো। এতোগুলো লোকের হুড়োহুড়ির মাঝে শংকরের প্রাণহীন দেহটা পদদলিত হতে লাগল।

রক্ত মাখা হাত দুটো প্যান্ট থেকে একটা রুমাল বের করে মুছে নিলো কুদ্দুস। লম্বা ম্যাজিশিয়ান একপাশে বড় বড় চোখ করে সব দেখেছে। সে এখন তার জিনিসপত্র ফেলেই পালানোর চেষ্টা করল। ওকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেয়া যাবে না। ওকে দৌড়াতে দেখেই দৌড় শুরু করল কুদ্দুস। মিরপুরের ব্যস্ত রাস্তায় সার্কাসের ক্লাউনের মতো পোশাক পরা একজন লোক এলোপাথারি দৌড়াচ্ছে। দৃশ্যটা পথচারি, রাস্তায় চলমান বাস, বেবিট্যাক্সি

বা রিক্সার যাত্রীরা সবাই খুব আগ্রহের সাথে দেখছে। কেন দৌড়াচ্ছে এটা বুঝতে পেছনে তাকাতেই কুদ্দুসকে দেখতে পেল। তবে কুদ্দুসকে উস্কোখুস্কো চুল, উদভ্রান্তের মতো চেহারায় পাগল ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না। লম্বা ম্যাজিশিয়ান দৌড়ে বেশিদূর যেতে পারল না। রাস্তা পার হয়ে অন্যদিকে যেতে গিয়ে শাহবাগগামী ঝড়ের গতিতে চলা বাসের সামনে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে অন্যদিকে পড়ে যেতে পারত। কিন্তু তা না হয়ে সরাসরি চাকার তলায় চলে গেল পুরো দেহটা।

হাড়ভাঙার মটমট আওয়াজ আর জমির ম্যাজিশিয়ানের অন্তিম চিৎকার সেদিন রাস্তায় উপস্থিত কেউ হয়তো জীবনেও ভুলবে না।

দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে পাশের একটা গলিতে ঢুকে গেল কুদ্দুস। শিস দিতে দিতে হাঁটতে থাকল সে। যেন কোথাও কিছু হয়নি। একটু হলেই পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। এই দুজনের মৃত্যু সব স্বাভাবিক করে তুলেছে।

অধ্যায় ২৪

আরো বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। সালামের দিন কাটে তার ঘরে। বাইরে যেতে গেলেই বাঁধা। দরজার বাইরে দু'জন দশাসই পাহারাদার বসানো হয়েছে। ওরা কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না, বের হতেও দেবে না। বৃদ্ধের কাছে সালাম একবার জিজ্ঞেস করেছিল, দরজার সামনে এই পাহারাদার রাখার মানে কী! তাকে কি বন্দি করে রাখা হয়েছে কিনা! জবাবে বৃদ্ধ হেসেছিলেন, বলেছিলেন, সালামের নিরাপত্তার জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা। বৃদ্ধের ধারনা সালামের জীবন হুমকির মুখে আছে, যে কোন সময় নাকি আক্রমণ হতে পারে। সেই আক্রমণ ঠেকানোর জন্য এই ব্যবস্থা। সালাম অবশ্য বুঝতে পারছে এটা উনার একটা চালাকি করে বলে কথা। বৃদ্ধ চায় না, সালাম বাইরে আসুক। কারো সাথে কথা বলুক। তাতে কোন সত্য বেরিয়ে আসতে পারে। সেই ঝুঁকি বৃদ্ধ কখনোই নেবে না।

এখান থেকে যে করেই হোক বের হতে হবে। গত কিছুদিন ধরেই সে মনে মনে প্ল্যান করছে, আবার সেই প্ল্যান বাতিলও করছে। এখান থেকে বের হওয়ার আসল পথ কোনটা এখন পর্যন্ত সেটাই জানা নেই। করিডোর ধরে বাঁ দিকে যাবে না ডান দিকে যাবে সেটাই এখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারেনি।

আজকের দিনটা আরো বিরক্তিকর কেটেছে। সারা দুপুর সেই হলরুমের মতো বড় ঘরটায় কাটিয়েছে। সেখানে সেই দশজন সবসময় তার আশপাশেই ছিল। এদের কাজই হচ্ছে তাকে চোখে চোখে রাখা। ওরা সে দায়িত্ব নির্ভুলভাবে পালন করেছে। একটা উপায় আছে। তবে সেটায় ঝুঁকি অনেক বেশি। কাজটা করার জন্য যে পরিমাণ ক্ষমতা থাকার দরকার, সে পরিমাণ ক্ষমতা নিজের মধ্যে আছে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দিহান সে। তবু চেষ্টা তো করা দরকার।

সারা সন্ধ্যা বিছানায় বসে বসে ভেবেছে সালাম। এখানে থাকতে তার দম বন্ধ লাগছে। অথচ সে নিজ থেকে ঐ কুদ্দুসের সাথে এখানে এসেছিল।

তখন ঘুনাক্ষরেও টের পায়নি এভাবে আটকে যেতে হবে। তাহলে কোনদিনই আসতো না। ঢাকায় এসে যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল জমির ম্যাজিশিয়ানের সাথে থেকে, সেটা ছেড়ে আসাটা সম্ভবত বোকামি হয়েছে। শংকর নামের লোকটার উদ্দেশ্য ভালো ছিল না, কিন্তু কুদ্দুসের পাল্লায় পরেও খুব বেশি একটা লাভ হয়নি।

সালাম ঠিক করেছে এভাবে আর নয়। এখান থেকে আজকে রাতের মধ্যেই পালানোর চেষ্টা করতে হবে। এখানে প্রবেশের পথ যখন আছে, বের হবার রাস্তাও নিশ্চয়ই আছে। রাত আটটার দিকে একজন প্রহরী এসে খাবার দিয়ে গেল। সেগুলো ছুঁয়েও দেখল না সালাম। রাতের খাবারের পরপরই তার ঘুম চলে আসে। সেই ঘুম ভাঙ্গে একদম ভোরবেলায়। ওরা নিশ্চয়ই খাবারের সাথে কোন কিছু মিশিয়ে দেয়। নইলে এতো তাড়াতাড়ি ঘুম আসার কথা নয়। প্রহরী খাবার দিয়ে চলে গেল। একটু পর এসে খালি প্লেট-গ্লাস নিয়ে যাবে। খাবারের আয়োজন সামান্য হলেও খেতে বেশ ভালো। গরম ভাতের সাথে রুই মাছ, পুই শাঁক। সাথে এক গ্লাস দুধ। প্রহরী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই খাবারগুলো প্লেট থেকে নিয়ে বাথরুমে ফেলে দিয়ে এলো সালাম। সাথে দুধও। তবে সবটা ফেলল না, অল্প খাবারসহ প্লেট-গ্লাস এমনভাবে রাখল টেবিলের ওপর যেন মনে হয় একটু আগেই খাওয়া শেষ করেছে।

ন'টার দিকে প্রহরী এসে প্লেট-গ্লাস নিয়ে চলে গেল। এবার অপেক্ষার পালা সালামের। রাত বারোটার দিকে কাজে নামতে হবে। অপেক্ষার প্রহর বড় দীর্ঘ হয়। দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এমনিতেই ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় যে সামান্য নাস্তা হয়েছিল, তারপর আর কিছু খাওয়া হয়নি। অল্প কিছু খেয়ে নেয়া দরকার ছিল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন রাত এগারোটার দিকে ঘড়ির কাটা চলে গেল, সালামের মনে হচ্ছিল সে কোনমতেই চোখ খোলা রাখতে পারছে না। বাথরুমে গিয়ে চোখ-মুখে ঠান্ডা পানির ছিটে দিল। পানির ছিটে দেয়াতে একটু ভালো লাগছিল।

ঘড়ির কাটা যখন বারোটার ঘর ছুঁইছুঁই তখন দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সালাম। দারোয়ান দুজনের কাছে এই ঘরের চাবি আছে। করিডোরের মোমের আলোতে দরজার এপাশ থেকে ওদের ছায়া পরিস্কার

দেখা যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা সেটা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। সালামের হাতে সরু একটা তারের মতো জিনিস। এটা একটা লোহার তার, এটা জোগাড় করতে বেশ কষ্ট হয়েছে। দরজার কি-হোল দিয়ে লোহার তারটা ঢুকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। এই কৌশলটা জমির শিখিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর হাল ছেড়ে দিল। এভাবে কাজ হবে না।

এবার দরজায় খুব আস্তে আস্তে টোকা দিতে থাকল। জোরে টোকা দিলে সবাই জেগে যেতে পারে। আস্তে টোকা দিয়ে দারোয়ান দুজনের একজনকে জাগাতে পারলেও হবে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে টোকা দেয়ার পর দরজার ওপাশে একজনের নড়াচড়ার শব্দ কানে এলো। সম্ভবত ঘুম ভেঙেছে। 'দরজায় টোকা দেন ক্যান?' ওপাশ থেকে ঘুমঘুম গলায় বলল এক দারোয়ান।

'আমার অনেক জ্বর। একটু দরজাটা খোলেন।'

'রাইতে দরজা খোলা নিষেধ আছে।'

'আমি কিন্তু সকালে বিচার দিমু। আপনের নাম কি?'

'আমার নাম রহমত।'

'আপনে দরজা খুলেন। আমার ওষুধ লাগবে।'

'আপনে দাঁড়ান। আমি দেখি জ্বরের ওষুধ পাই কিনা।'

দারোয়ানের হেঁটে যাওয়ার শব্দ কানে এলো। এখন মাত্র একজন দারোয়ান আছে, সেও ঘুমে। দরজার হাতল ধরে জোরে টান দিল সালাম। কাজ হলো না। কিছুক্ষনের মধ্যেই ফিরে আসার শব্দ পাওয়া গেল। দরজার নীচ দিয়ে একপাতা ওষুধ বাড়িয়ে দিয়েছে লোকটা। দরজা না খুলে ওষুধ দেয়ার এই পদ্ধতিটার কথা মাথায় আসেনি সালামের। বাধ্য হয়ে ওষুদের প্যাকেটটা নিলো।

'যান, এবার ওষুধ খাইয়া ঘুমান।'

রাগ হচ্ছিল সালামের। আজ রাতেই এখান থেকে পালাতে হবে। এতো সহজে হার মানবে না। দরজার সামনে থেকে কয়েক পা সরে এলো। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গায়ে এতো শক্তি কোত্থেকে এলো জানে না সালাম। তবে এক ধাক্কাতেই পুরো দরজাটা ধ্বসে পড়ল। তাতে ঘুমন্ত দারোয়ান চাপা পড়লেও যে জেগে ছিল

সে সরে যেতে পেরেছে। লোকটার চোখেমুখে বিস্ময়। তার হাতে একটা ছুরি বেরিয়ে এসেছে।

লোকটা কিছু বুঝে উঠার আগেই সালাম ছুরিটা একটানে নিজের হাতে নিয়ে নিলো। তারপর বিদ্যুৎ গতিতে সেটা বসিয়ে দিল লোকটার পায়ে। ডান পায়ের হাঁটুর ঠিক উপরে। পা ধরে বসে পড়ল লোকটা, চেঁচাতে থাকল তারস্বরে। করিডোরটা এখনো ফাঁকা। কিন্তু খুব বেশি সময় নেই হাতে। এখানে অনেক লোক। এতো রাতের চিৎকার, হৈচৈ সবার কানে গেছে। যেকোন সময় লোক চলে আসবে। দ্রুত গতিতে করিডোর ধরে বাম দিকে এগুতে লাগল সালাম।

এখনো কেউ সামনে পড়েনি। তবে লোকজনের কথাবার্তা কানে আসছে। কেউ একটা ঘন্টা বাজাচ্ছে কোথাও। করিডোর ধরে বাম-ডান করতে করতে একদম শেষ মাথায় চলে এলো সালাম। একটা অন্ধ-গলির মতো জায়গাটা। এরপর আর কিছু নেই। সামনের পথ বন্ধ।

দম নেয়ার জন্য দাঁড়াল সালাম। ওদের হাতে ধরা পড়তে হবে বুঝতে পারছে, কিন্তু তার আগে শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে। চারপাশে হৈ হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। লোকজনের দৌড়ে যাওয়ার শব্দ কানে আসছে। কিন্তু করিডোরের এই দিকে এখনো কেউ আসেনি। দু'পাশের দেয়াল হাতড়াতে থাকল সালাম। কেন জানি মনে হচ্ছে এটাই করিডোরের শেষ নয়। মোমবাতির আলোয় পরিস্কার দেখা যাচ্ছে না কিছু। তবে হাতড়াতে হাতড়াতে ডান দিকের দেয়ালের কোণার দিকে উঁচু একটা জায়গা হাতে লাগল। মনে হলো এটা কোন ধরনের সুইচ বা বোতাম। এর কাজ কি! আগেপিছে না ভেবেই বোতামটা চেপে ধরল সালাম। আশপাশে কোথাও ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। দেয়ালের একটা অংশ সরে যাচ্ছে। অন্ধকার একটা পথ দেখা যাচ্ছে। দেয়াল থেকে একটা মোমবাতি খুলে হাতে নিলো সালাম। দেয়ালের সেই অংশে ঢুকে পড়ল। ঢুকে পড়ার সাথে সাথে দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গেল।

মোমবাতির অল্প আলোয় তেমন কিছুই চোখে পড়ছিল না সালামের। পায়ের নীচে পাথুরে পথ। অল্প ভেজা। সেই ভেজা অমসৃণ পথে হাঁটতে থাকল সালাম। চারপাশে কোন শব্দ নেই। এখানে নিশ্ছিদ্র নিরবতা।

অধ্যায় ২৫

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাটাই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। লোভ, হিংসা, দ্বেষ এগুলো জীবনকে কঠিন করে তোলে। ছোট একটা দল, এই দলের সদস্যরা এখন একে অপরের ভাই, বন্ধু। আগামী আরো দুই বছর এখানেই থাকতে হবে, দিল্লির শেষ প্রান্তের এই প্রাসাদের মতো বাড়িতে।

বয়সে সবাই কাছাকাছি হলেও তরুণ মুরশেদ মিয়াকে সবাই একটু সমীহ করে চলে, সেই সাথে ভয়ও পায়। মুরশেদ এর কারন বুঝতে পারেনা। সে এমন কোন ক্ষমতা এখনো দেখাতে পারেনি যে তাকে ভয় পেতে হবে। এছাড়া বাকি ছয়জনের সাথে সে খুব আন্তরিকভাবে মেশে। সারাক্ষণ একসাথে প্রশিক্ষণ, শারিরীক শিক্ষা এগুলো করতে করতে যখন ক্লান্তির সর্বশেষ সীমায় পৌছে যায়, তখন মাঝে মাঝে বাইরে যাওয়ার অনুমতি মেলে। দল নিয়ে তখন সাধারনত দিল্লির পুরনো অংশে যায় মুরশেদ মিয়া। এখানকার খাওয়া-দাওয়া তার পছন্দের। দক্ষিণ ভারতের রাম আইয়ার অবশ্য মাংস খায় না, সে নিরেট নিরামিষভোজি। বাকিরাও কমবেশি মাংস এড়িয়ে চলে। তবে দুই বাঙালির এসব ছাড়া চলেই না। মাঝে মাঝে তারা সিনেমা দেখতে যায়। দিলীপ কুমারের ছবি আসলে সেটা না দেখে শহর থেকে চলে আসা অসম্ভব।

দিনগুলো এভাবে ভালো কাটছিল। মুরশেদ মিয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল বাকিটা জীবন এই প্রাসাদেই থেকে যায়। কিন্তু চাইলেই তো আর হয় না। প্রাসাদের মালিক যে অল্প বয়স্ক ছেলেটা, ফরিদ, প্রশিক্ষণ সে-ই দেয়। এতো কম বয়সী শিক্ষককে মেনে নেয়া মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে যায় মুরশেদ মিয়ার জন্য। কিন্তু এর সাথে সে এটাও স্বীকার করতে বাধ্য যে ফরিদ ঘন্টার পর ঘন্টা কোন একটা জিনিস নিয়ে অনবরত বকবক করতে পারে।

আজ দুপুরের দিকে মুরশেদ মিয়ার খুব ঘুম আসছিল। আজ হাতে কলমে বিশেষ কিছু জাদু দেখাচ্ছে জাহাঙ্গীর জাদুকর। এরমধ্যে একটা হচ্ছে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক'। এই জাদুর কথা শুনেছে মুরশেদ মিয়া। কিন্তু

সে জাদু যে সত্যি সত্যি কেউ দেখাতে পারে সেই ধারনা ছিল না।

তবে এসবের পাশাপাশি ফরিদ তাদের আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশলও শেখাচ্ছিল। এসব কেন শিখতে হবে এ নিয়ে বারবার প্রশ্ন করেছে মুরশেদ মিয়া। ফরিদ এড়িয়ে গেছে। তবে আজ সকালে ফরিদকে অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

রাত থেকে বৃষ্টি পড়েছে। সকালেও পুরো পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই অবস্থায় আজ প্রশিক্ষণ হবে না এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। মাঝখানের বড় রুমটায় সকালের নাস্তার আয়োজন হয়েছে। দু'পাশে মুরশেদ মিয়া আর তার ছয় সঙ্গি বসেছে। টেবিলের এক মাথায় বসেছে ফরিদ, অন্য মাথায় জাহাঙ্গীর জাদুকর।

সকাল ঠিক নয়টায় নাস্তা শুরু। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে মুরশেদ মিয়া। ন'টা বাজার আগে খাবারে হাত দেয়ার অনুমতি নেই। পাউরুটি, ডিম, কলা এসব সাধারন খাবারের সাথে এক গ্লাস দুধ। ঘুম থেকে অনেক আগে উঠতে হয় বলে ন'টা বাজতে বাজতে সবার খুব খিদে পেয়ে যায়।

ন'টার ঘন্টা বাজার সাথে সাথে খাবারের দিকে হাত বাড়াল সবাই। ফরিদ আর জাহাঙ্গীর জাদুকর বাদে। খেতে খেতে বাকিরা যখন লক্ষ্য করল এই দুজন খাচ্ছে না তখন সবাই থামল। সবার দৃষ্টি এখন ফরিদের দিকে। বোঝা যাচ্ছে ফরিদ কিছু বলবে এবং সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে।

ফরিদের চোখের ইশারায় টেবিলের দু'পাশে দাঁড়ানো ভৃত্য দুজন ভেতরে চলে গেল। পুরো ঘরে শুনশান নিরবতা।

'আমাদের পরিকল্পনা ছিল দুই বছরের,' ফরিদ বলল, 'ইচ্ছে ছিল, দুই বছর পর আপনারা সবাই পরিপূর্ণ জাদুকর হিসেবে বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু সেটা বোধহয় আর হচ্ছে না।'

'আজকেই সবাইকে চলে যেতে হবে,' ফরিদ বলল আবার, 'নাস্তা সেরেই আপনারা যে যেখান থেকে এসেছেন সেখানে চলে যাবেন। যাবার সময় সাবধান থাকবেন আর নিজেদের যতোটা সম্ভব লোকজনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন।'

একজন হাত তুলল, গওহর জামাল, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল ফরিদ। 'আমরা একটা বিপদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। সেটা এড়ানোই আমার লক্ষ্য। খুব বেশি সময় নেই আমাদের হাতে। নিন, নাস্তা শুরু করুন।'

অনেক প্রশ্ন ঘুরছিল মুরশেদ মিয়ার মাথায়। একটা ডিম আর কলা দিয়ে দ্রুত নাস্তা সেরে নিলো সে। পাশে বসা সামসুদ্দিন আরেফিনকে ইশারা করল দ্রুত সেরে নিতে। ব্যাপারটা ফরিদের নজর এড়ালো না।

'আপনারা কেউ দলবদ্ধ হয়ে যাবেন না, একা যাবেন।'

মুরশেদ মিয়া জানে ফরিদের কথার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। ফরিদ সেটা জানবে। কিভাবে জানবে এই কৌশল তাদের না শেখালেও মুরশেদ মিয়া জানে, ফরিদ তাদের সবার তুলনায় অনেক অগ্রগামী। তারা কে কী চিন্তা করে, কী সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে সম্পর্কে ওর আগে থেকেই ধারনা আছে।

'কী ধরনের বিপদ?' জিজ্ঞেস করল মুরশেদ মিয়া।

'আমাদের একদম নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার মতো বিপদ।'

'আমরা সবাই মিলে মোকাবেলা করতে পারি না?'

'আমি সেই ঝুঁকি নেবো না। আমি চাই না কেউ কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোক।'

'আমরা যাচ্ছি, আপনারাও কি যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল আজাদ মালিক।

'না। আমি আর জাহাঙ্গীর থাকছি।'

'আপনারাও তো বিপদে পড়বেন। তারচেয়ে আমরা থাকলে আপনাদের সুবিধা হবে। আমরাও আপনাদের বিপদ সামলাতে পারবো।'

'আপনাদের এখনো সেই শক্তি আসেনি। নইলে আমি আপনাদের কাউকে আপাতত হাতছাড়া করতাম না।'

'বিপদটা কী খুলে বলবেন?' এবার প্রশ্ন করল শ্যামশংকর ত্রিবেদি। এমনিতে মানুষটা কম কথা বলে। কিন্তু এবার প্রশ্ন না করে পারল না।

'ভালোর সাথে যেমন মন্দ থাকে, সত্যির সাথে যেমন মিথ্যা থাকে, তেমনি আমাদেরও প্রতিপক্ষ আছে। এতো বছর তারা আমাদের খোঁজ পায়নি। এখন খোঁজ পেয়েছে। যে কোন সময় ওরা আক্রমণ করে বসতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের বাঁচার কোন সুযোগ নেই।'

'ওরা কি সংখ্যায় অনেক বেশি?'

'হ্যাঁ, ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি। ওদের জাদু শক্তিও বেশি। আপনারা ওদের বেশিক্ষণ ঠেকাতে পারবেন না।'

'পারবো না? আপনি আমাদের নেতা হয়ে এভাবে বলছেন?'

'আমি আপনাদের নিয়ে কোন ঝুঁকি নেবো না। আমার ওপর আদেশ আছে।'

'আপনাকে এই আদেশ কে দিচ্ছে? আমরা তো শুধু আপনাকে চিনি।'

'আমি আর জাহাঙ্গীর শুধুমাত্র প্রশিক্ষক আর বার্তাবাহক। এর বেশি কিছু নই। অল্প কিছু শিক্ষা আপনাদের দিয়েছি। এর বেশি কিছু বলার নেই।'

মুরশেদ মিয়া ফরিদ আর শ্যামসুন্দরের কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ মনে হলো দূর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ আসছে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বাজ পড়ছে মাঝে মাঝে। এসব শব্দের মধ্যেও আলাদা করে শব্দটা চেনা যাচ্ছে। রুমের বাকিদের দিকে তাকাল মুরশেদ মিয়া। কেউ এই শব্দটা শুনেছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। সবার মনোযোগ ফরিদ আর শ্যামশংকরের দিকে।

শব্দটা কাছাকাছি চলে এসেছে। মনে হচ্ছে একপাল ঘোড়া দৌড়ে আসছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মুরশেদ মিয়া। সবাইকে ইশারা করল চুপ করতে। সাথে সাথে সবাই সাবধান হয়ে গেল। ফরিদ এগিয়ে গেল জানালার দিকে। ঘরের সবগুলো পর্দা দ্রুত নামিয়ে ফেলা হলো। মুরশেদ মিয়া আর বাকি ছয়জনকে জানালার কাছ থেকে দূরে দাঁড়াতে বলে ফরিদ আর জাহাঙ্গীর জাদুকর জানালার কাছে অবস্থান নিলো।

এই অবস্থায় কী করা উচিত মাথায় আসছিল না মুরশেদ মিয়ার। শত্রুকে এখনো দেখা যাচ্ছে না। তবে কাছাকাছি চলে এসেছে এটা নিশ্চিত। এরা কারা? কি চায়?

বাইরে এখন রীতিমতো ঝড় হচ্ছে। পুরো পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এসেছে। প্রাসাদের বাইরে উঁচু লোহার গেটটা বিকট শব্দ করে ভেঙে পড়ল। গেটে একজন দারোয়ান ছিল, ওর আর্তচিৎকার দূর থেকেও পরিস্কার শুনতে পেল মুরশেদ মিয়া। ফরিদ এগিয়ে এলো বাকি সবার দিকে।

'আমি আপনাদের আগেই বলেছি, ওরা সংখ্যায় বেশি, জাদু শক্তিও বেশি। তবে এই ঘাঁটিতে আমাকে হারানো কঠিন। কিন্তু এখানে আপনাদের আর এক মুহূর্ত থাকা চলবে না। জাহাঙ্গীর আপনাদের পথ দেখাবে।'

মুরশেদ মিয়া বুঝতে পারল এখানে আপত্তি করার সুযোগ নেই। ফরিদ এমনি এমনি তাদের চলে যেতে বলছে না। জাহাঙ্গীরের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল সাতজন। করিডোরের পর করিডোর ধরে, সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত নীচের দিকে নামতে থাকল ওরা। বাইরের পৃথিবীর শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। জাহাঙ্গীর জাদুকরের হাতে ছোট একটা মশাল। এই মশালের আলোয় অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল সবাই। সুড়ঙ্গটা চাপা। দু'জন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। মাথার ওপরও খুব বেশি জায়গা নেই। গওহর জামিল আর মুরশেদ মিয়া একটু লম্বা বলে কুঁজো হয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

সুড়ঙ্গের শেষ সীমায় কী আছে কোন ধারনা নেই। বাইরের পৃথিবীতে কী হচ্ছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। ফরিদ একা কী করে সামলাচ্ছে ধারনা করতে পারছে না মুরশেদ মিয়া। বয়স অল্প হলেও ছেলেটার সাহস আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় চলে এসেছে সবাই। এরপর আর সামনে যাওয়ার কোন পথ নেই। এখন যদি সুড়ঙ্গে ঢোকার পথ কেউ আটকে দেয়, তাহলে আর এখান থেকে বের হওয়া যাবে না। দম বন্ধ হয়ে এখানে মরে পড়ে থাকতে হবে। তবে সেরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা কম। জাহাঙ্গীর জাদুকর সামনের দেয়ালে হাত দিয়ে কিছু একটা খুঁজছে। ইশারায় বাকি সবাইকে শান্ত থাকতে বলল। বেশ কিছুক্ষণ সেই দেয়ালের ওপর নীচ হাতড়াল জাহাঙ্গীর।

'আমি একটা দরজা খুলব, তোমরা সবাই চোখ বন্ধ করো।' জাহাঙ্গীর জাদুকর বলল।

চোখ বন্ধ করল সবাই। মুরশেদ মিয়ার খুব কৌতুহল হচ্ছিল, সবাইকে চোখ বন্ধ করতে বলে জাহাঙ্গীর জাদুকর কী করছে সেটা দেখবে। কিন্তু আদেশ অমান্য করার সাহস হলো না। চোখ বুজে থাকল, তবে কান খাড়া করে রেখেছে। জাহাঙ্গীর জাদুকর অদ্ভুত এক ভাষায় বিড়বিড় করে কিছু বলছে। এই ভাষায় অল্প কিছু মন্ত্র শিখিয়েছে ফরিদ। প্রাচীন এই ভাষাটা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে একসময় প্রচলিত ছিল। এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

জাহাঙ্গীরের কথায় চোখ খুলল সবাই। তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল সবাই।

জাহাঙ্গীর জাদুকরের পরেই দাঁড়িয়েছিল মুরশেদ মিয়া। সে কোনমতে চোখ ছোট করে সামনের দিকে তাকাল। এতো আলো, এতো সাদায় চোখে পরিস্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। একটু সামনেই জাহাঙ্গীরের অবয়বটা ঝাপসা লাগছে। জাহাঙ্গীর দরজা পেরিয়ে সামনে পা রাখল। তার দেখাদেখি মুরশেদ মিয়াও। পা দিয়েই চমকে গেল। তার পায়ের নীচে শক্ত বরফ।

এক এক করে সবাই বেরিয়ে এলো দরজা দিয়ে। জাহাঙ্গীর জাদুকরের ইশারায় বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। বাইরে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকাল সবাই। জায়গাটা চারদিকে বরফে আচ্ছন্ন। অথচ একটু আগেই সবাই দিল্লির বাইরের সেই প্রাসাদে ছিল। সকাল থেকেই বৃষ্টি, আর একটু আগে ঝড় শুরু হয়েছিল। অথচ এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ। মনে হচ্ছে অন্য কোন দেশে চলে এসেছে সবাই।

'তোমরা খুব অবাক হচ্ছো নিশ্চয়ই,' জাহাঙ্গীর জাদুকর বলল, তার হাতে একটা ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। এই ব্যাগটা এর আগে খেয়াল করেনি মুরশেদ মিয়া। কখন এই ব্যাগ জোগাড় করেছে জাহাঙ্গীর! সারাক্ষণ তো একসাথেই ছিল।

'আমরা একটা দরজা দিয়ে এখানে এসেছি, পৃথিবীতে এরকম কিছু দরজা আছে, যা স্থানের দূরত্ব ঘুচিয়ে দেয়,' জাহাঙ্গীর জাদুকর বলল, 'আমরা এখন আছি হিমালয়ে। এখানে তীব্র শীত। তোমরা সবাই এই ব্যাগ থেকে গরম কাপড় পরে নাও।'

ব্যাগটা এগিয়ে দিল মুরশেদ মিয়ার দিকে। চেইন খুলল মুরশেদ মিয়া। ভারী ভারী কিছু সোয়েটার দেখা যাচ্ছে। এখানকার তীব্র শীতে কিছুটা হলেও কাজে দেবে। সাদা একটা সোয়েটার নিজের জন্য নিয়ে ব্যাগটা গওহরের দিকে বাড়িয়ে দিল। এক এক করে সবাই সোয়েটার পরে নিলো।

'আপাতত কিছুদিন আমরা এখানে থাকবো, তারপর যে যার এলাকায় ফিরে যাবো,' জাহাঙ্গীর জাদুকর বলল।

'কিন্তু এখানে কোথায় থাকবো? কোন ঘরবাড়ি তো চোখে পড়ছে না,' রাম আইয়ার বলল।

'সে ব্যবস্থা আমি করবো, তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

'আর ফরিদ! তাকে যে আমরা একা ফেলে এলাম?'

'ফরিদ লড়বে। যতোক্ষণ সম্ভব। তারপর সেও পালাবে। যদি বেঁচে

থাকে তাহলে কোন না কোন দিন দেখা হবে,' বলে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল জাহাঙ্গীর জাদুকর।

'এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা বৌদ্ধ মন্দির আছে। সেখানেই আশ্রয় নেবো আমরা। তোমরা কেউ কোন কথা বলবে না। আমি বলবো, তোমরা সবাই মৌনব্রত পালন করছো, ঠিক আছে?'

মাথা নাড়াল সবাই। তারপর জাহাঙ্গীর জাদুকরের পেছন পেছন হাঁটতে থাকল। মুরশেদ মিয়ার জন্য সেটাই প্রথম বরফ দেখা। চারপাশ এতো সাদা যে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। সোয়েটারটা এখানকার শীতের জন্য যথেষ্ট না হলেও খুব বেশি শীত লাগছিল না। তার পাশে হাঁটছে সামসুদ্দিন আরেফিন। তাকে বেশ খুশি খুশি মনে হচ্ছে।

'এইরকম একটা দরজা চেনা থাকলে খুব সুবিধা,' সামসুদ্দিন আরেফিন বলল, 'আমার খুব ঢাকায় ফিরতে ইচ্ছে করছে।'

'আপাতত এখানে কয়েকদিন থাকতে হবে,' মুরশেদ মিয়া বলল, 'তারপর তো সবাই ফিরবো।'

জায়গাটা খুব বেশি ঢালু নয়, নীচে নামতে খুব বেশি অসুবিধা হচ্ছিল না। মুরশেদ মিয়া দেখল অনেক দূরে ছোটখাট একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। আকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে ওটা মন্দির জাতীয় কিছু। গন্তব্য এতো কাছাকাছি দেখে স্বস্তি পেল। কিন্তু একই সাথে একটা অস্বস্তি মনের মধ্যে খোঁচাচ্ছিল। ফরিদ একা লড়াই করতে থেকে গেল কেন? ফরিদ কী আদৌ বেঁচে আছে? আবার কী কোনদিন দেখা হবে?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মুরশেদ মিয়া। মাঝে মাঝে স্মৃতি খুব যন্ত্রণা দেয়। এতো পরিস্কার, ঝকঝকে সব স্মৃতি, মনে হয়ে এই তো সেদিন এসব ঘটেছিল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্মৃতি মানুষের সাথে প্রতারণা করতে শুরু করে। অথচ তার ক্ষেত্রে ঘটছে উল্টো। তিনি মাঝে মাঝেই স্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যান। এমনকি খুব ঝামেলার মধ্যেও হঠাৎ করেই পুরনো দিনগুলো ফিরে আসে তার মাঝে। চোখ খোলা রেখেই তিনি দেখে চলেন সেই দিনগুলো। এগুলো কী কোন লক্ষণ? ঠিক এমন একটা সময়ে ঐ সময়ের ঘটনা মনে পড়ার কারণ কী? ফরিদের সাথে এরপর আর দেখা হয়নি, জাহাঙ্গীরের সাথেও না। সম্ভবত ওরা দুজন মারা গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে। বাকি সাতজনের সাথে বছর দশেক পরপর মাঝে মাঝে দেখা

হতো। কিন্তু ঠিক যে কারনে একসময় তারা একত্রিত হয়েছিল, তেমন কোন কিছু না পেয়ে সবাই কেমন গুটিয়ে গেছে নিজের মাঝে। একমাত্র মুরশেদ মিয়াই হাল ছাড়েননি। তিনি বিশ্বাস করেন, যে বিশেষ শত্রুর জন্য একসময় তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, সেটা অবাস্তব কিছু নয়। এক সময় না একসময় সেই শত্রুর আগমন ঘটবে। কিংবা সম্ভবত ঘটেও গেছে।

একটু আগে শংকর আর জমিরের মৃত্যু দেখেছেন। অনেক দূরে ঘটতে থাকা ঘটনা তিনি দেখতে পারেন, কিন্তু সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। এতোটা ক্ষমতা এখনো হয়নি। শংকর আর জমিরের বীভৎস মৃত্যুতে তিনি কেঁপে উঠেছেন। এই কুদ্দুসকে একসময় নিজ হাতে তৈরি করেছেন। অথচ আজ সেই কুদ্দুসের হাতেই দু'দুজন বিশ্বস্ত লোককে হারাতে হলো।

শংকরের মতো বিশ্বাসী লোক পাওয়া কঠিন। কুদ্দুসকে কেন জানি পছন্দ করতো না শংকর, হয়তো তিনি ওকে বেশি প্রশ্রয় দিতেন ব্যাপারটা মেনে নিতে পারতো না। যাই হোক, শংকর আর নেই। ওর জায়গায় অন্য কাউকে লাগাতে হবে। শংকর ছিল ডান হাত। সেই ডান হাতের বিকল্প খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে।

তবে তিনি বিস্মিত অন্য একটা ব্যাপারে। কুদ্দুসকে বেশি প্রশ্রয় দেয়ার পরও ওর জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর খুব বেশি একটা আস্থা ছিল না। প্রায় পনেরো বছর আগে তাকে ছেড়ে যাওয়া কুদ্দুস যে এতো উন্নতি করে ফেলেছে এটা তার ধারণা ছিল না। শংকরেরও ছিল না। তাহলে যেচে পড়ে মরতে যেতো না।

কুদ্দুসের এই উন্নতির মূলে কী আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। আপাতত এদিকে মনোযোগ দেবেন বলে ঠিক করলেন।

দ্বিতীয় ঘরটা থেকে বের হয়ে তালা দিলেন। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এলেন। বিছানায় বেঘোরে ঘুমাচ্ছে বিজয় পান্ডে। সত্যি সত্যি ক্লান্ত ছিল বেচারা, নইলে এভাবে ঘুমানোর কথা নয়।

মাথাটা ভার হয়ে আছে। বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসা দরকার। মুরশেদ মিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরের দরজায় তালা লাগাতে ভুললেন না। যদিও জানেন বিজয় পান্ডে'র জন্য তালা কোন সমস্যা নয়। তবু সাবধান থাকা ভালো।

অধ্যায় ২৬

তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে হেঁটে হেঁটে ইন্ডিয়া গেইটের সামনে আসেন। তারপর ঘন্টা দুয়েক চুপচাপ বসে থাকেন। লোকজনের ব্যস্ততা, কোলাহল শোনেন মন দিয়ে। তারপর ফিরে যান পুরনো দিল্লিতে। তার সাথে থাকে মনসুর আলী। ছেলেটার বয়স অনেক কম। মাত্র পনেরো। এই বয়সের একটা ছেলে থাকবে তরতাজা, উৎফুল্ল। মনসুরকে দেখে মোটেও তা মনে হয় না। ছেলেটা সবসময় বিষন্ন, চুপচাপ। কিছু একটা ভাবে। কী যে ভাবে তা জানার চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। কৈশোরের চাপল্য এই ছেলের মধ্যে নেই। বরং সবসময়ই ওর চকিত দৃষ্টি দেখে মনে হয় কিসের যেন ভয় ওর মনের মধ্যে।

পুরনো দিল্লির এই বাড়িটাও অনেক পুরনো। পুরনো দিনের দরজা খুলে ঢুকলে বোঝা যায়, বাড়িটা বেশ বড়ও। মাঝখানে আয়তাকার উঠোন, দু'পাশ ঘিরে অনেকগুলো ঘর। ঘরগুলোতে আলোবাতাসের বড়ই অভাব। এরকম একটা ঘরেই তিনি থাকেন। মনসুর আলী একটা খাটিয়ায় ঘুমায়, উঠোনেই। তার খাবার-দাবার, ঘোরাঘুরি সবকিছুতেই মনসুরকে লাগে। গত পনেরো বছর এই মনসুর তার সঙ্গি। রক্তের সম্পর্ক বা অর্থ-কড়ির কোন সম্পর্ক নেই ওর সাথে। তবু ছেলেটা তাকে ছেড়ে যায় না। অবশ্য ওর যাওয়ার কোন জায়গাও নেই।

এই মুহূর্তে তিনি ইন্ডিয়া গেইটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সূর্য ডুবছে। পাখিরা ঘরে ফিরছে। দৃশ্যগুলো তিনি দেখতে পারছেন না, তবে অনুভব করছেন। ভালো লাগছে। চমৎকার শীতল একটা বাতাস আসছে উত্তর দিক থেকে। তিনি সেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

দৃষ্টিশক্তি নেই বলে কোন আফসোস নেই। মানবদেহের সামান্য সীমাবদ্ধতা তাকে পীড়িত করে। এইসব সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে মানুষ যে কতো কিছু করতে পারে, তা সে নিজেই জানে না। তিনি কোন কিছু দেখেন না, কিন্তু সব অনুভব করেন। শব্দগুলো বিশ্লেষণ করেন। চারপাশে

লোকজনের কথাবার্তা তার কানে আসে। এই কথাবার্তা থেকে সময় কিভাবে কিভাবে বদলে গেছে এবং সামনে আরো কতোটা বদলাতে পারে তা অনুমান করেন। লোকজন এখন অনেক আধুনিক, অনেক দ্রুতগতির। কিন্তু এটুকু গতিই সব নয়। মানুষ আরো গতিশীল হবে, এই বিশ্বাস তার আছে। উনিশশো নব্বই সালের এই পৃথিবীতে, এখনো যুদ্ধ-বিগ্রহ থামেনি এবং ভবিষ্যতেও থামবে না। প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ হোক, তা তিনি কখনোই চান না।

মনসুর আলী একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। এমনকি ওর ধোঁয়াটা এতো দূর থেকে তিনি টের পাচ্ছেন। কমদামী যে ব্রাণ্ডটা মনসুর আলী টানে সেটা তার একদমই অপছন্দের। ওকে আলাদা করে কিছু টাকা দেবেন ভাবছেন, যাতে ভালো ব্রাণ্ডের সিগারেট টানতে পারে।

মনসুরকে ইশারা করলেই চলে আসবে তার সামনে। ছেলেটা যাই করুক না কেন, ওর একটা চোখ সবসময় তাকে অনুসরণ করে। এর আগেও দেখেছেন, রাস্তা পার হতে গিয়ে বা কারো সাথে ধাক্কা খাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই মনসুর সেসব সামাল দিয়েছে।

আজ বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না। সন্ধ্যার পর থেকে মহল্লায় হৈ-চৈ এখন একটু বেশি। নতুন কিছু গায়ক এসেছে যারা নাক দিয়ে গান করে বিখ্যাত হয়েছে, তাদের দেখাদেখি পাড়া-মহল্লার চ্যাংড়া ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যাবেলাতেই গানের আসর বসায় কিংবা আকবরিয়া হোটেলে পঞ্চাশ ষাট-দশকের তার প্রিয় কিছু গান চলে। গান কিংবা হৈচৈ-এ তার তেমন আপত্তি নেই। আপত্তি হচ্ছে এগুলোর কোন সীমা থাকে না। প্রায়ই সীমালংঘন করে।

রাত বারোটার পর শান্ত হয়ে আসে মহল্লাটা। রাতে খাবার-দাবারের ঝামেলা করেন না নিজের জন্য, মনসুর খাদ্যরসিক বলে আকবরিয়া হোটেলে চলে যায় বেশিরভাগ দিন।

ঠিক একটার পর তিনি ঘর থেকে বের হলেন। মনসুর ঘুমাচ্ছে বেঘোরে। একপাশে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন মনসুরের সাহায্যে হাত ধরে ধরে ছাদে গেছেন। এখন কেউ সাহায্য না করলেও অসুবিধা হয় না। তিনি একা একাই ছাদে যেতে পারেন। ছাদে যাওয়া জরুরি কিছু না। কিন্তু মাঝে মাঝে রাতে ঘুম আসে না। অতীত সব স্মৃতি

মনে পড়ে।

ছাদে ওঠে কার্ণিশে পৌঁছানোর আগেই দাঁড়ালেন। হাতটা উঁচু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ উঁচু করে ধরে রাখার পর অনেক দূরে অস্পষ্ট একটা শব্দ পেলেন। ডানা ঝাপটিয়ে রাস্তার ওপাশের কদম গাছ থেকে লক্ষ্মী প্যাঁচাটা এসে তার হাতে বসেছে। প্যাঁচাটার নাম দিয়েছেন বাসন্তি। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে 'গুরগুর' শব্দ বের হয় মুখ থেকে। কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে দেয়ার পর হাতটা একটু নাড়াতেই বাসন্তি আবার উড়ে চলে গেল।

আজ দীর্ঘদিন পর শরীরটা বেশ ফুরফুরে লাগছে। একই সাথে কিসের এক সংকেত শুনতে পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে দূরে কোথাও যাওয়ার সময় হয়েছে। অনেক দূরে। আপন কেউ বিপদে পড়েছে এবং এই বিপদে একমাত্র তিনিই সাহায্য করতে পারবেন।

বহুদিন পৃথিবীর যাবতীয় কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন। খুব আপন মানুষজনের কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন ধোঁকা। গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে পরিচিত কোন মুখের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। তিনি বেঁচে আছেন না মরে গেছেন, এ নিয়েও হয়তো সংশয় আছে কারো কারো মনে। তিনি নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন অভিমানে আর হতাশায়। কিন্তু কিছু কিছু সময় এসব ভুলে যেতে হয়। বিশেষ করে যখন এতে পুরো মানব সভ্যতার গতিপথ পাল্টে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। তিনি দু'হাত তুললেন আকাশের দিকে। হাত দুটো মুঠো হয়ে আছে। বিড়বিড় করে কিছু বললেন। অনেকদিন পর। সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটায় ভিজতে ভিজতে তিনি নীচে নেমে এলেন।

ঘরে এসে প্রথমেই পরনের কাপড়-চোপড় পাল্টে নিলেন। ছোট একটা কাপড়ের ব্যাগ নিলেন সাথে। ভ্রমণ করার সময় হাল্কা থাকাই ভালো। মনসুরকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। অবাক চোখে চেয়ে আছে মনসুর। বুঝতে পারছে না রাত-বিরেতে এভাবে ডেকে তোলার কারন কি। তার হাতে ছোট ব্যাগটা দেখে দ্রুত বুঝে নিলো সব। একদৌড়ে মুখ-হাত ধুয়ে মনসুরও তৈরি হয়ে নিলো মিনিট দশেকের মধ্যে।

রাত দুটোর কাছাকাছি সময়ে দিল্লির শুনশান পথে একজন বয়স্ক মানুষ আর এক কিশোরকে বেশ ব্যতিব্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে দেখা গেল। বয়স্ক মানুষটি জানেন তার গন্তব্য কোথায়।

অধ্যায় ২৭

বেশ কিছুক্ষণ হাটার পর বুঝতে পারল একটু সরু সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে হাঁটছে সে। দুইপাশের দেয়ালে হাত দিয়ে দেখল। ভেজা ভেজা দেয়াল, পাথরের। মাথার উপরে যে ছাদ সেটাও পাথরের। মোমবাতির আলোয় হাঁটতে হাঁটতে ঠিক কোথায় যাচ্ছে ধারণা নেই। ইচ্ছে করছে আবার পেছনে ফিরে যেতে। তাতে আবার সেই বন্দি জীবনে ফিরে যেতে হবে। বন্দি জীবনে ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই। তাই হাঁটতে থাকল। পথ একসময় শেষ হবেই।

পথ শেষ হলো। কতোক্ষণ ধরে হেঁটেছে জানে না সালাম। যেখানে পথ শেষ হলো, সেখানে এসে বিস্ময়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। অনেক বড় একটা হলরুমের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালে অসংখ্য মশাল জ্বলছে। সেই মশালের আলোয় পুরো হলরুমটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোন মানুষ নেই। চারপাশ জুড়ে অসংখ্য মূর্তি। সবগুলো মূর্তি বিশাল। অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু হবে,ধারণা করল সালাম। এই ধরণের মূর্তি আগে কখনো চোখে পড়েনি। হিন্দু দেবদেবিদের মূর্তি কমবেশি দেখেছে। কিন্তু এগুলো কোনটাই সেরকম কিছু নয়। পাথরে বানানো মূর্তিগুলো মশালের আলোয় বিকট দেখাচ্ছিল। মূর্তিগুলোর বেশিরভাগই মানুষের মূর্তি। তবে তাদের চেহারা বীভৎস। সাপ, বেজি, কুমীর, শেয়াল এই ধরণের অসংখ্য মূর্তিও আছে।

এই মূর্তিগুলোর মাঝে হাঁটতে গিয়ে নিজেকে খুব ক্ষুদ্র লাগছিল। মনে হচ্ছিল, মূর্তিগুলোর যে কোন একটা জেগে উঠবে যে কোন সময়। তবে সেসব কিছু হলো না। হাঁটতে হাঁটতে হলরুমের শেষপ্রান্তে চলে এলো। এখানে ছোট একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। দরজাটা লোহার। কয়েকবার ধাক্কা দিল সে দরজায়, বোঝা যাচ্ছে এটা ভেতর থেকে আটকানো। এই দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়? ঐপাশে

কী আছে?

এই সময় একসাথে অনেকগুলো মানুষের পদশব্দ শুনতে পেল সালাম। যেপথ দিয়ে এসেছিল, সেদিকে তাকাল। সেখান থেকেই শব্দ আসছে। এই হলরুম থেকে বেরুনোর কোন পথ নেই। একমাত্র এই দরজাটা ছাড়া। কিন্তু এই দরজা খোলার সাধ্য তার নেই। এখানে ধরা পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতে দেখল ওরা চলে এসেছে। ওদের সবার সামনে সেই বৃদ্ধ দাঁড়ানো। লোকগুলোর ভাবভঙ্গী বেশ আক্রমণাত্মক। বৃদ্ধ হাত দেখিয়ে ওদের থামাল।

আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সালাম পিছু হটল কয়েক পা। দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধের ইশারায় কয়েকজন ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। বেশ সতর্ক ভঙ্গিতে।

এখান থেকে আর বেরুতে পারবে না। একবার ধরা পড়লে তাকে চব্বিশ ঘন্টা পাহারায় রাখবে বৃদ্ধ। যা করার এক্ষুনি করতে হবে। কিন্তু কী করতে হবে বুঝতে পারছিল না সালাম।

লোহার দরজায় হাত বোলাচ্ছিল নিজের অজান্তেই। উপরের দিকে ছোট একটা বোতামের মতো অংশ হাতে লাগল। জিনিসটা কী হতে পারে বোঝার আগেই চাপ দিল। কাজ হলো না। সময় নেই হাতে। তবু নিজের সবটুকু মনোযোগ দিয়ে আবার চাপ দিল। সাথে সাথে টের পেল লোহার দরজাটা নড়ে উঠেছে। দরজাটা দ্রুত একটানে খোলার চেষ্টা করল। পারল না। ভারি দরজাটা অল্প খুলল। অল্প ঐটুকু জায়গা দিয়েই ভেতরে ঢুকে গেল সালাম। ঢুকেই দরজাটা আটকে দিল। আটকে দেয়ার আগে দেখল লোকগুলো দৌড়ে আসছে। তবে ওরা এসে তাকে ধরতে পারবে না। এই দরজা যে কারো হাতে খুলবে না এটা নিশ্চিত।

চুপচাপ কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল সালাম। দরজার এপাশে চলে এসেছে, কিন্তু সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। গরম বাতাস আসছে কোথাও থেকে। চোখ বন্ধ করে বড় করে নিশ্বাস নিলো। তারপর পা বাড়াল সামনে। চোখ খুলল।

চারপাশে অন্ধকার। বোঝা যাচ্ছে বেশ রাত এখন। সালাম দেখল ক্ষয়ে যাওয়া একটা পুরনো বাড়ির দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। চারপাশে

বেশ শব্দ। রিক্সার টুংটাং, গাড়ির হর্ণ।

'তুই কে রে?'

পেছনে বিকট গলায় কেউ বলল।

ঘুরে তাকাল সালাম। ঐপাশের বিল্ডিং-এর সিড়ির গোঁড়ায় মধ্য বয়স্ক একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার চোখে অবাক দৃষ্টি।

'আমি সালাম,' কোনমতে বলল সালাম। চারপাশে তাকাল। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা জমিদারি আমলের পুরনো একটা বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছে সে। এখান থেকে বাউন্ডারি দেয়াল বেশ দূরে। ডানদিকে মেইন গেট। সেই গেটে একজন দারোয়ান, তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'ওই মজনু, ওকে ধর।'

মজনু নামের দারোয়ান আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, মধ্য বয়স্ক লোকটার হাঁক শোনা মাত্রই দৌড় দিল সালামের দিকে। সালামও দৌড়াতে শুরু করল। উঁচু দেয়াল টপকে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। দারোয়ান দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলার আগেই দেয়াল আঁকড়ে বেশ কিছুদূর উপরে উঠে গেল। মজনু বেশ মোটাসোটা মানুষ, নীচ থেকে তার নাগাল পেল না। দেয়ালের ভাঙা কিছু অংশে পায়ের সামনের অংশ দিয়ে চেপে ধরে আছে সালাম। পা ফসকালেই মজনুর হাতে পড়বে। কোনমতে নিজের ভারসাম্য ঠিক রেখে দেয়ালের মাথায় উঠে গেল। এপাশে ব্যস্ত রাস্তা। সরু ড্রেন। এতো উঁচু থেকে ঝাঁপ দিলে পা ভাঙার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ঝাঁপ না দিয়েও উপায় নেই। মজনু এরমধ্যে বড়সড় একটা লাঠি জোগাড় করেছে। সেটা দিয়ে নীচ থেকে সালামকে খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারসাম্য হারিয়ে সালাম যেন এপাশে পড়ে যায়।

প্রায় দশ ফুট উঁচু দেয়াল। ঝাঁপ দেবে কি দেবে না এমন ভাবতে ভাবতে দেখল নীল রঙা ছোট একটা পিক-আপ ট্রাক যাচ্ছে। পেছনের খোলা অংশে কিছু বস্তা রাখা। এটাই সুযোগ।

ঝাঁপ দিল সালাম। আরেকটু হলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শক্ত রাস্তায় পড়তো। কিন্তু ভাগ্য নিতান্তই ভালো। একটা বস্তার ওপর পড়লো। পিক-আপ চালক ব্রেক কষলো সাথে সাথে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সালাম। সরু রাস্তায় চলমান রিক্সা, গাড়ি এড়িয়ে যতো দ্রুত সম্ভব দৌড়াতে থাকল। আশপাশের

অনেকেই অবাক হয়ে তাকাল। কিন্তু কেউ পথ আটকাল না।

দৌড়াতে থাকল সালাম। দৌড়াতে দৌড়াতে অনেকটা পথ এসে পেছন ফিরে তাকাল। কেউ আসছে না। তবে তার দৌড় দেখে ডান দিকের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন পুলিশ বেশ সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে। চায়ের কাপ রেখে পুলিশের একজন পা বাড়াল তার দিকে।

আবার দৌড় শুরু করল সালাম। পেছনে পুলিশও দৌড় শুরু করেছে বুঝতে পারল। রাস্তাঘাট অন্ধকার হয়ে এসেছে। এরমধ্যে হাল্কা-পাতলা গড়নের একটা ছেলের সাথে স্বাস্থ্যবান দুজন পুলিশের দৌড়ে পেরে উঠার কথা নয়। পারলও না।

সালাম দেখল সে একাই প্রায় অন্ধকার একটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘামে পুরো শরীর ভিজে গেছে। একটা বড়সড় গাছের আড়ালে বসল। বড় করে নিশ্বাস নিচ্ছে। একটু বিশ্রাম না হলেই না। খিদেও পেয়েছে খুব। কিন্তু পকেটে টাকা নেই। ঢাকায় কেউ কাউকে বিনে পয়সায় খাওয়ায় না। কাজেই আজ রাতে খাওয়ার আশা করা ভুল। কাল দেখা যাবে।

জায়গাটা চিনতে খুব বেশি অসুবিধা হলো না। একটু সামনেই শহীদ মিনার। সে যেখান থেকে দৌড়ে এতোদূর এসেছে সেটা পুরান ঢাকার কোন এলাকা ছিল। শহীদ মিনার মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। এখানে একবারই এসেছিল জমির ম্যাজিশিয়ানের সাথে। বেশিক্ষণ জাদু দেখাতে পারেনি। সেবার মনে হয়েছিল, আরো বড় হলে একসময় সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। কিন্তু যেভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তাতে তার আর পড়াশোনা হবে বলে মনে হচ্ছে না।

আশপাশে লোকজন আছে কিছু। সেসব লোকজনের বেশিরভাগই হয়তো হাঁটতে বের হয়েছে, রিক্সাওয়ালার আশপাশের চা-ওয়ালার সাথে গল্প করছে। কিছু মানুষ ফুটপাতে কাঁথা বিছিয়ে বেশ আরাম করে ঘুমাচ্ছে। খোলা আকাশের নীচে কখনো ঘুমাতে হয়নি বলে খুব অস্বস্তি লাগছিল। ঘাম শুকিয়ে গেছে, এখন একটু ভালো লাগছে। তাই হাঁটতে থাকল সালাম। এই শহরে একমাত্র যাওয়ার জায়গা হচ্ছে জমির ম্যাজিশিয়ানের বাসা। যেখানে শংকরের সাথে একই ফ্ল্যাটে থাকতো সালাম। সেই ঠিকানাটা মনে আছে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় পৌঁছে যাবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় পালিয়ে গিয়ে আবার

নিজ থেকে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু এছাড়া আপাতত আর কোন পথ খোলা নেই। জমির ম্যাজিশিয়ান তাকে পছন্দ করতো, সবসময় আগলে রাখতো। ওর কাছে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবে না। শংকরের ব্যাপারে পরে চিন্তা করা যাবে।

আজ সন্ধ্যায় সে ছিল কোথায় আর এখন কোথায় এসেছে? জগত বড় অদ্ভুত। সে কি আসলে জেগে আছে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে! এমন একটা দরজার অস্তিত্ব কি সত্যিই আছে যা শুধু মনের কথা শুনে খুলে যায়? দারুন এক বিভ্রমের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে সবকিছু। কিন্তু সালাম এই মুহূর্তে বেশি কিছু চিন্তা করতে চাচ্ছে না। সে আপাতত উপভোগ করতে চাচ্ছে চমৎকার পরিবেশটা। আকাশে চাঁদ উঠেছে চমৎকার। হাওয়া দিচ্ছে খুব। আজ রাতে সে সারা পৃথিবী হেঁটে ফেলতে পারবে।

অধ্যায় ২৮

অনেক রাতে ফিরলেন মুরশেদ মিয়া। এই বাড়িতে যখন-তখন ঢোকার অধিকার তার আছে। ঢাকার রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ হাঁটতে ভালো লাগেনা। চারপাশে অনেক অনুযোগ, অভাব, রাগ, ঘৃণা এসব দেখতে পান তিনি। দেখতে ভালো না লাগলেও অনেক কিছু দেখতে হয়। এই মুহূর্তে ঘরে ঢুকেই দেখলেন বিজয় পান্ডে রাগ রাগ চেহারা করে চেয়ারে বসে আছেন। তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

'তোমার ঘরে তো খাবার কিছুই নেই,' বিজয় পান্ডে বললেন, 'আমি কি রাতে না খেয়ে থাকবো?'

'কী খেতে চাও?'

'বাদ দাও। এক রাত না খেলে কিছু হবে না।'

'তাহলে তো আরো ভালো।'

'ভেবেছিলাম, কয়েকটা দিন বিশ্রাম নেবো, কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'বিশ্রাম নেয়ার মতো সময় নেই। সাপ ফনা তোলার আগেই ওর মাথা থেতলে দেয়া দরকার।'

'সেটা ঠিক, কিন্তু কিভাবে শুরু করবে?'

'আমাদের একটা প্ল্যান ছিল, সেটা কি তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'প্ল্যানের শুরুতে ছিলাম আমি, তারপর সামসুদ্দিন, তারপর রাম, গওহর, শ্যামশংকর, আজাদ এবং সবার শেষে তুমি। গওহরের যদিও কোন খবর নেই।'

'হ্যাঁ। আমিই সবার শেষে।'

'শারীরিকভাবে যদিও এখন আগের মতো শক্ত নই, তবু আমি পারবো। আমি না পারলে রাম, শ্যামশংকর, আজাদ আর নয়তো তুমি আছোই।'

'আমি শুরুতেই তোমার সাথে থাকতে পারি। তাতে বিশাল কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না। ঝুঁকি নেয়ার দরকার কী!'

'না। ঝুঁকি নেয়ার প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে নিয়মের। আমি নিয়মের বাইরে যাবো না। তুমি নিয়ম ভেঙেছিলে। পনেরো বছর আগে তোমার সেই নিয়ম ভাঙার খেসারত দিতে হচ্ছে এখন।'

'আমি তো ভেবেছিলাম আমি ঠিক জনকেই ধরেছি। কিন্তু...'

'কিন্তু তুমি ভুল মানুষ বেছে নিয়েছিলে। এখন পনেরো বছর পর বিপদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।'

'আমি আসলে...'

'তাড়াহুরা করতে গিয়েই সমস্যা হলো। তোমার উচিত ছিল নিয়ম অনুযায়ী আমাকে খবর দেয়া।'

'ভেবেছিলাম এতো সময় হাতে নেই। এখন বলো, তুমি কিভাবে খুঁজবে? ঢাকা শহরে কাউকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন কাজ কিন্তু।'

'আমার ক্ষমতা কী ধারনা আছে নিশ্চয়ই!'

'তা আছে। কিন্তু...'

'তাহলে চিন্তা করো না। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমি খুঁজে বের করবো।'

'তুমি কি এখন বের হবে?'

'হ্যাঁ।'

'এতো রাতে রাস্তায় এলোমেলো ঘোরাফেরা করলে পুলিশে ধরবে।'

'তোমার কী ধারনা? আমি এই অবস্থায় ঘোরাফেরা করবো?'

মুরশেদ মিয়া বুঝতে পারলেন নিজের ভুল। বিজয় পান্ডে যে কোন পশু-পাখির রুপ ধারন করতে পারেন। নিজেকে আড়ালে রাখা তার জন্য কোন ব্যাপার না।

'আজকে রাতটা বাদ দাও।'

'না। আমার তর সইছে না। আজ রাতেই বের হবো।'

'হঠাৎ এতো উতলা হয়ে উঠেছো কেন?'

'তুমি হয়তো জানো না। কিন্তু শত্রুরা এখন অনেক শক্তিশালী। ওরা রীতিমতো বড়সড় একটা দল করেছে...'

'আমি জানি। আমার ওপর আক্রমণও হয়েছে। তবু, মাথা ঠান্ডা করে মাঠে নামা দরকার।'

'আমার মাথা যথেষ্টই ঠান্ডা।'

মুরশেদ মিয়া বুঝতে পারছেন এই লোককে থামাতে পারবেন না। রাত-বিরেতে অচেনা শহরে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াবে কে জানে।

'ঠিক আছে, যাও। আমার ঠিকানা তো চেনোই।'

বিজয় পান্ডে আর কিছু বললেন না। চুপচাপ বের হয়ে গেলেন। বিছানায় হেলান দিয়ে বসলেন মুরশেদ মিয়া। তার নিজেরও বেশ অস্থির লাগছে। মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা ঘটছে। সেটা কী হতে পারে!

অধ্যায় ২৯

অনেক রাত হলেও বড় হলরুমে জমা হয়েছে সবাই। চারশোর মতো লোক। সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার পরনে একই পোশাক, কালো প্যান্ট আর টি-শার্ট। মাথার চুল কামান। এরমধ্যে তরুণের সংখ্যাই বেশি। ওরাই দলের হয়ে সম্মুখ যুদ্ধে যাবে। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন উঁচু একটা পাটাতনের ওপর। তার সাথে প্রবীণ আরো কয়েকজন আছেন, সবার চোখ-মুখ গম্ভীর।

'তোমাদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ হয়েছে, এবার কাজে নামতে হবে,' বৃদ্ধ বললেন। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে। 'ওকে তোমরা খুঁজে বের করবে। জীবিত ধরে আনবে। ওকে আমাদের চাইই-চাই।'

তরুণরা একটা হুংকার দিয়ে উঠল।

'কাল সকালে তোমাদের কাউকে এখানে দেখতে চাই না আমি, কাজ শেষ না করা পর্যন্ত কেউ ফিরবে না।'

তরুণদের মধ্যে হাত তুলল একজন। হাত নামাতে ইশারা করলেন তিনি। 'কোন প্রশ্ন নয়। কাজ শেষ না করা পর্যন্ত কেউ এখানে ঢোকার অনুমতি পাবে না। এবার যাও।'

তরুণের দল যেভাবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল, সারিবদ্ধভাবেই তারা হলরুম ছেড়ে গেল। চারশো জনের একটা বড় দলকে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন কাজ। রীতিমতো শক্ত হাতে চালাতে হয় ওদেরকে। বৃদ্ধ এই কাজটা ভালো পারেন।

তরুণের দল চলে যাওয়ার পর হলরুমে বৃদ্ধ আর তার সহকারি প্রবীন কয়েকজন রয়ে গেছেন। তাদের চোখে-মুখেও অনেক প্রশ্ন। তবে আপাতত কোন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নন বৃদ্ধ।

তার বয়স এখন প্রায় সত্তুরের কাছাকাছি। এই বয়সেও তিনি যথেষ্ট শক্ত। লাঠি ছাড়াই চলাফেরা করতে পারেন। এতোগুলো লোককে নিজের বশে রাখার মতো শক্ত কাজটাও তাকে একাই করতে হয় এবং এজন্য কখনো তাকে বিরক্ত বা ক্লান্ত মনে হয়নি।

হলরুমের একপাশে বড় আর লম্বা একটা টেবিল আছে, তার দু'পাশে সাজানো চেয়ার। মাঝখানের চেয়ারে বসলেন বৃদ্ধ। প্রবীনের দলটা তাকে দেখে যার যার পছন্দমত চেয়ারে বসল।

'আপনার নির্দেশনাটা ভালো লাগেনি,' প্রবীনদের একজন বলল। এই লোকটার নাম জীবনানন্দ বিশ্বাস। একসময়ের ডাকসাইটে অংকের প্রফেসর।

'এখানে ভালো লাগা মন্দ লাগার কী আছে?' বৃদ্ধ বললেন, 'আমাদের এখন চুপ করে বসে থাকার সময় নয়।'

'এতোগুলো লোককে একসাথে মাঠে নামিয়ে দেয়ার দরকার ছিল না,' জীবনানন্দ বিশ্বাস আবার বলল।

'আপনি কি জানেন, ঢাকায় কে এসেছে?'

'কে?'

'যে এসেছে সে একাই ঐ চারশো জনের জন্য যথেষ্ট,' বৃদ্ধ বললেন, 'কাজেই ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।'

'আমরা বিকল্প কোন চিন্তা করতে পারি।'

'আমাদের হাতে দশটা বিকল্প তৈরি আছে। কিন্তু ওদের দিয়ে কাজ হবে না।'

'আপনি নিশ্চিত কাজ হবে না?'

'অবশ্যই নিশ্চিত নই। তার যে ক্ষমতা আমি দেখেছি, বিকল্পগুলো সেই ক্ষমতার ধারে-কাছেও নেই। কাজেই আমাদের ওকেই লাগবে।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমরা অযথাই উত্তেজিত হচ্ছি,' এবার প্রবীণদের মধ্যে আরেকজন বলল। এই লোকটার নাম আব্দুল মতিন। একসময় ব্যাঙ্কে চাকরি করতো।

'আপনারা কী আমার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে চান?' এবার সরাসরি

প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না এভাবে পিছু হঠতে চাইবে তারই দলের লোকজন।

'আপনি জানেন সেটা কোনদিনই সম্ভব নয়,' জীবনানন্দ বিশ্বাস বলল, 'কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে মাঝে মাঝে পরামর্শ করে নেয়া ভালো।'

'আমি পরামর্শ করে এতো বড় দল তৈরি করিনি,' বৃদ্ধ বললেন, 'আপনারা যে যার কামরায় চলে যান।'

সবাই বেরিয়ে গেলে হলরুমে একা দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ। তিনি একই সাথে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ। ছেলেটা এভাবে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে এটা কখনো চিন্তাই করতে পারেননি। অথচ ওকে নিয়েই সব পরিকল্পনা ছিল। অনেকদিন পর ওকে নিয়েই আবার নতুন করে শুরু করা যেতো।

বয়সের ভার কিংবা অন্য কোন কিছুতেই হতাশ হন না তিনি। তবে আজ এভাবে ছেলেটা হাত ফস্কে চলে যাওয়ায় রীতিমতো হতাশ হয়েছেন। ওকে সব খুলে বলা ভালো ছিল। যা হবার হয়ে গেছে। তার শরীরে আফগান রক্ত বইছে। তিনি সহজে হাল ছাড়েন না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি হাঁটতে থাকলেন।

অধ্যায় ৩০

দরজায় তালা লাগানো ছিল। সালামের জন্য তালা খোলা কোন সমস্যা নয়। ইদানীং সালাম বুঝতে পারছে সাধারন এসব জিনিস তাকে আটকে রাখতে পারবে না। অল্প কিছুক্ষণ শক্ত করে তালাটা ধরে রাখল, সেটা এমনিতেই খুলে গেল। দোতলার ল্যান্ডিং-এ বাড়িওয়ালার সাথে দেখা। অনেকদিন পর তাকে দেখে কিছুটা অবাক হলো লোকটা।

'আরে তুমি কোত্থেকে? অনেকদিন পর দেখছি, বাকি দুজন কোথায়?' বাড়িওয়ালা জিজ্ঞেস করল। ভদ্রলোক ব্যাঙ্কার ছিলেন, রিটায়ার করেছেন। এখন বাসায়ই থাকেন, বাড়িভাড়ার টাকা দিয়েই সংসার চালান। জমিরের কাছে শুনেছিল সালাম।

সালাম জানে না বাকি দু'জন কোথায়। কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছিল না। তবু বলে ফেলল, 'আমি বাড়ি গেছিলাম কয়দিনের জন্য। এখনই ফিরলাম।'

'ও আচ্ছা। কয়দিন ধরেই দেখছি দরজায় তালা। ভাবছিলাম সবাই মিলে বোধহয় বাইরে গেছো তোমরা।'

সালাম আর কিছু না বলে ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল। অনেকদিন পর এখানে ফিরে ভালো লাগছিল। সেই মামার বাড়ি থেকে চলে আসার পর এই ফ্ল্যাটটাকেই কিছুটা নিজের বলে মনে হয়েছিল। রুমগুলোর অবস্থা যা তা হয়ে আছে। কাপড়-চোপড় এলোমেলো, শংকরের রুমে বিছানার ওপর এখনো মশারী ঝুলছে। জমিরের রুমে জিনিসপত্র যেভাবে দেখে গিয়েছিল, সেভাবেই আছে। ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে বসল সালাম। আপাতত এটাই তার ঠিকানা। তবে ঐ লোকগুলো তার পিছু ছাড়বে না এটা নিশ্চিত। এই মুহূর্তে শংকর, কুদ্দুস, বৃদ্ধ লোকটা সবাইকেই তার কাছে

শত্রু মনে হচ্ছে। এরা সবাই কী চাইছে সেটাই এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছে না বলে আরো অস্বস্তি লাগছে।

গতরাতে অনেক ধকল গেছে। সারারাত ঘুম হয়নি। পেটে কিছু পড়েওনি। এই ফ্ল্যাটে ফ্রিজ নেই যে কিছু খাবার পাওয়া যাবে। বিছানার তোশক, বালিশ উলটে অল্প কিছু টাকা পেল সালাম। এই টাকাগুলো দিয়ে দিন দুয়েক নিশ্চিন্তে চলে যাবে। এরমধ্যে জমির ম্যাজিশিয়ান আর শংকর চলে আসবে নিশ্চিত। জমির ম্যাজিশিয়ান ঢাকার বাইরে যায় না কখনো। অথচ বাড়িওয়ালা বলল গত কয়দিন ধরে এই ফ্ল্যাটে তালা দেয়া! ওরা কোথায় গেছে? অনেক দূরে কোথাও যে ফিরতে দেরি হচ্ছে?

টাকা পকেটে নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলো সালাম। নীচে একটা হোটেল আছে, সেখানে সকালের নাস্তাটা সেরে নেয়া যায়। তারপর ফিরে গোসল সেরে একটা ঘুম দেবে বলে ঠিক করলো।

সারা দুপুর ঘুমিয়েছে সালাম। সেই বাজে স্বপ্নটা আবার দেখেছে। সেই কালো আলখেল্লাধারি মানুষটা আবার আসছে। ঘুম ভেঙে গেলে একা ঘরে অস্বস্তি লাগছিল। মনে হচ্ছিল, ঘরের অন্ধকার কোণে ঘাপটি মেরে কেউ বসে আছে।

বাইরে থেকে হেঁটে আসা যায় কিংবা বইপত্র পড়া যায়। শংকর অনেক বই পড়ে। প্রায় এক আলমারি ভর্তি বই আছে ওর রুমে। সবগুলো বাতি জ্বেলে দিয়ে শংকরের রুমে এলো সালাম। বিছানার ওপর থেকে মশারি খুলে সেটা গুছিয়ে রাখল। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র গোছগাছ করলো। ঘরটা মোটামুটি গুছিয়ে আলমারির দিকে এগুলো। আলমারিটা স্টিলের, অনেক পুরনো আর ভারি। ঠেলাগাড়ি থেকে নামিয়ে এটা ফ্ল্যাট পর্যন্ত তুলতে অনেক কষ্ট হয়েছিল ঠেলাওয়ালা আর তার সহকারির, মনে আছে সালামের।

আলমারিতেও তালা দেয়া। তবে এই তালা চাবি ছাড়া খোলা অসম্ভব মনে হলো। শংকর কি আলমারির চাবি সাথে নিয়ে গেছে না এই ঘরেই আছে? বালিশের তলা, তোশকের নীচে কিংবা টেবিলের ড্রয়ার সব খুঁজল

সালাম। পেল না। চাবি সম্ভবত নিজের কাছেই রাখে শংকর। তারমানে খুব দরকারি জিনিসপত্র আছে এই আলমারিতে। অন্য কারো জিনিসের ওপর এরকম আগ্রহ থাকা অনুচিত। কিন্তু খুব কৌতূহল হচ্ছিল আলমারিটা নিয়ে।

চাবি বানানো যায়। কিন্তু এই সন্ধ্যায় চাবিওয়ালা কোথায় পাওয়া যাবে কে জানে? সেই চাবিওয়ালা এই লক খুলতে পারবে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ফ্ল্যাটে এভাবে বসে না থেকে বেরিয়ে পড়ল সালাম। রাতে বাইরে কোন হোটেল থেকে খেয়ে একবারে ফিরবে। রাস্তাঘাটে কোথাও চাবিওয়ালা চোখে পড়লে তো কথাই নেই।

সন্ধ্যা ছ'টা বাজে মাত্র। রাস্তার নতুন সোডিয়াম বাতিগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। ফুটপাত ধরে ঢাকা শহরের ব্যস্ততা দেখতে দেখতে হাঁটতে থাকল সালাম। বুঝতে পারল না এরমধ্যেই তাকে অনুসরণ করতে শুরু করেছে পাঁচ জনের ছোটখাট একটা দল।

অধ্যায় ৩১

রাতে ঢাকা মেডিক্যালের মর্গে গিয়েছিলেন মুরশেদ মিয়া। সেখানে শংকর আর জমির ম্যাজিশিয়ানের লাশ রাখা আছে। এখন পর্যন্ত কেউ নিতে আসেনি কিংবা যোগাযোগও করেনি। মুরশেদ মিয়া জানেন কেউ যোগাযোগ করবেও না। জমির ম্যাজিশিয়ান কিংবা শংকর, এরা কেউই আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যোগাযোগ রাখতো না। শংকর তো রীতিমতো এড়িয়ে চলতো। মর্গে তাকেও শুরুতে ঢুকতে দিতে চায়

নি। কিন্তু বৃদ্ধ একজন মানুষ রোড এক্সিডেন্টে মারা যাওয়া ছেলের মৃতদেহ সনাক্ত করতে চাইলে আপত্তি করার কিছু থাকে না। এক এক করে তাকে অনেকগুলো মৃতদেহ দেখানো হয়েছে। এরমধ্যে দুটো ছিল শংকর আর জমির ম্যাজিশিয়ানের। দুজনের মৃতদেহের অবস্থা ভয়াবহ। বিশেষ করে শংকরের। তিনি মৃতদেহ দুটো দেখে বেরিয়ে এসেছেন মর্গ থেকে। বলেছেন তার ছেলের মৃতদেহ হয়তো ঢাকা মেডিক্যালে আসেনি, হয়তো সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যালে আছে। তার এ কথায় কেউ

আপত্তি বা সন্দেহপ্রকাশ করেনি।

শংকরের মৃতদেহটা দেখে খুব খারাপ লাগছিল। ওকে প্রায় নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। পরিবার থেকে পালিয়ে চলে আসা শংকরের কাছে তিনি একাধারে ছিলেন শিক্ষাগুরু, বড়ভাই কিংবা অভিভাবকের মতো। এরকম একজন বিশ্বস্ত শিষ্যের এভাবে চলে যাওয়াটা তিনি মানতে পারছেন না। আরো দূর্ভাগ্য এদের শেষ সৎকারটাও করতে পারবেন না। তাহলে পুলিশের সাথে অনেক কথা বলতে হবে। এই মুহূর্তে আর যাই হোক অন্তত পুলিশকে এড়িয়ে চলবেন বলে ঠিক করেছেন।

কুদ্দুসের ওপর খুব রাগ হচ্ছে। ওকে হাতের কাছে পেলে চরম শিক্ষা দিতে পারতেন। কিন্তু এই মুহূর্তে কুদ্দুস কোথায় আছে এটা কোনভাবেই বের করতে পারছেন না।

বিজয় পান্ডেও সেই গত রাতে বের হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, বয়স্ক মানুষ, ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু আজ এই বিকেলেও তার কোন খবর নেই। নিজের ঘরে পায়চারি করতে করতে পরবর্তী পদক্ষেপ ভেবে নিচ্ছিলেন।

এখন একটা কাজই করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে শংকরের বাসায় যাওয়া। ওর কাছে অনেক গোপন বইপত্র আছে, লেখা আছে। সেগুলো সাধারন কারো হাতে পড়া ঠিক হবে না। রাতের দিকে শংকরের বাসায় যাবেন বলে ঠিক করলেন।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দেখলেন বিজয় পান্ডে বাড়ির গেটে দাঁড়ানো। সিগারেট টানতে টানতে মনজুরের সাথে কোন কিছু নিয়ে গল্প করছে। এতোদূর থেকে ওদের কথাবার্তা শুনতে না পেলেও বুঝতে পারছিলেন বিজয় পান্ডে খুব হাসির কিছু একটা বলেছে। তাতে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাওয়ার মতো অবস্থা মনজুরের। জানালা থেকে ইশারা করলেন বিজয় পান্ডেকে। সেটা দেখতে পেয়েছে কিনা বুঝতে পারলেন না। তবে কথা সংক্ষিপ্ত করে বিজয় পান্ডে গেটের ভেতরে ঢুকে পড়েছেন।

শংকরের বাসায় একা যাবেন না। বিজয়কে সাথে নিতে হবে। তাতে লোকটাকে চোখে চোখেও রাখা যাবে।

এসব ভাবতে ভাবতেই দেখলেন বিজয় পান্ডে উপরে চলে এসেছেন।

'আমি তো ভাবছিলাম, তোমার দেখাই পাবো না!' মুরশেদ মিয়া বললেন।

'তোমাদের এই ছোট ঢাকা শহরে আমি হারিয়ে যাবো না, নিশ্চিত থাকো।'

একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন বিজয় পান্ডে।

'কোন অগ্রগতি হলো?'

'অগ্রগতি হয়নি, তবে নিম্নগতি হয়েছে।'

'কী রকম?'

'ঢাকা শহর ছেয়ে গেছে।'

'কিসে ছেয়ে গেছে?'

'ওরা দলে দলে এসেছে ঢাকায়। আমি ওদের দেখলেই চিনতে পারি।'

'কেন এসেছে বলে তোমার ধারনা?'

'ওরা খুঁজতে এসেছে। সম্ভবত ওরা আর আমরা একই জিনিস খুঁজছি।'

'তাহলে তো তোমাকে খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে।'

'হ্যাঁ। খুব দ্রুত। নইলে মহাবিপদ।'

'তুমি ওসব নিয়ম-টিয়ম বাদ দাও। আমি তোমার সাথে কাজে নামতে চাই।'

'সেটা সম্ভব নয়,' বিজয় পান্ডে বললেন, 'এতো বছর ধরে এই সময়ের অপেক্ষায় আছি। কাজটা আমি একাই করবো।'

'আচ্ছা। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। তুমি যাবে আমার সাথে।'

'কোথায়?'

'আমার এক শিষ্যের বাসায়।'

'না। তুমি যাও। আমি অন্যদিকে যাবো। তবে সাবধানে যেও।'

বিজয় পান্ডে'কে একা ঘরে রেখে বের হতে ইচ্ছে করছিল না মুরশেদ মিয়ার। কিন্তু লোকটাকে জোর করা যায় না কিছুতেই। একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ। একবার যা বলে ফেলে তা থেকে সরতে চায় না।

শত্রুরা হঠাৎ এতো আগ্রাসী হয়ে গেল কেন বুঝতে পারছেন না মুরশেদ মিয়া। তাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। আবার যে কোন সময় আক্রমণ হতে পারে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। মনজুর এখনো উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে হাসল।

'আপনার বন্ধু কিন্তু চমৎকার মানুষ,' মনজুর বলল।

'বাইরের কাউকে এই বাসায় ঢুকতে দেবে না,' মুরশেদ মিয়া বললেন, 'খুব সাবধান।'

'বাইরের কেউ মানে?'

'তোমার অপরিচিত যে কেউ! এই গেটের ভেতর যেন পা না রাখে।'

মুরশেদ মিয়া বললেন। পুরো গেটের সামনে একবার হাঁটলেন। গেটটাকে ছোট একটা জাদুতে বেঁধে দিলেন। যাতে বিপজ্জনক কিছু এখানে প্রবেশ করতে না পারে।

'চিন্তা করবেন না। আমি আছি না?'

মনজুর বলল।

ওর কথায় ভরসা করেন না মুরশেদ মিয়া, তবু জানেন, সময়ে তার জন্য জান দিয়ে দিতে আপত্তি করবে না এই ছেলেটা।

'আমি গেলাম। দ্রুতই ফিরবো।'

গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন মুরশেদ মিয়া। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। শংকরের বাসা এখান থেকে বেশ দূরে। ঢাকায় তিনি সাধারনত রিক্সা বা বাস ব্যবহার করেন না। হেঁটে চলে যান কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলে। বড় করে নিশ্বাস নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে এই গরমেও ওভারকোট পরে কেউ একজন তার পিছু নিয়েছে। তবে অন্যমনস্ক থাকায় লক্ষ্য করলেন না মুরশেদ মিয়া।

অধ্যায় ৩২

ঢাকাকে এখনো আপন করতে পারেনি সালাম। সবকিছুই এখনো অচেনা লাগে। এই মুহূর্তে সে দাঁড়িয়ে আছে শাহবাগ মোড়ে। জাদুঘরের সামনে ফুটপাতে চটপটি-ফুচকা বিক্রি হচ্ছে। এই জিনিস কখনো খেয়ে দেখেনি। আজ একটু আগে এক প্লেট ফুচকা খেয়েছে। বিস্বাদ এই জিনিসটা মানুষ কেন এতো আনন্দ করে খাচ্ছে বুঝতে পারল না। আশপাশে ব্যস্ত সব লোকজন দেখা যাচ্ছে। তবে তারা সবাই আড্ডা নিয়ে ব্যস্ত। বোঝা যাচ্ছে সন্ধ্যার পর কিছু লোক এখানে জড়ো হয় আড্ডা মারতে। আড্ডা মারতে থাকা এসব লোকজনকে দেখে মনে হয়, পৃথিবীতে কোথাও কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। একপাশে বসে থেকে এসব আড্ডা কান পেতে শুনেছে কিছুক্ষণ। বুঝতে পেরেছে এই আড্ডার কোন কিছুর সাথেই তার যোগাযোগ নেই। এরা যে জগতের মানুষ তার সাথে তার যোজন যোজন দূরত্ব।

রাস্তার উল্টোদিকে ফুলের দোকান। ফুল যে দোকানে বিক্রি হতে পারে এটা ধারনা ছিল না সালামের। গ্রামে গঞ্জে ফুল নিয়ে কোন মাতামাতি চোখে পড়েনি কোনদিন। রাজধানী বলেই ঢাকায় সবকিছু অন্যরকম।

ফুচকা খেয়ে ঝাল লেগেছিল। একপাশে চায়ের একটা স্টলে চা দিতে বলল সালাম। ফুটপাতের এক কোনায় বসল। চায়ের দোকানে বেশ ভিড়। চাওয়ালা চা বানাতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছে।

পৃথিবীতে একা বেঁচে থাকা খুব কষ্টের। এই মুহূর্তে কথা বলার মতো কেউ নেই সালামের। কুদ্দুস, জমির কিংবা শংকর, এই তিনজনকেই সে চেনে এই ঢাকায়। এদের সাথে যেমন হঠাৎ করেই দেখা হয়েছিল, তেমন হঠাৎ করেই এরা যেন হারিয়ে গেছে জীবন থেকে। স্কুলে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল সেই ছোটবেলায়ই, মামাবাড়ির কাজ করতে করতে জীবনে বন্ধু বলে কোন কিছুর সাথে পরিচিত হয়নি। কী একটা অস্বাভাবিক জীবন আমার, মনে মনে ভাবল আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সালাম।

মাথার ওপর সোডিয়াম বাতি জ্বলছে। চা'ওয়ালা সম্ভবত তাকে চা দেবার কথা ভুলেই গেছে। লোকটাকে মনে করিয়ে দিতে উঠে দাঁড়াতে গেল সালাম। কিন্তু কাঁধে হাত দিয়ে পাশ থেকে একটা ছেলে তাকে বসিয়ে দিল।

ডান দিকে ঘুরে তাকাল সালাম। অল্প বয়স্ক একটা ছেলে। লম্বা শুকনো মুখ, চোখ ছোট ছোট, গালের হাড় উঁচু। দু'হাতে শক্ত করে তার কাঁধ চেপে ধরে আছে। ছাড়ানোর চেষ্টা করল সালাম। পারল না। বাম দিক থেকে আরেকজন এসে তার হাত চেপে ধরল।

এই ছেলেটার চেহারা পরিচিত লাগল। হ্যাঁ। একে সে দেখেছে। তাকে ঘিরে যে দশজন ছিল, তাদের মধ্যে এই ছেলেটা ছিল। ওদের কারো সাথেই কথা হয়নি। কিন্তু প্রত্যেকের চেহারাই সে খুটিয়ে দেখেছিল। ওদের প্রত্যেকের চেহারাই তার চেহারার কাছাকাছি। অদ্ভুত ব্যাপার।

এরা তাকে খুঁজতে খুঁজতে ঢাকায় চলে এসেছে। দু'পাশ থেকে হঠাৎ এই আক্রমনে বেশ হতচকিত অবস্থায় আছে সালাম। সে খুব অমনোযোগি ছিল গত কয়েক ঘন্টা। নইলে এই ছেলে দুজন আরো অনেক আগেই তার চোখে ধরা পড়তো। এখন আর কিছু করার নেই। দুজনকে সামলানো খুব কঠিন কিছু হবে না। এতোগুলো লোক আশপাশে থাকতেও এরা এভাবে আক্রমণ করে বসল তার উপরে, তারমানে ওরা এখন আর কোনকিছুর পরোয়া করছে না। যে কোন মূল্যে সালামকে ওরা নিতে চায়।

তবে নিজের মনের বিরুদ্ধে কোথাও থাকতে চায় না সালাম। কেউ তাকে জোর করে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।

দু'পাশ থেকে দুজন প্রায় আঁকড়ে ধরেছে সালামকে। তবু এরমধ্যেই সর্বোচ্চ শারীরিক শক্তি খাটাল সালাম। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, ওরাও চেষ্টা করছে তাকে দাবিয়ে রাখার। কিছুক্ষণ প্রানপণ চেষ্টার পর উঠে দাঁড়াল সালাম। এবার তার আক্রমন করার পালা। ছেলে দুটোও সেটা বুঝতে পেরেছে। এরমধ্যে ডানদিকের জন কিছু একটা ইশারা করল সামনের দিকে তাকিয়ে। সালাম দেখতে পেল আরো তিন-চারটা ছেলে চায়ের স্টলের ভিড় থেকে বেরিয়ে এলো। পাঁচ-ছয়জনকে একা সামলানো কঠিন। কিন্তু সালাম ভীত নয়। ওরা তাকে মারবে না নিশ্চয়ই, ওদের সেই ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

মোট পাঁচজন ওরা। ওদেরকে যে বৃদ্ধ পাঠিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুই দিক থেকে দুইজন চেপে ধরে আছে। সামনে থেকেও একজন এসে সালামকে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে। চতুর্থ আর পঞ্চম জনকে দেখা গেল হাত দিয়ে কোথাও ইশারা করছে। ছোট একটা সাদা মাইক্রোবাস এগিয়ে আসছে। ওদের প্ল্যানটা পরিস্কার সালামের কাছে। তাকে এই মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যাবে। একবার ওটাতে উঠাতে পারলে আর কোন সমস্যা নেই।

এতোগুলো লোকজন আশপাশে, তবে সবাই এতো ব্যস্ত নিজ নিজ গল্পে, যে এদিকে তাকানোর কারো সময় যেন নেই। কারো কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না, তাই নিজেই চেষ্টা শুরু করল সালাম। দাঁতে দাঁতে চেপে শরীরের সব শক্তি দিয়ে ডান দিকের হাতটা ছোটাল কোনমতে। ধাক্কা দিয়ে ডানদিকের ছেলেটাকে ফেলে দিল। এক হাত মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে সামনের দিকের ছেলেটার মুখ বরারর একটা ঘুষি চালাল। ঘুষি খেয়েও তাকে ছাড়ল না ছেলেটা। বরং আরো জোরে আকড়ে ধরল। পরপর কয়েকটা ঘুষি দিয়ে ওর মুখ রক্তাক্ত করে ফেললেও লাভ হলো না। বরং এটা দেখে ওপাশে দাঁড়ানো চতুর্থ ছেলেটা এগিয়ে এলো। এছাড়া রাস্তায় পড়ে যাওয়া ছেলেটাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

শরীরের সব শক্তিতে গা ঝাড়া দিল সালাম। এতে বা'দিকের ছেলেটা ভারসাম্য হারাল আর বা হাতটা মুক্ত হলো। এবার দুই হাত দিয়ে সামনের ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কিন্তু তাতেও লাভ হলো না। চতুর্থ আর পঞ্চম ছেলেটা এসে এরমধ্যেই তাকে ধরে ফেলেছে। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে একটুও সরতে পারল না সালাম।

মাইক্রোবাসটা জাদুঘরের গেটের কাছে চলে এসেছে। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে টান দিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে যাতে দ্রুত তাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে যেতে পারে ছেলেগুলো। তবে সহজেই সেই সুযোগ পাওয়া গেল না। অতি বৃদ্ধ একজন মানুষ কোত্থেকে এগিয়ে এলো সালামের দিকে।

'ঘটনা কী? চার-পাঁচ জনে মিলে ওকে মারছো কেন?' বৃদ্ধ বলল।

'আপনে সরেন,' ছেলেদের একজন বলল।

'সমস্যা থাকলে পুলিশ ডাকো, কিন্তু এইটা তো ঠিক না,' বৃদ্ধ প্রতিবাদ

করল।

'আপনে পুলিশ ডাকেন, যান।'

'আমি পুলিশ ডাকতে যাই আর তোমরা ওরে ঐ গাড়িতে তুইলা ফেলাও, তাই না?'

'আপনের সমস্যা কী? আপনে সরেন, নাইলে এই বুড়া বয়সে মাইর খাইতে হইবো।'

'তোমার মতো পিচ্চি পোলা আমার গায়ে হাত তুলবা?' বৃদ্ধ তেড়ে এসে বলল।

'দরকার পরলে তাই করমু।'

সালাম অবাক হয়ে দেখল বৃদ্ধ এই হুমকির পরোয়া না করে এগিয়ে এলো সামনে। ছেলেদের একজন আটকাতে যাচ্ছিল। ওকে পায়ে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিল বৃদ্ধ। আরেকজন একটু সাবধানে এগুলো। তবে তাকেও পরপর তিনটা ঘুষি মারল বৃদ্ধ, শেষ ঘুষিটা পড়ার সাথে সাথে ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেল। এবার বাকি আছে তিনজন। ওরা সালামকে ধরে আছে। সালামকে ছেড়ে এই বৃদ্ধের দিকে এগুবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

ওরা এগুবে না সালামকে নিয়ে গাড়িতে উঠার চেষ্টা করবে এই সিদ্ধান্ত নিতে নিতে বৃদ্ধ একদম কাছাকাছি চলে এসেছে। সালামের সামনে থাকা ছেলেটাকে একের পর এক লাথি বসাল বৃদ্ধ। সালামকে ছেড়ে বৃদ্ধের লাথি থেকে নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ছেলেটা। এই সুযোগে একটু মুক্ত হলো সালাম। ডানদিকের ছেলেটাকে ল্যাঙ মেরে ফেলল নীচে। বা'দিকের ছেলেটা হাত ছেড়ে দিয়েছে। বুঝতে পারছে সালাম কিংবা ঐ বৃদ্ধ, কারো সাথেই সে একা পারবে না। দৌড়ে গিয়ে মাইক্রোবাসে উঠে পড়ল। ওর দেখাদেখি বাকিরাও লড়াই বাদ দিয়ে মাইক্রোবাসে উঠে পড়ল। দ্রুত দরজা লাগিয়ে দিল। সালাম ওদের দিকে তেড়ে যাওয়ার আগেই হর্ণ দিতে দিতে দ্রুত জায়গা ছাড়ল মাইক্রোবাসটা।

সালাম বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গেল।

'আপনে কে? এই বয়সেও এতো শক্তি ক্যামনে পাইলেন?'

হাসল বৃদ্ধ। 'নেশা ভাং না করলে আর নিয়ম মতো ব্যায়াম করলে শরীরে শক্তি থাকে, বুঝলা?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম।'

'এরা তোমারে ধরতে চাইছিল কেন?'

'জানি না।'

'অবশ্যই জানো। না জানার কথা না।'

'জানি কিন্তু বলতে চাচ্ছি না।'

বৃদ্ধ আবার হাসল। হাসলে ওর সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ে। বেশ লাগে দেখতে।

'আপনে আমারে বাচাঁইছেন আজকে। বলেন, আপনের জন্য কী করতে পারি?'

'কিছুই করা লাগবে না,' বৃদ্ধ প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'তুমি আমার সাথে চলো। সামনে তোমার অনেক বিপদ।'

'কিসের বিপদ? আমার বিপদ আপনে ক্যামনে জানেন?'

'আমি জানি।'

'আপনের আসল পরিচয় বলেন।'

'আমি তোমার একজন শুভাকাংখী।'

'এতো কমে পরিচয় হয় না। আপনে আসল কথা বলেন।'

'চা খাইবা?'

'এই চা ওয়ালা অনেক ঢিলা,' সালাম বলল। চা'ওয়ালাকে অনেক আগেই চা-এর অর্ডার দেয়া হয়েছিল। সেই চা-এর এখন পর্যন্ত খবর নেই, নতুন চা-এর অর্ডার দেয়া অর্থহীন।

'সামনে চলেন।'

সালাম হাঁটতে শুরু করল। টিএসসি এলাকায় ভালো চা বানায়। ওখানে যাওয়া যায়। কিছু না বলে বৃদ্ধ লোকটাও তার সাথে হাঁটতে শুরু করেছে। লোকটাকে বেশ অদ্ভুত লাগছে। এরকম একজন অচেনা মানুষ আচমকা সাহায্য করল, ব্যাপারটা সন্দেহজনক নয় কী! ওর সাথে বিস্তারিত কিছু আলোচনা করার আগে ওর সম্পর্কে সব জানা দরকার। এর আগেও ধোঁকা খেয়েছে। এবার সাবধানে এগুনোর পালা।

টিএসসিতে আজ সন্ধ্যার পর লোকজন কম। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে পুলিশ এই এলাকায় ছাত্রদের জড়ো হতে

দিচ্ছে না। চায়ের দোকানও তেমন নেই। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে শামসুন্নাহার হলের একদম শেষ মাথায় একজন ভ্রামমাণ চা বিক্রেতাকে পাওয়া গেল। লোকটা ফ্লাস্কে করে চা বিক্রি করে। দুইজনের জন্য দুই কাপ চা অর্ডার দিয়ে দাঁড়াল সালাম। বৃদ্ধও দাঁড়িয়েছে। এখানে বেশ অন্ধকার। লোকজন হৈচৈ কম।

'আপনের পরিচয় বলেন,' সালাম বলল, 'আমার মনে হয় যারা আমার উপরে হামলা করছিল, আপনে ঐ এক দলের লোক।'

'এটা কেন মনে হলো?'

'পাঁচজন ছেলে আপনাকে সামলাতে পারল না, এটা বিশ্বাস করা যায় না। ওরা ভালো অভিনয় করেছে।'

'তারমানে বলতে চাইছো, আমি যে ওদের মেরেছি এতে ওদের কিছু হয়নি।'

'হ্যাঁ।'

এটুকু বলার সাথে সাথে আচমকা এক আঘাতে রাস্তার ওপর পড়ে গেল সালাম। বিদ্যুৎ গতিতে তার গালে যে চড় বসিয়েছে বৃদ্ধ এটা বুঝতেই বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। কোনমতে উঠে দাঁড়াল। চা'ওয়ালা একপাশে দাঁড়িয়েছিল। বিস্ময়ে লোকটার চোখ কপালে উঠে গেছে।

'এখন বিশ্বাস হয়েছে?'

উত্তর দিলো না সালাম। তার মাথা এখনো ঘুরছে। ষাট-সত্তুরের ওপর বয়সের একজন মানুষের হাতে এতো জোর থাকতে পারে চড় না খেলে হয়তো জানা যেতো না।

'আপনে কে এবার বলেন, আপনে সাধারন কেউ না,' সালাম বলল বেশ কিছুক্ষণ পর। চা'ওয়ালা এরমধ্যে ওর ফ্লাস্ক নিয়ে চলে গেছে। এখন এখানে কেউ নেই।

'আমার নাম জেনে কি করবে,' বৃদ্ধ বলল, 'শুধু বললাম আমি তোমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। এই পাঁচজন এখন চলে গেছে, কিন্তু এরপর আসবে দশজন, তারপর পনেরোজন। তুমি এই পাঁচ জনকেই সামলাতে পারোনি।'

'আমার কারো সাহায্য লাগবে না।'

'সাহায্য লাগবে না বললে তো হবে না,' বৃদ্ধ বলল, 'সাহায্য তোমাকে

নিতে হবে।'

'জোর করে সাহায্য করবেন?'

'জোর করার প্রয়োজন হবে কেন? তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, নিজের ভালোটা বুঝবে না?'

'আপনার পরিচয়ই জানি না, আপনার সাহায্য কী করে নেই,' সালাম বলল, 'আরেকটা জিনিস বুঝলাম না, এরা সব আমার পেছনে লাগছে কেন?'

'নিশ্চয়ই কোন কারন আছে।'

'কারনটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?'

'জানি।'

'তাহলে আমাকে কারন বলেন। আমি নিজেই জানি না কেন এসব হচ্ছে।'

'আমি বলবো, তবে একটা কথা আছে।'

'কি কথা?'

'আমার কথায় বিশ্বাস করতে হবে।'

'জোর করে বিশ্বাস করাবেন?'

'বুদ্ধিমান হলে এমনি বিশ্বাস করবে।'

'তাহলে শুরু করেন।'

বৃদ্ধ চারপাশে তাকাল। বড় করে নিশ্বাস নিলো। তারপর বলতে শুরু করলো, 'পৃথিবীর শুরু থেকেই জাদু ছিল, আছে এবং থাকবে। সব ধর্মে কমবেশি জাদুর উল্লেখ আছে। সেসব জাদু দেব-দেবী কেন্দ্রিক, কিংবা তন্ত্র-মন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে বানানো জাদু। আরেক ধরণের জাদু আছে, যেখানে মানুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, রীতিমতো প্রতারণা করে জাদু দেখানো হয়। কিন্তু এছাড়াও সত্যিকারের জাদু যে আছে, তার প্রমাণ মানুষ সেই সৃষ্টির শুরু থেকেই পেয়ে আসছে। যেমন আদিকালে মানুষ যখন শিকার করতে যেতো, কিংবা জমিতে ফসল ফলাতে যেতো, তখন তাদের গোত্র থেকে নির্বাচিত একজন, যে জাদুবিদ্যায় পারদর্শি তার কাছে থেকে পরামর্শ নিতো। তখন ধর্ম ছিল না, তন্ত্র-মন্ত্র ছিল না, কিংবা মানুষের চোখকে ফাঁকি দেয়ার মতো কৌশলও বের হয়নি। সেইসব সত্যিকারের জাদুকরেরা তাদের

গোত্রের ভালো-মন্দ দেখতো, তাদের পরামর্শ দিতো। বন্যা, খরা কিংবা হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আগেভাগেই সতর্ক করতো। কিন্তু মানুষ সভ্যতায় যতো অগ্রসর হতে লাগল, বিজ্ঞানের ওপর যতো নির্ভরশীল হতে লাগল, তখন থেকেই সত্যিকারের জাদুর ওপর তাদের আস্থা কমে আসতে লাগল।'

'সত্যিকারের জাদুর কিছু প্রমাণ আপনি দিতে পারবেন?'

'পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের একটা হচ্ছে মিশরের পিরামিড। এই পিরামিড কিভাবে তৈরি হয়েছিল তার ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। কিংবা মমি তৈরি করার যে প্রাচীন কৌশল, সে সম্পর্কেও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি এখন পর্যন্ত। সেই কয়েক হাজার বছর আগে মানুষ এসব কৌশল কিভাবে জানতো তা নিয়ে এখন পর্যন্ত দারুন এক বিস্ময় কাজ করে এখনো।'

'তারমানে বলতে চাইছেন পিরামিড তৈরিতে জাদুকরদের হাত ছিল?'

'হ্যাঁ। হাত ছিল। মিশরিয় প্রাকৃতিক জাদুকররা ছিল সবচেয়ে সেরা। তাদের তদারকিতেই তৈরি হয়েছিল পিরামিড। পিরামিড শুধু মিশরেই তৈরি হয়নি, মেক্সিকো, চিলি, চীন এসব দেশেই পিরামিডের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এবং সবগুলোর সময়কাল কাছাকাছি।'

'আর কি আছে এমন?'

'আরো অনেক আর্টিফ্যাক্ট এখনও বের হচ্ছে বিভিন্ন আর্কিওলজিক্যাল সাইট থেকে। এরমধ্যে বিখ্যাত একটা হচ্ছে বাগদাদের ব্যাটারী। এছাড়া আরো অনেক কিছু আছে। তোমাকে বিস্তারিত বলতে গেলে সারা রাত পার হয়ে যাবে।'

'আমি শুনতে চাই।'

'হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সম্পর্কে জানো?'

'হ্যাঁ। পড়েছি কিছু পাঠ্যবইয়ে। বিস্তারিত জানি না।'

'এই সভ্যতা গড়ে উঠার পেছনেও ছিল জাদুকররা। অথচ একদিন হঠাৎ করেই সিন্ধু অববাহিকার এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।'

'ধ্বংস হলো কেন?'

'কোন এক জাদুকরের অতি লোভের কারনে।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ। সে পুরো সভ্যতার মানুষকে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে চেয়েছিল। কিন্তু অন্য জাদুকরদের সাথে লড়াইয়ে সে পেরে উঠেনি। কিন্তু দুই পক্ষের লড়াইয়ে এমন একটা প্রাকৃতিক দূর্যোগ হয় যে মুহূর্তেই পুরো একটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।'

'এসব জাদুকর যদি সত্যিই থেকে থাকতো, তাহলে পৃথিবীর কোন বইয়ে তাদের উল্লেখ নেই কেন? ইতিহাসের পাতায় এদের কোন বর্ণনা নেই কেন?' সালাম বলল।

'কয়েক হাজার বছর থেকেই জাদুকররা টের পেল, মানুষের মধ্যে থেকেও তারা আলাদা। তাদের যে আলাদা ক্ষমতা সেটা সাধারন মানুষ ভালোভাবে গ্রহন করবে না। তাই শুরু থেকেই নিজেদের আলাদা করতে শুরু করে। বড় বড় গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শুরুতে তারা মানুষদেরকে বিভিন্নভাবে পথ দেখাতে চাইলেও, পরবর্তীতে তারা সেখান থেকেও সরে আসে। বুঝতে পারে, মানুষ সত্যি সত্যি তাদের ক্ষমতা বুঝতে পারলে সেটার অপব্যবহার করতে চাইবে। ফলে যুদ্ধ শুধু মানুষে মানুষে হবে না, সেখানে এক জাদুকর আরেক জাদুকরের বিপক্ষে জড়িয়ে পড়বে।'

'আচ্ছা। তাহলে জাদুকররা কিভাবে বুঝতে পারে সে জাদুকর।'

'সবাই নিজের ক্ষমতা বুঝতে পারে না। এক জীবন নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে পার হয়ে যায় অনেক মানুষের। আবার অনেকে খুব অল্পেই নিজেকে চিনতে পারে। তখনই আমাদের কাজ হয়ে দাঁড়ায়, তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার।'

'সঠিক পথটা কি?'

'সমাজ আর সভ্যতার উপকার করা। কিন্তু সেটা করতে হবে নিজেকে প্রকাশ না করেই।'

'প্রকাশ না করে করলে কি লাভ?'

'জাদুকররা সংখ্যায় অনেক কম। প্রকাশ করলে মানুষ আর জাদুকরদের মধ্যে প্রকাশ্যে দ্বন্ধ তৈরি হবে। এছাড়া আগে যেটা বললাম, জাদুকরদের নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু হতে পারে। কে কারো চেয়ে বেশি ক্ষমতাধর এটা দেখানোর প্রতিযোগিতা শুরু হতে পারে।'

'এসব ব্যাপারে আমার কী ভূমিকা? আমার বয়স মাত্র পনেরো।'

'ধীরে ধীরে সব বলছি।'

বৃদ্ধ হাঁটতে শুরু করল। সালামও পাশেপাশে হাঁটছে। সুন্দর বাতাস হচ্ছে। শামসুন্নাহার হলের সামনে এসে দাঁড়াল দুজন। এখান থেকে সামনের রাস্তাটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। দ্রুত গতিতে সাদা একটা মাইক্রোবাস চলে গেল। নাম্বার প্লেটটা না দেখলেও সালাম চিনতে পারল গাড়িটা। এটা সেই মাইক্রোবাস, একটু আগেই শাহবাগ মোড়ে ছিল। বৃদ্ধকে একটা গাছের আড়ালে টান দিয়ে নিয়ে গেল সে।

'ওরা তো এখনো এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে মনে হয়,' সালাম বলল।

'ওরা হাল ছাড়বে না। ওরা জানে তুমি এখনো এই এলাকায় আছো। এখন আরো লোক পাঠাবে।'

'তাহলে আমরা কী করবো?'

'আমরা?'

'হ্যাঁ' ইতস্তত করে বলল সালাম, 'আপনি যেই হোন, আপনাকে খুব খারাপ মনে হচ্ছে না আমার কাছে।'

'তাহলে আমার ঠিকানায় চলো, বাকিটুকু সেখানেই শুনবে।'

বৃদ্ধ আর সালাম বেরিয়ে গেল গাছটার পেছন থেকে। হাতের ইশারায় একটা রিক্সা ডাকল বৃদ্ধ। দুজনে রিক্সায় উঠে পড়ল।

অধ্যায় ৩৩

মুরশেদ মিয়া এই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন একবার। সেটাও অনেকদিন আগে। বাসাটা খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। রাত নয়টার মতো বাজে। রাস্তায় লোকজনের বেশ আনাগোনা। এরমধ্যে একটা বাড়ির সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। বয়স্ক একজন লোককে বাসার গেট দিয়ে ঢুকতে দেখলেন। লোকটা চলে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক পর তিনি গেট দিয়ে ঢুকলেন। তিনতলায় ডানদিকে ফ্ল্যাট। দরজায় তালা ঝুলছে। হাতের লাঠিটা দিয়ে তালার মাথায় ছোঁয়ালেন আলতো করে। তালাটা খুলে গেল। তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

ডানদিকের শোবার ঘরে বাতি জ্বলছে। এই ঘরে জমির থাকতো। ঘরটায় ঢুকে কিছুটা অবাক হলেন। এর আগে যখন এসেছিলেন, খুব অগোছালো ছিল ঘরটা। জমিরের ওপর বিরক্ত হলেও কিছু বলেননি। কিছু কিছু মানুষ অগোছালো থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ঘরটা বেশ গোছানো। সবকিছু জায়গামতো আছে। কাপড়-চোপড়, বইপত্র সব কিছু। মেঝেতে পাতা বিছানাটাও সুন্দর করে গোটানো। একপাশে মশারিটাও খুলে ভাজ করে রাখা।

এই ঘরে তার কোন কাজ নেই। তিনি ধীর পায়ে মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে শংকরের ঘরে ঢুকলেন। বাতি জ্বালালেন। এই ঘরটাও গোছানো। শংকর জমিরের চেয়েও অগোছালো ছিল। এজন্য তিনি ওকে প্রচুর বকেছেন একসময়। তাতেও কাজ হয়নি। শেষবার যখন এসেছিলেন, তখনও অগোছালো ছিল। বিছানার ওপর বসলেন। ঘরটা দেখে নিচ্ছেন। শংকর এখানেই ছিল শেষ ক'টা দিন। ওর গায়ের গন্ধ এখনো বাতাসে ঘুরছে। সেই সাথে অচেনা একটা গন্ধও টের পাচ্ছেন। এটা কার গায়ের গন্ধ? জমিরের? মনে হয় না। জমিরের গা থেকে বোঁটকা গন্ধ আসতো।

খুটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরটা দেখছেন তিনি। ছোটখাট কিছু জিনিস চোখে পড়ছে। যেমন বিছানার চাদরের কোণাগুলো কিছুটা তোলা, বালিশের একপাশ কিছুটা উঁচু হয়ে আছে। ছোটখাট এসব জিনিস তার নজর এড়ালো

না। বালিশের নীচে, বিছানার তোশকের নীচে কিছু একটা খোঁজা হয়েছে। কে খুঁজেছে?

ঘরের এক কোনায় ভারি আলমারিটা রাখা। এই আলমারির জন্যই আজকে এতোদূর আসা। এই আলমারি আলাদাভাবে অর্ডার করে বানানো হয়েছে। শক্ত, মজবুত আর ভারি এই আলমারিটাই শংকরের একমাত্র সম্পদ, যা সে রেখে গেছে। এই আলমারির চাবি তার কাছে নেই। কিন্তু এটা কিভাবে খুলতে হবে তিনি জানেন।

হাতের লাঠিটা আলমারির হাতলের দিকে ধরে আলতো করে চাপ দিলেন। খুলে গেল সাথে সাথে।

আলমারি ভর্তি অনেক বই। থরে থরে সাজানো। এসব বইয়ের বেশিরভাগই দুষ্প্রাপ্য। তবে তিনি শুধু বইয়ের খোঁজে আসেননি। শংকরের হাতে এমন একটা জিনিস দিয়েছিলেন, যেটা বাইরের পৃথিবীর কারো হাতে পড়া নিষেধ। সেই জিনিস নিজের কাছে রাখার ঝুঁকিও তিনি নেননি। মনে হয়েছিল, যে কোন সময় তিনি মারা পড়তে পারেন। তখন এই জিনিস হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তারচেয়ে এটা শংকরের হাতে থাকুক, ছেলেটার বয়স তার চেয়ে অনেক কম আর অকারণ কৌতুহলও নেই। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার! শংকরই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে তার আগে আর কী নৃশংসভাবে। কুদ্দুসকে তিনি কোনদিনই ক্ষমা করবেন না।

আলমারির নীচের দিকে অনেকগুলো ড্রয়ার। ড্রয়ারগুলোতে কোন তালা নেই। একের পর এক ড্রয়ার টেনে দেখলেন। অল্প কিছু টাকা পয়সা আছে, দীর্ঘদিন ধরে জমিয়েছিল শংকর। ব্যাংকের ওপর ভরসা ছিল না, আলমারির এই ড্রয়ারগুলোই ছিল ওর কাছে নিরাপদ ব্যবস্থা।

সবগুলো ড্রয়ার খুলেও কিছু পাওয়া গেল না। বইগুলো উপরের তাক থেকে খুব সাবধানে নামিয়ে রাখতে লাগলেন বিছানায়। বইয়ের স্তূপ জমা হতে লাগল বিছানার ওপর। একদম শেষ তাকের পেছনের দিকের বইগুলো সরানোর পর জিনিসটা চোখে পড়ল তার।

ছোট একটা বাক্স। কালো কুচকুচে বাক্সটা ধীরে ধীরে বের করে আনলেন। দুইহাতে খুব সাবধানে ধরে সেটা বিছানার ওপর রাখলেন। এবার বইগুলো আবার জায়গামতো তুলে রাখলেন।

বাক্সটা হাতে নিয়ে দেখছেন তিনি। অনেকদিন পর বাক্সটা হাতে পেয়ে

স্বস্তি লাগছিল। বাক্সটার গায়ে নানারকম চিহ্ন আঁকা। এই চিহ্নগুলোর একটাই মানে, মৃত্যু। সাপ, নেকড়ে, বাজ পাখি এই ধরণের চিহ্নগুলো পুরো বাক্সের গায়ে ছড়িয়ে আছে। ঘরের ষাট ওয়াটের বাতির আলোতেও কালো বাক্সটা চকচক করছে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে আছেন মুরশেদ মিয়া। মনে হচ্ছে তিনি কোন ঘোরের জগতে চলে গেছেন।

***

তিব্বত। যে বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে দলটা সেটার বয়স কতো হবে ধারনা নেই কারো। জাহাঙ্গীর জাদুকর তাদেরকে এখানে রেখে চলে গেছে গতকাল। গত পাঁচদিন ধরে মন্দিরের ভেতরের একটা কক্ষে ঠাই হয়েছে সাতজনের। সারাদিন আয়তাকার ঘরটার মধ্যেই চলাফেরা করতে হয়। বিকেলের দিকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি মেলে। সেটাও খুব অল্প সময়ের জন্য। বিদেশি নাগরিকদের জন্য তিব্বত নিষিদ্ধ একটা জায়গা। সেখানে একজনের বদলে সাত-সাতজন বিদেশিকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে জানতে পারলে মহা বিপদ। মুরশেদ মিয়া আর তার সঙ্গিরাও তাই খুব সাবধান। তবে ঝামেলা হচ্ছে ভাষা নিয়ে। তিব্বতি ভাষা নিয়ে ন্যুনতম ধারণা নেই কারো। জাহাঙ্গীর জাদুকর যতোদিন ছিলেন, তিনি ওদের সাথে মোটামুটি যোগাযোগ করার মতো কথা বলতে পারতেন। তিনি গতকাল চলে গেলেন। বলে গেলেন ফরিদকে সাহায্য করতে যাচ্ছেন। মুরশেদ, গওহর, রাম আইয়ারও সাথে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীর কোনমতেই রাজি হলেন না। বলে গেলেন, খুব শিগগিরি ফিরবেন।

আর যদি না ফেরেন, ঠিক পনেরোদিন পর এই মন্দির ছেড়ে সবাই যেন নেপালের দিকে চলে যায়। মন্দিরের পুরোহিতরাই তখন সাহায্য করবে নেপাল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। নেপাল থেকে যে যার ঠিকানায় খুব সহজেই ফিরতে পারবে।

জাহাঙ্গীর জাদুকর মাত্র একদিন হলো গিয়েছেন। আরো চৌদ্দ দিন পর এখান থেকে যাওয়ার সুযোগ মিলবে। এ ক'টা দিন কিভাবে কাটবে তা নিয়ে দারুন চিন্তিত সবাই। বিশেষ করে শ্যামশংকর। সে সারাক্ষণ ছটফট করে বাইরে যাওয়ার জন্য। ঘরের মধ্যে নাকি তার দমবন্ধ হয়ে আসে।

ওকে বোঝানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে গওহরকে। অন্যদিকে সামসুদ্দিন আছে বেশ আরামে। সে সারাদিন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছে। মুরশেদ মিয়া অবশ্য সময়টা কাজে লাগাচ্ছে। সে এখানকার এক সেবকের কাছ থেকে তিব্বতি ভাষা শেখার চেষ্টা করছে। একদিনের চেষ্টায় অল্প কিছু শব্দ শিখতে পেরেছে, যেমন পানি হচ্ছে কু, ভাত হচ্ছে দ্রে, হ্যালো হচ্ছে তাসি দেলেক, ধন্যবাদ হচ্ছে থুক যে চে এসব।

দ্বিতীয় আর তৃতীয় দিনটাও ভালো কাটল। চতুর্থ দিনের শুরুতেই মুরশেদ মিয়ার মনে হলো আজকে কিছু একটা ঘটবে। সেই কিছুটা কী কোন ধারণা নেই। মাঝে মাঝে তার এরকম হয়। কোন কিছু ঘটার আগেই সে কিছুটা অনুমান করতে পারে। অনুমানটা হয় একদম ভাসা ভাসা। আজকে যেমন মনে হচ্ছে খারাপ কিছু ঘটবে। যদিও দিন হিসেবে আজকের দিনটা অন্যান্য দিনের তুলনায় কম ঠান্ডা। মন্দিরের সেবক একটু আগে যে খাবার দিয়ে গেছে, সেগুলোও খেতে খুব একটা বিস্বাদ লাগছিল না। অন্যান্য দিনের তুলনায় শ্যামশংকরকে আজকে একটু স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। কিন্তু তবু মনের মধ্যে কিসের একটা কু ডাক দিতে থাকল।

বিকেল বেলায় বোঝা গেল খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। একজন অল্প বয়সী সেবক ঘরে ঢুকল। ছেলেটার চোখমুখ লাল হয়ে আছে। ওর কথা কিছু বুঝতে পারলেও এটুকু বুঝতে পারলো সবাইকে লুকাতে বলা হচ্ছে। ছোট এই ঘরটার মধ্যে কোথায় লুকাবে সাতজন মানুষ! ছেলেটা কথাগুলো বলেই বেরিয়ে গেল।

বাইরে খুব হৈচৈ শোনা যাচ্ছিল। দরজা খুলে বাইরে বেরুল মুরশেদ মিয়া, সাথে আজাদ মালিক। সরু করিডোর ধরে এগিয়ে গেল সামনে। এখানে একপাশে ছোট জানালা আছে। জানালাটা যদিও বন্ধ, কিন্তু একপাশে ছোট একটা ছিদ্র দিয়ে বাইরেটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।

রাইফেল হাতে মিলিটারি পোশাক পরা বেশ কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে। ওদের সামনে দুই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরের প্রধান, সাথে অন্যান্য পুরোহিত আর সেবকরা। মিলিটারি পোশাক পরা লোকগুলো চায়নিজ। ওদের লিডার লোকটা অনর্গল চেঁচাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে কোনকারনে ক্ষেপে আছে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, বয়স্ক মানুষ। তিনি নরম ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না।

পাশ থেকে রাগে ফুঁসছে আজাদ। ওকে ইশারায় শান্ত হতে বলল মুরশেদ মিয়া। বুঝতে চাচ্ছে আসলে কী চায় চায়নিজ দলটা। সংখ্যায় ওরা পনেরোজন হবে। ছোটখাট এই দলটাকে সামলাতে সমস্যা হবে না। কিন্তু আগ বাড়িয়ে ওদের সাথে লাগতে যাওয়ার কোন মানে নেই।

চায়নিজদের দলনেতা এগিয়ে এসে প্রধান পুরোহিতের কাঁধে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করলো। লোকটা আঘাত সহ্য করতে না পেরে পড়ে গেল নীচে। অন্যান্য পুরোহিতরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে চাইলে ওদেরকেও রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিল বাকি সৈনিকরা। ওরা এখন ভেতরে ঢুকবে।

মুরশেদ মিয়া দ্রুত ইশারা করল আজাদকে, যেন ঘরে ফিরে সবাইকে জানায়। চোখের পলক ফেলার আগেই দেখল আজাদ নেই, ওর এই ক্ষমতাটার কথা গত ক'দিনে ভুলেই গিয়েছিল। মুরশেদ মিয়া নিজেও দৌড়াল ঘরের দিকে। চায়নিজরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ওরা নিশ্চয়ই পুরো মন্দিরটা ঘুরে দেখবে, ধারণা করল।

ঘরে ঢুকেই দরজা ভেতর থেকে আটকাল মুরশেদ মিয়া। গওহর জামাল এগিয়ে এলো সামনে।

'ভয়ের কিছু নেই,' বলল সে, 'ওরা আমাদের কিছু করতে পারবে না।'

'আমি নিজেদের নিয়ে ভয় পাচ্ছি না,' মুরশেদ মিয়া বলল, 'ভয় পাচ্ছি নিরীহ ঐ পুরোহিতদের নিয়ে।'

'ওদের কোন ক্ষতি হতে দেবো না,' গওহর বলল, 'তুমি দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়াও।'

গওহরের উদ্দেশ্য বুঝতে সমস্যা হলো না। একপাশে সরে দাঁড়াল মুরশেদ মিয়া। রাম আইয়ার, আজাদ, সামসুদ্দিন ঘরের একপাশে দাঁড়াল, অন্যপাশে শ্যামশংকর, মুরশেদ আর বিজয় পান্ডে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গওহর জামাল। যেকোন সময় চায়নিজ দলটা আসবে এই ঘরের সামনে। সবাই প্রস্তুত।

বাইরে বুটের ঠকঠক শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঘরের সামনে চলে আসছে লোকগুলো। যেকোন সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়বে। গওহর প্রস্তুত। দরজার ওপাশ থেকে কেউ রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল। সাথে সাথে গওহর একপা পেছনে সরে এসে আগুন ছুড়ল মুখ দিয়ে।

কাঠের দরজাটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। ওপাশ থেকে চেঁচামেচি শোনা গেল। সৈন্যদের কেউ কেউ গুলি ছুঁড়ছে দরজা লক্ষ্য করে। মুরশেদ মিয়া দেখল রাম আইয়ার আর বিজয় পান্ডে ছুটে যেতে চাচ্ছিল আক্রমনকারিদের দিকে। ওদের কোনমতে থামিয়েছে সামসুদ্দিন। একটা খাটের পেছনে লুকিয়েছে ওরা। রাইফেল হাতে জ্বলন্ত দরজাটা ফেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে কয়েকজন সৈন্য, রাইফেল উঁচিয়ে রেখেছে। তবে ভেতরে তারা কিছুই দেখতে পারছে না। এমনকি গওহরের পাশ দিয়ে চলে গেল একজন। গওহর চোখ বুজে রয়েছে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সৈন্যটি তাকে দেখতেই পায়নি।

এই বিভ্রান্তিটা তৈরি করেছে মুরশেদ মিয়া। নিজের এই ক্ষমতা সম্পর্কে তার নিজেরই খুব পরিস্কার কোন ধারনা ছিল না। হঠাৎ করেই মনে হলো, এই নির্বোধগুলোকে বিভ্রান্ত করতে পারবে সে। এই মুহূর্তে ওরা ফাঁকা একটা ঘর ছাড়া আর কিছুই দেখছে না। পুরো ঘর তন্নতন্ন করে ফেললেও ওরা কাউকে পাবে না। সামসুদ্দিন হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ছেলেটা বুঝে গেছে এটা কার কাজ।

সৈন্যগুলো সহজে গেল না। ওরা সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। একটা দরজায় এমনি এমনি আগুন লাগতে পারে না, এই সাধারন বোধটা ওদের মাঝে আছে। তবে আরো অনেকক্ষণ খুঁজেও ওরা কিছু পেল না। বেশ বিরক্ত হয়ে দলটা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দীর্ঘক্ষণ ধরে একই মাত্রায় মনোযোগ ধরে রাখতে সমস্যা হচ্ছিল মুরশেদ মিয়ার। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত একইভাবে মনোযোগ ধরে রইল। বাইরে যখন ওদের জীপগুলোর চলে যাওয়ার শব্দ হলো, তখন নিশ্বাস ছাড়ল সে।

সবাই যে যার লুকানো জায়গা থেকে বের হয়ে এসে জড়িয়ে ধরল মুরশেদ মিয়াকে। বাইরে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতসহ অন্যান্য দাঁড়িয়েছিল। ওরাও ভেতরে ঢুকল।

'তুমি মিয়া এইটা কী দেখাইলা!' সামসুদ্দিন বলল।

'আমি নিজেও জানি না, কিভাবে হলো,' মুরশেদ মিয়া বলল।

'এজন্য ফরিদ বলছিল তুমি বাকি সবার চেয়ে আলাদা,' সামসুদ্দিন বলল।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বৃদ্ধ মানুষ। তিনি এসে মুরশেদ মিয়ার হাত ধরলেন। কিছু বললেন না। তারপর দলবলসহ চলে গেলেন। তবে যাবার আগে মুরশেদ মিয়ার হাতে ছোট করে একটা চাপ দিলেন। এটা একটা সংকেত। কিসের সংকেত সেটা বুঝতে সমস্যা হলো না। বৃদ্ধ পুরোহিত তার সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে চান।

'এখানে আর থাকা যাবে না, ওরা আবার আসবে,' মুরশেদ মিয়া বলল।

'কিন্তু জাহাঙ্গীর বলে গেছেন, আমাদের পনেরোদিন থাকতে হবে এখানে,' শ্যামশংকর বলল।

'উনি বলে গেছেন ঠিক আছে, কিন্তু চায়নিজরা একবার এসেছে, ওদের মনে সন্দেহ ঢুকেছে, ওরা আবার আসবে।'

'তাহলে আমরা কী করবো?'

'আমরা নেপালের দিকে যাবো, সেখান থেকে যে যার এলাকায়।'

'কিন্তু নেপাল পর্যন্ত যাওয়ার আগেই আমরা ধরা পড়ে যাবো,'গওহর বলল।

'সে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ধরা না পড়ি,' মুরশেদ মিয়া বলল, 'আমি ওদের কাছে সাহায্য চাইবো, ওরা নিশ্চয়ই আমাদের পথ চিনিয়ে দেবে।'

'কবে রওনা দিতে চাইছো?'

'ভোরের আলো ফোঁটার আগেই।'

এরপর আর কথা হলো না। এমনিতে সবাই একমত ছিল জাহাঙ্গীরের জন্য অপেক্ষা করার ব্যাপারে, কিন্তু এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়, এটা সবাই বুঝতে পারছে। মানসিকভাবে তাই সবাই তৈরি।

দুপুর বিকেল চুপচাপ কাটল। মন্দিরের লোকজন এসে খাবার দিয়ে গেল। সন্ধ্যার পর সব আরো শান্ত হয়ে এলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মুরশেদ মিয়া। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সাথে কথা বলতে হবে।

প্রধান পুরোহিত সন্ধ্যার পর মন্দিরের একদম শেষ দিকের একটা ঘরে থাকেন। তিনি রাতে কোন খাবার গ্রহন করেন না, প্রয়োজন না হলে কারো সাথে কথাও বলেন না। মুরশেদ মিয়া সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। দরজায় টোকা দেয়ার আগেই দরজাটা খুলে গেল। প্রধান পুরোহিত দরজা খুলে দিয়েছেন, ইশারায় মুরশেদ মিয়াকে ঢুকতে বললেন।

খুব সাদামাটা একটা ঘর। ঘরের এক কোণায় মেঝের ওপর বিছানা পাতা। মাঝখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে। বৃদ্ধ পুরোহিতের দেখাদেখি মেঝেতে পা ভাঁজ করে বসল মুরশেদ মিয়া।

'তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিল,' বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন। চমৎকার হিন্দিতে কথা বলতে পারেন। দিল্লিতে দীর্ঘদিন থাকার ফলে মুরশেদ মিয়াও হিন্দিটা বেশ বলতে পারে।

'কি কথা?'

'তোমাদের জগৎ, আমাদের জগৎ, খালি চোখে দেখা এই পৃথিবী, এই বাস্তবতা, সব আলাদা আলাদা ব্যাপার। আমি তোমাদের জগৎ নিয়ে আগ্রহী নই, কিন্তু একটা বিশেষ ব্যাপারে তোমাকে আমি সাহায্য করতে চাই।'

'কী রকম সাহায্য?'

বৃদ্ধের হাতে কালো কাপড়ে মোড়ান কিছু একটা আছে। সেটা এতোক্ষণ খেয়াল করেনি মুরশেদ মিয়া। কালো কাপড় সরিয়ে ভেতরের জিনিসটা বের করে মেঝেতে রাখলেন বৃদ্ধ।

কাঠের তৈরি একটা বাক্স। কালো কাঠের এই বাক্সের চারপাশে নানারকম নক্সা, চিহ্ন, প্রতীক আঁকা।

'এই বাক্সটা জাহাঙ্গীর রেখে গেছে, যদি সে ফিরতে না পারে, এটা যেন তোমাকে দেয়া হয়,' বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন।

'এটা কী?'

'এটা পাওয়া গিয়েছিল নালন্দায়। সেই বারোশ সালের পর থেকেই তিব্বতে আছে।'

'ভেতরে কী আছে?'

'আমার পূর্বজ এর দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল জাহাঙ্গীরকে। কিন্তু...'

'উনি কি ফিরবেন?'

'সম্ভাবনা কম,' বৃদ্ধ বললেন, 'আমার ধারনা সে আর ফিরবে না। আর তোমরাও কাল ভোরে মন্দির ছেড়ে যাবে। তখন এটা আর কাউকে দেয়া হবে না। আমার কাছেই পড়ে থাকবে।'

'কিন্তু তিনি যদি আসেন?'

'যদি ফিরে আসেন, তাহলে বলবো তোমার কাছে আছে এই জিনিস, সে যেন নিয়ে নেয়,' বৃদ্ধ বললেন।

'এছাড়া এখানে আবার যেকোন সময় ঐ বিদেশিরা হামলা করবে। এই বাক্সটা ওদের হাতে পড়ার চেয়ে তোমাদের হাতে থাকা ভালো।'

'এই বাক্সের ব্যাপারে আপনি যা জানেন বলেন দয়া করে।'

'নালন্দায় হামলার পরও বেশ কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষুক বেঁচে ছিলেন। বারোশ সালের দিকে তারা কিছু পুঁথি নিয়ে পালিয়ে আসেন তিব্বতে। ওদের একজনের সঙ্গে এই বাক্সটা ছিল। এখন তিব্বতে যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার দেখছো, তা কিন্তু নালন্দার সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের অবদান।'

'আচ্ছা।'

'সেই বারোশ সাল থেকেই আমাদের এই মন্দির এই বাক্সটাকে সংরক্ষণ করে আসছে। তবে বেশ কয়েক বছর আগে জাহাঙ্গীর দাবি করে বাক্সটা তার লাগবে, কারন এটা নাকি ওদের দলের কারো তৈরি বাক্স।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। তবে বাক্সটা সে নেয়নি। কারন ঝুঁকি ছিল। বাক্সটার কথা সে ছাড়া আর কেউ জানতো না। শত্রুদের হাতে এই বাক্সটা পড়ুক তা সে চায়নি।'

'কিন্তু আপনি আমাকে সাধছেন কেন?'

'কারন আগেও বলেছি, আমার ধারনা জাহাঙ্গীর ফিরবে না। আর তোমাকে আমার যোগ্য মনে হয়েছে।'

মুরশেদ মিয়া ভাবল কিছুক্ষণ। বৃদ্ধ পুরোহিত যা বলছেন সেটা খুব যুক্তিসঙ্গত কথা।

'কিন্তু এই বাক্সের কাজ কী?'

'সেটা আমি জানি না, জানতে চাইও না,' বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন। 'তবে এই বাক্সের বয়স অনেক। জাহাঙ্গীরের আগে এটা অন্য আরেকজনের জিম্মায় ছিল।'

বাক্সটা মেঝে থেকে হাতে তুলে নিলো মুরশেদ মিয়া। ছোট হলেও জিনিসটা বেশ ভারি। এই বাক্সের ভেতরে কিছু না কিছু আছে। তবে এই বাক্সের ব্যবহার না জেনে এটা খুলতে যাওয়ার চেষ্টা করা ঠিক হবে না।

বৃদ্ধ পুরোহিতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো মুরশেদ মিয়া। রাতে যতোটুকু সম্ভব ঘুমিয়ে নিতে হবে। ভোরের আলো ফোঁটার আগেই বেরুতে হবে। ছোট এই দলটার অলিখিত দলনেতা হয়ে গেছে কিভাবে যেন! ওদের

সবার দায়-দায়িত্বের পাশাপাশি এই বাক্সটার সুরক্ষাও করতে হবে।

ঘরে এসে দেখল একমাত্র সামসুদ্দিন ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাক্সটা ওকে দেখাল একনজর। বৃদ্ধের সাথে কী কী কথা হয়েছে বলল। সামসুদ্দিন খুব সামান্য কারনেই উত্তেজিত হয়, তবে বাক্সটা দেখে সে কেন জানি একটু ভয়ে পেয়েছে বলে মনে হলো মুরশেদ মিয়ার। ঘুম আসছিল খুব। শুয়ে পড়ার কিছ

ছোট দলটাকে নিয়ে ভোরের আলো ফোঁটার সাথে সাথে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তারপর দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে পৌছেছিলেন নেপালে। সেখান থেকে যে যার গন্তব্যে চলে গিয়েছিল। এরপর যোগাযোগ হতো। কিন্তু ফরিদ বা জাহাঙ্গীরের খোঁজ কেউ কখনো পায়নি। এমনকি দিল্লির সেই প্রাসাদও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেখানে ধু ধু প্রান্তর আর গাছপালা ছাড়া কোন মানুষের বসবাসের চিহ্নও চোখে পড়েনি। মনে হয়েছিল, ওখানে কোনকালেই কোন প্রাসাদ ছিল না। ঐ এলাকায় কিছু মানুষের সাথে কথাও বলেছিলেন মুরশেদ মিয়া, পরবর্তীতে। কিন্তু কেউ তাকে বলতে পারেনি ঐখানে কোন প্রাসাদের মতো বাড়ি ছিল কিনা।

মাঝে মাঝে মনে হয় সবই তাদের দেখার ভুল। কয়েকজন মানুষ একসাথে ঘোরের মধ্যে কিছুদিন কাটিয়েছে। হয়তো তারা কোন প্রাসাদের মতো বাড়িতে ছিল না, কিংবা সত্যি সত্যি তারা কোন জাদু শেখেনি। সবই কল্পনা। সম্মিলিত কল্পনা। কে জানে!

বাক্সটা হাতে নিয়ে ঘরে পায়চারি করছিলেন। সামনের ঘরের দরজায় খুট করে শব্দ হলো। মনে হচ্ছে কেউ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। শংকরের ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়েছেন। বাইরে তালা দেয়া নেই। এই বাড়িতে ফেরার কেউ নেই। তাহলে কে এসে দাঁড়িয়েছে? বাড়িওয়ালা? হতে পারে।

দরজাটা হাত দিয়ে ছুঁয়েই বুঝলেন ভুল করে ফেলেছেন। দরজাটা খোলা। তালা খুলে ভেতরে ঢুকেছেন ঠিকই, কিন্তু দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন। এই সুযোগে কেউ একজন দরজার খুলে ঢুকে পড়েছে।

তিনি পেছনে ফিরতেই দেখতে পেলেন লোকটাকে। দেখে একই সাথে অবাক এবং বিরক্ত হলেন।

অধ্যায় ৩৪

দিনের পর দিন হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছেন তিনি। প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটেন। সূর্য ওঠার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ক্রমাগত সেই হাঁটা চলে। তাতে কতোটা পথ পার হওয়া গেল সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি জানেন ঠিক সময়েই পৌঁছাতে পারবেন গন্তব্যে।

মনসুরও হাঁটতে পারে বেশ। কোন অভিযোগ নেই। সন্ধ্যার পর পথের পাশে কোথাও আশ্রয় পেলে ভালো, না হলে গাছতলাতেই কাটিয়ে দেন। ভারতবর্ষ সাধু-সন্ন্যাসী আর পীর-আউলিয়াদের দেশ। এখানে বয়স্ক, সৌম্য চেহারার কাউকে কেউ সহজে ঘাটায় না। গত রাতে যেমন আশ্রয় পেয়েছিলেন এক শিখ পরিবারে। খুব যত্ন করেছে। পুরো ভারতেই এমন। ভোরে ওদের কাছ থেকে চলে আসার সময় ওরা পথে খাবার জন্য রুটি, সবজি দিয়ে দিয়েছে। ঘর থেকে বের হয়ে এখন পর্যন্ত খাবার অভাব টের পাননি।

মনসুর বেশ আনন্দেই আছে। সারাদিন হাঁটছে, কেন হাঁটছে, কোথায় যাচ্ছে এ নিয়ে ওর কোন প্রশ্ন নেই। ওকে নিয়ে তার অনেক আশা ছিল। মনে হয়েছিল, বিশেষ কিছু হবে একসময় এই মনসুর। স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্য ছেলেদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের বলে শুরু থেকেই এক ঘরে হয়ে পড়ে ছেলেটা। এছাড়া পড়াশোনাতে ওর মনোযোগ ছিল না। ওর মনোযোগ ছিল ঘুরে বেড়ানোতে। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার আগে আগে ঠিকই বাড়ি ফিরে আসতো। কতো বকেছেন, লাভ হয়নি।

মনসুরের বাবা-মা তার কাছেই কাজ করতো একসময়। দুজন একই সাথে মরলো। দিল্লির সবচেয়ে ভালো হাসপাতালে রেখে ওদের চিকিৎসা করালেন। কিন্তু কাজ হলো না। মনসুরের বয়স তখন মাত্র দুই। বাবা-মা'কে ঠিক মতো চেনার আগেই পিতৃ-মাতৃহীন হলো ছেলেটা। ওকে বড় করেছেন তিনি, ওর আর কোথাও কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। কিংবা থাকলেও কেউ যোগাযোগ করেনি।

মনসুরকে নিজের কাছে রেখে দেয়ার জন্য তার নিজেরও যথেষ্ট কারন ছিল। প্রথম কারন ছিল তিনি একজন সঙ্গি চেয়েছিলেন। পৃথিবীর যাবতীয় পরিচিত লোকজনের সাথে সম্পর্ক ছেদ করার পর তিনি একা হয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় ছোট এই ছেলেটাই তাকে সঙ্গ দিয়েছিল। দ্বিতীয় কারন হচ্ছে তিনি নিজের উত্তরাধিকার রেখে যেতে চান। এই উত্তরাধিকারে মনসুর কোন ধন-সম্পত্তি পাবে না হয়তো, কিন্তু যে জ্ঞান পাবে সেটা দিয়ে ওর পুরো জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

এখন যে কাজে বের হয়েছেন, এটাই হয়তো তার জীবনের শেষ মিশন। শেষবারের লড়াইয়ে তার হার হয়েছিল। যাদের গুপ্তবিদ্যা শিখিয়েছিলেন তাদের একজনই সর্বনাশ করেছিল। সেই লড়াইয়ে তিনি সব হারিয়েছিলেন। অর্থ-সম্পদ, দৃষ্টিশক্তি, বন্ধু সব। শুধু প্রাণ নিয়ে সেদিন ফিরে আসতে পেরেছিলেন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রান দিয়েছিল জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর শুধু তার বন্ধু ছিল না, ছিল শিক্ষাগুরুও। সেদিন শুধু তাকে বাঁচাতেই ফিরে এসেছিল। কিন্তু নিজে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি। আজ এতোদিন পরও জাহাঙ্গীরের সেই আত্মত্যাগ মনে পড়ে।

যে সাতজনকে বেছে নেয়া হয়েছিল অনেক দেখে-শুনে, তাদের মধ্যেই একজন ছিল শত্রুপক্ষের লোক। তিনি ওকে কোনদিন ক্ষমা করবেন না।

জীবনের শেষ লড়াইয়ে আশা করছেন আবার ঐ বেইমানের সাথে মুখোমুখি হবেন। হয়তো আগের সেই তেজ নেই শরীরে কিংবা আগের চেয়ে তার জাদুর ধার অনেক কমে গেছে, তবু বিন্দুমাত্র ছাড় দেবেন না তিনি।

পশ্চিম বাংলার সীমান্ত দিয়ে ঢুকতে হবে বাংলাদেশে। তার কাছে কোন পাসপোর্ট নেই, কোনদিন এর প্রয়োজনীয়তাবোধ করেননি। এখনো লাগবে না। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে সীমান্ত রেখা পার হয়ে বাংলাদেশে ঢোকা ঠেকাতে পারবে না।

মনসুরকে তাড়া দিলেন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আজকে রাতের মতো আশ্রয় খুঁজতে হবে। আগামীকালই হয়তো বাংলাদেশে ঢুকতে হবে।

অধ্যায় ৩৫

একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে বৃদ্ধের সাথে এসেছে সালাম। কোন এলাকায় এসেছে কোন ধারনা নেই তার। সরু কিছু গলি, গলির দুইপাশে ঘন হয়ে উঠা ঘরবাড়ি। প্রথমে গেটের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। বাড়িওয়ালা একজন অল্পবয়স্ক মানুষ। তবু বেশ সময় নিয়ে হেলে-দুলে গেট খুলে দিলো। বৃদ্ধকে দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। সবচেয়ে বড় কথা বাড়িওয়ালা তার দিকে খুব বিরক্ত চোখে তাকাচ্ছে।

'আমি তো ভাবছি আপনে আসবেন না,' বাড়িওয়ালা বলল।

'কথা কম বলো, মনজুর,' বৃদ্ধ বললেন। 'আমি রুমে যাচ্ছি, রাতের খাবার কিছু থাকলে পাঠিয়ে দিও।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল মনজুর। সালামের দিকে তাকিয়ে মুখ বেঁকিয়ে হাসল একটু।

বৃদ্ধের পেছন পেছনে হেঁটে তিনতলায় উঠে এলো সালাম। দরজায় তালা ঝুলছে। বৃদ্ধ তার পায়জামার পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করলেন, অনেক খুঁজে সঠিক চাবিটা বের করতেই অনেক সময় চলে গেল। এখানে দাঁড়িয়ে প্রথমবারের মতো দারুন এক অস্বস্তিবোধ করছিল সালাম। মনে হচ্ছিল, এই জায়গাটা তার চেনা।

দরজা খুলে গেল কিছুক্ষনের মধ্যে। সালাম দেখল বেশ বড়সড় একটা ড্রইং রুম। সেই রুমের একপাশে বড় একটা খাট পাতা। ঠিক জানালার পাশেই। রুমে তেমন কোন আসবাবপত্র নেই। বেশ কিছু চেয়ার আছে। একটা চেয়ারে বসলেন বৃদ্ধ। সালামকে অন্য একটা চেয়ারে বসার জন্য ইশারা করলেন। ঘরের বাতি জ্বলছে। সেই আলোয় ঘরটা একঝলক দেখে নিচ্ছিল সালাম। দেয়ালে কোন ক্যালেন্ডার ঝুলছে না। কোথাও কোন ঘড়ি বা ছবি তুলছে না দেয়ালে। ঘরটা মোটেও সাজানো গোছানো না। একপাশে ছোট একটা কাঠের আলমিরা। সেখানে অল্প কিছু কাপড় ঝুলছে।

'এই ঘরেই ঘুমাতে হবে,' বৃদ্ধ বললেন, 'মেঝেতে শুতে পারবে না?'

সালাম মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিল।

বৃদ্ধ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারি করছেন রুমের মধ্যে। কিছুটা অস্থিরভাবে। অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই দরজায় টোকা শোনা গেল। বৃদ্ধ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন। বাড়িওয়ালা মনজুর দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বড় একটা ট্রে। সেখানে বেশ কিছু প্লেটে ভাত-তরকারি দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যার পর থেকে তেমন কিছু পেটে পড়েনি। খাবারগুলো দেখে খিদেটা নিজের উপস্থিতি জানান দিল।

একটা টেবিলের ওপর ট্রে-টা রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেল মনজুর। ওর ভাবেসাবে মনে হচ্ছিল এই রুম থেকে যতো দ্রুত বেরুতে পারবে ততই তার মঙ্গল। বৃদ্ধের ইশারায় চেয়ার টেনে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সালাম।

'নিয়ে খাও। তোমার পছন্দের সব আছে।' বৃদ্ধ বললেন।

সালাম প্লেট টেনে নিয়ে ভাত, ডিম, মুরগীর মাংস দিয়ে খাওয়া শুরু করল। রান্না দারুন হয়েছে। অনেকদিন পর বেশ তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে খাওয়া শেষ হয়ে গেল সালামের। হাত ধোঁয়ার জন্য আশপাশে তাকাচ্ছিল। বৃদ্ধ রুমের সাথে লাগোয়া বাথরুমের দিকে ইশারা করলেন। সালাম বাথরুমে ঢুকল। বেশ বড় বাথরুম। বেসিনের কল ছেড়ে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে দেখতে হাত ধুচ্ছিল সে। এ কয়দিনেই বেশ শুকিয়ে গেছে। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। ঐখান থেকে পালিয়ে আসার পর এই প্রথম একটু আরাম করে খাওয়া। দু'একদিন বিশ্রাম নিলেই হবে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রুমে ঢুকেই সালাম কিছুটা অবাক হলো। বৃদ্ধ লোকটা নেই। বাইরে গেছে সম্ভবত, ভাবল সে। আগে যে চেয়ারটায় বসেছিল, সেখানেই বসল। বৃদ্ধ কিছু খাননি, এই রাতে অচেনা একজন মানুষকে নিজের বাসায় রেখে বৃদ্ধের বাইরে যাওয়ার মানে বুঝল না।

ড্রইং রুম থেকে ডানদিকে একটা সরু প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার সেই প্যাসেজের দু'পাশে দুটো রুম। ওখানে কে থাকে! যতোদূর বোঝা যাচ্ছে বৃদ্ধ এই বাড়িতে একা থাকেন না, তার সঙ্গি কেউ আছে। যে হয়তো এখন বাইরে কোথাও আছে।

এখানে হঠাৎ করে চলে আসাটা ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে, মনে মনে ভাবল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে এই বাড়ি ছাড়তে হবে। বৃদ্ধ মানুষটাকে কেন

জানি সেরকম পছন্দ হচ্ছে না। কেন জানি মনে হচ্ছে বৃদ্ধ কিছু একটা লুকাচ্ছে।

চেয়ারে বসল সালাম। হঠাৎ করেই গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা রাতের কথা মনে পড়ল। সেদিন কি যেন হয়েছিল তার। আবছা আবছা কিছু দৃশ্য চোখে ভাসছে। দুজন মানুষের আর্তনাদ। চেহারাগুলো পরিচিত। একজন নজরুল, আরেকজন জামাল। ওদের দুজনের রক্তাক্ত চেহারাগুলো পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে। এতো শক্তিশালী যুবক দুজন পুরুষ মানুষকে কিভাবে শেষ করে দিয়েছিল সে! এতো শক্তি তার গায়ে কিভাবে এলো!

এমনকি ভোর বেলা মামা আব্দুর রউফের দিকেও সে তেড়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ঐ লোকটার টুটি ছিঁড়ে ফেলতে। কিন্তু ঐ সময় এক হুজুরের কারনে সব ভেস্তে গেল।

সেদিনের পর এরকম বোধ করেনি এখনো। কি অদ্ভুত এক হিংস্রতা, ক্ষিপ্রতা আর পাশবিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সেদিন। আজ অনেকদিন পর নিজের ভেতর সেই একই রকম অচেনা একটা বোধ জেগে উঠছে বুঝতে পারল সালাম। এই ফ্ল্যাটটায় সে এমনি এমনি আসেনি। নিয়তি তাকে টেনে এনেছে এখানে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রুমগুলোর মধ্যে বিশেষ একটা ঘর থেকে কেউ তাকে ডাকছে। অতি মৃদু, বাতাসের মতো, কানের পাশে কেউ একজন ফিসফিস করে ডাকছে। বলছে দরজা খুলে, শেকল খুলে তাকে মুক্তি দিতে। তাকে মুক্তি দিলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।

মন্ত্রতাড়িত মানুষের মতো ছোট করিডোরে পা রাখল সালাম। কিন্তু এগুতে পারল না। মনে হচ্ছে কেউ যেন তার পা দুটো শক্ত করে ধরে রেখেছে। নীচের দিকে তাকিয়ে অবাক হলো। এমন অদ্ভুত দৃশ্য সে জীবনে দেখেনি, কোনদিন দেখবেও না।

প্রায় দশ হাত লম্বা, কালো-বাদামী চাকাচাকা দাগওয়ালা এক অজগর তার দুই পা পেঁচিয়ে ধরেছে। ঢাকা শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে এরকম একটা সাপ কোত্থেকে এলো? কখন এলো? সাপটা ধীরে ধীরে পেঁচাতে শুরু করেছে।

অনেক দিন পর সেই অদ্ভুত হিংস্রতা, ক্ষিপ্রতা আর পাশবিকতা ভর করল সালামের ওপর।

অধ্যায় ৩৬

'তোমাকে এখানে এভাবে আশা করিনি,' মুরশেদ মিয়া বললেন।

যে লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওর নাম ডঃ আরেফিন। সামসুদ্দিনের ছেলে। ডঃ আরেফিনের চোখে-মুখে কোন জড়তা নেই। বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনারও নিশ্চয়ই এখানে থাকার কথা নয়!' ডঃ আরেফিন বললেন।

'তুমি কি আমাকে অনুসরণ করছো?'

'আপনাকে অনুসরণ করতে হয়, কারন আপনি নিজ থেকে কিছু বলেন না, কোন কিছু নিয়ে জানতে হলে আপনার পিছু নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'তুমি এখন যাও, আমাকে বিরক্ত করো না।'

'আমি যাচ্ছি না,' ডঃ আরেফিন বললেন, 'আমার কিছু জিনিস জানা দরকার।'

'আমি এখন কোন প্রশ্নোত্তর খেলার অবস্থায় নেই,' মুরশেদ মিয়া বললেন, তিনি খুবই বিরক্ত হয়েছেন এটা তার চোখে-মুখে প্রকাশ পাচ্ছে এখন।

'আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি।'

মুরশেদ মিয়া একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তাকে শ্রান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। লোকটার জন্য মায়া হলো ডঃ আরেফিনের। এতো বয়স্ক একজন মানুষ দারুন সব ঝামেলা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'আচ্ছা, বলো। তারপর বিদায় হও।'

'প্রথম প্রশ্ন, আপনার হাতের ঐ বাক্সটা কিসের? ওর কাজ কী?'

'আমি জানি না।'

'আমি বলি?'

'জানোই যেহেতু, তাহলে প্রশ্ন করছো কেন?'

'আপনার মুখ থেকে শুনতে ভালো লাগতো,' ডঃ আরেফিন বললেন, 'তাহলে আমিই বলি। মন দিয়ে শুনবেন।'

'তুমি আমার সময় নষ্ট করছো।'

'ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন,' ডঃ আরেফিন বললেন, 'এই বাক্সটার অতীত খুব রহস্যময়। সম্ভবত দুই হাজার বছর আগে এক জাদুকরের হাতে এর সৃষ্টি। যাকে বলা হতো 'মৃত্যুর মহান জাদুকর'। খ্রিস্টের জন্মের আগেই জেরুজালেমে তাকে দেখা গিয়েছিল। এরপর তার দেখা পাওয়া যায় আরো পাঁচশো বছর পর। ইউরোপে মধ্যযুগে প্লেগে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়, তখনও তার উপস্থিতির প্রমান পাওয়া গেছে। এখন, এই দুইহাজার সালের পরও কিছু লোক এই মহান জাদুকরকে আবার জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছে। তবে ওরা সম্ভবত জানে না, এই বাক্সটা কতো গুরুত্বপূর্ণ তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য।'

'তুমি এসব তথ্য কোথায় পেয়েছো? আমি এই বাক্স কোথায় পেয়েছি কোন ধারনা আছে তোমার?'

'আপনি এটা পেয়েছেন তিব্বতে। বাবার লেখা নোটবুকে সব লেখা। কিন্তু উনি এমনভাবে লিখে গিয়েছিলেন যে খালি চোখে সে লেখা পড়া যায় না। তার জন্য আমাকে বিশেষ পদ্ধতি বের করতে হয়েছে। কিন্তু তিব্বতে এই বাক্স গেল কী করে?'

'সেটা আমার জানা নেই। আমাকে পরিস্কার করে কিছু বলেনি।'

'আপনি এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনার এক শিষ্যের কাছে রেখেছিলেন কেন?'

'আমি অনেক ঝুঁকির মধ্যে থাকি। তাই ভেবেছিলাম শংকরের কাছে থাক। ওর মতো বিশ্বস্ত আর কেউ নেই।'

'শংকরের কী হয়েছে?'

'ও মারা গেছে।'

'কিভাবে?'

'সেটা তোমার না জানলেও হবে।'

ডঃ আরেফিন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। দেখলেন মুরশেদ মিয়া চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

'কি হলো?'

'আমাকে এক্ষুণি বাসায় যেতে হবে।'

'আমার সাথে গাড়ি আছে।'

মুরশেদ মিয়ার ইচ্ছে না থাকলেও তিনি রাজি হলেন। তিনি টের পাচ্ছেন খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। অচেনা কারো অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাসায়। অদ্ভুত, অচেনা একটা শক্তির উপস্থিতি এতো দূর থেকেও অনুভব করতে পারছেন। ডঃ আরেফিনকে সাথে নিয়ে দ্রুত নীচে নেমে এলেন। রাস্তার পাশেই ডঃ আরেফিনের গাড়ি পার্ক করা ছিল। দ্রুত উঠে পড়লেন গাড়িতে।

ডঃ আরেফিন বুঝতে পারছেন পরিস্থিতি গুরুতর। মুরশেদ মিয়ার চেহারায় অজানা অভিব্যক্তি। বোঝাই যাচ্ছে কোন কিছু নিয়ে দারুন অস্বস্তিতে আছেন। কালো বাক্সটা একটা ব্যাগে করে জড়িয়ে ধরে আছেন মুরশেদ মিয়া। রাস্তায় তেমন লোক নেই। এক্সিলেটর চাপলেন ডঃ আরেফিন। ঠিকানা জানা আছে। যেতে বেশি সময় লাগবে না।

অধ্যায় ৩৭

প্রায় অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে সালাম। চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে। হাত-পা শক্ত করে ঘাড় বাঁকিয়ে তৈরি, আক্রমন করার জন্য। একটু আগেই পায়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরা অজগর সাপটাকে পা থেকে ছাড়িয়েছে। আরেকটু দেরি হলেই পা'দুটো ভেঙে ফেলতো। সাপটাকে পা থেকে ছাড়িয়েই ছুঁড়ে দিয়েছে বিছানার দিকে। কিন্তু এরপর থেকেই প্রাণীটাকে আর চোখ পড়ছে না। এতো বড় একটা জিনিস এরকম হঠাৎ করেই নেই হয়ে যেতে পারেনা। সে প্রস্তুত আচমকা আঘাতের জন্য। বড় করে নিশ্বাস নিচ্ছে। পরনের শার্টটা খুলে ফেলেছে। পুরো শরীর ঘেমে গেছে।

বিছানার পাশের জানালাটা খোলা। ঐ জানালা দিয়ে কী বেরিয়ে গেল সাপটা? প্রাণীটাকে ছুঁড়ে ফেলা ভুল হয়েছে। ওটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা দরকার ছিল।

ডান দিক থেকে একটা শব্দ এলো। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল সালাম। অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। মনে হচ্ছে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রাণী ঘোরাঘুরি করছে ঘরের ভেতরে, অথচ কিছুই চোখে পড়ছে না।

করিডোর ধরে এগুল এবার। ডানদিকের প্রথম ঘরটার সামনে দাঁড়াল। এর ভেতর থেকেই কেউ তাকে ডাকছে। ফিসফিস করে ডাকছে। ডাকটায় কেমন একটা অনুনয়, বুকের মধ্যে ধকধক করছে সালামের। দরজায় বিশাল একটা তালা ঝুলছে। চাবি ঢোকানোর গর্তটা ছোট একটা লোহার পাত দিয়ে ঢাকা। চাবি নেই। এক হাতে শক্ত করে তালাটা ধরল। বুঝতে পারলো তালাটা থেকে অসংখ্য সুক্ষ সুঁই ঢুকে যাচ্ছে তার হাতের তালুতে। বিষাক্ত একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কয়েকশ সাপ একসাথে দংশন করেছে তাকে। দাঁতে দাঁত চেপে রইল, তালাটা হাতের মুঠোর মধ্যেই রাখল সালাম। প্রচণ্ড যন্ত্রনা হচ্ছে শরীরে। কিন্তু সহ্য করছে। চোখ বুঁজে, দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত করে চেপে ধরে আছে তালাটা। আরো কিছুক্ষণ এভাবে শক্ত করে ধরে রাখতেই তালাটা গুড়োগুড়ো হয়ে গেল তার হাতের মুঠোয়।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার একটা ঘর। ভেতরে ঢোকামাত্র সরসর করে কিছু একটা সরে গেল ডানদিকে। চোখ বড় করে ঘরটা দেখে নিলো। চোখে পড়ল সাথে সাথে। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল সালাম। শুকনো কালো ছায়ার মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালের সাথে প্রায় মিশে আছে। সালামের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো ছায়াটা। এক পা পিছিয়ে এলো সালাম। ছায়াটার মধ্যে আক্রমণের কোন ছাপ নেই, বরং তার সামনে এসে থেমে গেল হঠাৎ করে। লক্ষ্য করে দেখল সালাম, ছায়াটা এর বেশি এগুতে পারবে না। কিছু একটায় আটকে আছে।

'আমি জানতাম তুমি আসবে,' ফিসফিস করে বলল ছায়াটা। 'আমি জানতাম তুমি আসবে।'

সালামের কাছে মনে হলো এই ছায়াটা তার শত্রু নয়। কিন্তু কে? দারুন দ্বিধাদ্বন্ধ নিয়ে এগুলো সালাম। কালো ছায়াটা হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে। অনেকটা নিজেকে নিবেদনের ভঙ্গিতে।

'আপনি কে?'

'আমি তোমার সেবক।'

'কিসের সেবক? আমি কে?'

'তোমার জন্যই এতো আয়োজন, আমার এতো যন্ত্রণা।'

'আপনি এভাবে আটকে আছেন কেন?'

'ঐ হারামী আমাকে আটকে রেখেছে?'

'কে?'

'মুরশেদ আর তার দলবল।'

'মুরশেদ কে?'

'তুমি কিছুই জানো না। তোমার শত্রুকে তুমি চেনো না,' চাপা গলায় বলল ছায়াটা। 'আমাকে মুক্ত করো।'

'কিভাবে মুক্ত করতে হয়?'

'আমার পায়ে যে শেকল আছে, শেকল খুলে দাও।'

সালামের এখন আর ভয় লাগছে না। সে শেকল খুলে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ছায়াটা হিসহিসিয়ে উঠল। দরজার দিকে তাকাল সালাম। কালো কুচকুচে একটা বাঘ দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যেও বাঘটার চোখ দুটো জ্বলছে।

'ঐ যে, বিজয় চলে আসছে,' ছায়াটা হিসহিসিয়ে বলল।

সালাম ঘুরে দাঁড়াল। খালি হাতে একটা বাঘকে মোকাবেলা করা যায় কিনা জানে না, কিন্তু তার মন এখন ভয়শুন্য। নিজের মধ্যে বিকৃত এক পাশবিকতা অনুভব করল সে। কালো বাঘটা এক পা এক পা করে এগুচ্ছে। সালামও একটু একটু করে প্রস্তুত হচ্ছে। কালো বাঘটার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আচমকা লাফ দিলো কালো বাঘটা। উড়ন্ত অবস্থায় থাবা চালাল সালামের গলা লক্ষ্য করে। কিন্তু ওটা জানে না সালামের হাতে এখন প্রচণ্ড শক্তি। উড়ন্ত অবস্থায় বাঘটার মাথা লক্ষ্য করে ডানহাতটা মুগুরের মতো চালাল সালাম। থাবাটা বাতাসেই রয়ে গেল, প্রচণ্ড শব্দে দেয়ালের সাথে আঘাত খেল বাঘের মাথাটা। সেখানে আটকে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে নিস্প্রাণ দেহটা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

'তোমাকে সামলাতে পারবে এমন শক্তি নেই,' ছায়াটা বলল, 'আমাকে মুক্তি দাও।'

সালাম আবার এগিয়ে গেল। তবে দ্বিতীয়বারের মতো থমকে দাঁড়াল। দরজায় অন্য কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

অধ্যায় ৩৮

এই রাতেও ঢাকায় বেশ ট্রাফিক জ্যাম। ফার্মগেটের কাছাকাছি এসে ডঃ আরেফিন দেখলেন, মুরশেদ মিয়া চোখ বুজে বসে আছেন। ঠোঁটদুটো নড়ছে। সম্ভবত কোন তন্ত্রমন্ত্র যপ করছেন বুড়ো মানুষটা, ধারনা করলেন। এখান থেকে আর বেশি সময় লাগবে না।

এই মুহূর্তে তার একটা লক্ষ্য, মুরশেদ মিয়ার কোলের ওপর থাকা বাক্সটা। বয়স্ক মানুষটার সাথে বাবার একসময় খুব গভীর সম্পর্ক ছিল। এছাড়া তিনি নিজে কারো কাছ থেকে জোর করে কিছু কেড়ে নিতে চান না। বাক্সটা সম্পর্কে যতোটুকু জেনেছেন বাবার নোটবুক পড়ে, তাতে মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত ঠিক হাতেই আছে জিনিসটা। তিনি নিজেও এটা রক্ষা করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

যে শত্রুরা এর পেছনে লেগেছে, তারা ভয়ংকর একটা দল। অন্তত বাবার নোটবুক পড়ে তাই মনে হয়েছে। যেসমস্ত রেফারেন্স সেই নোটবুকে দেয়া হয়েছে, সেগুলো কতকটা ঘেঁটে দেখেছেন ডঃ আরেফিন। রেফারেন্সগুলোর কোন উল্লেখ সাধারন বইগুলোতে নেই। কিংবা আসলে সেই ব্যাপারগুলো সাধারন মানুষের অগোচরে ঘটেছে বলে সেগুলো লিপিবদ্ধ নয়। নইলে 'মৃত্যুর মহান জাদুকর'-এর মতো বড় একটা ব্যাপার বইগুলোতে থাকতো কিংবা পৃথিবী জুড়ে যে কন্সপিরেসি থিওরিগুলো চালু আছে সেখানে উল্লেখ থাকতো। জাদুকর শব্দটাকে ইতিহাসে খুব হেলাফেলার সাথে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সামসুদ্দিন আরেফিনের নোটবুক পড়ে তিনি জানেন, সত্যিকারের জাদুকর ছিল এবং আছে। তারা মোটেও হেলাফেলার কিছু নন এবং সামনের পৃথিবীর ভবিষ্যত হয়তো এদের হাতেই নির্ভর করছে।

নিজের খেয়ালেই ছিলেন বলে লক্ষ্য করেননি। সিগন্যাল ছেড়ে দিয়েছে। গাড়িগুলো চলতে শুরু করেছে। মুরশেদ মিয়া আচমকাই চোখ খুলে তাকালেন, তারপর চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন ব্যস্ত

রাস্তায়। রাজপথ ধরে একজন বৃদ্ধ মানুষ দৌড়াচ্ছে প্রানপন, দৃশ্যটা খুব ভয়াবহ। ডঃ আরেফিন কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। গাড়ি চলতে থাকল। মুরশেদ মিয়ার রাস্তা পার হওয়া দেখে বুঝলেন নিজেকে আর সংযত করতে পারেননি বৃদ্ধ। রাস্তা পার হয়ে বাঁ দিকের গলি দিয়ে ঢুকলে সহজেই ঐ বাড়িতে পৌছে যাবেন। ঢাকার যানজট পার হয়ে গাড়িতে করে পৌছানোর মতো বিলাসিতা করার মতো সময় হাতে নেই।

এক্সেলেটরে চাপ বাড়ালেন ডঃ আরেফিন। ঐ বাড়িতে কী এমন হচ্ছে যে মুরশেদ মিয়া এভাবে চলন্ত গাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন! দ্রুত সেখানে পৌঁছাতে হবে।

অধ্যায় ৩৯

হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন। এই লোকটার নাম মনজুর। বাড়িওয়ালা। পিস্তলটা ঠিক তার বুক বরাবর তাক করেছে মনজুর। আঙুল ট্রিগারে। যেকোন সময় চাপ দেবে।

সালাম লাফ দিয়ে বা দিকে সরে গেল। মনজুর ট্রিগারে চাপ দিল সাথে সাথে। আগুনের ছটা দেখা দিল পিস্তলের মাথায়। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বুঝতে পেরে আবার গুলি চালাল। এবারও দ্রুতগতিতে সরে গেল সালাম। আরেকবার ট্রিগারে চাপ দেয়ার আগেই মনজুরের সামনে পৌঁছে গেল। ডান হাতে ওর পিস্তল ধরা হাতটা শক্ত করে ধরল। যন্ত্রণার ছাপ দেখা গেল মনজুরের চেহারায়। মট করে হাড় ভাঙার শব্দ শোনা গেল। পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। ককিয়ে উঠল মনজুর। ওর গালে বাঁ হাতে শক্ত করে চড় বসাল সালাম। চড়ের আঘাতে ছিটকে পড়ল মনজুর। জ্ঞান হারাল সাথে সাথে।

'ওকে শেষ করে দাও,' ছায়াটা বলল।

'চুপ,' সালাম গর্জে উঠল, 'আমি কারো কথায় চলি না।'

'আমাকে মুক্ত করে দাও।'

'আপনি কে?'

'আমি একজন জাদুকর। যে তোমাকে এই পৃথিবীতে এনেছে।'

'আপনি বলতে চান আপনি আমার বাবা, জমশের?'

'তোমার কোন পিতা নেই। আমি তোমার বাবা নই। আমি একজন জাদুকর।'

'তাহলে আমি কি মানুষ নই?'

'তুমি আদি, অকৃত্রিম। নিজের স্বরূপ বোঝো। নিজের শক্তিকে বোঝো। পুরো পৃথিবীকে নিয়ে এসো তোমার হাতের মুঠোয়।'

'আমি এতো কিছু চাই না। আমি স্বাভাবিক জীবন চাই।'

'ওটাই তোমার স্বাভাবিক জীবন।'

'আমি সালাম। পুরো পৃথিবী আমার চাই না।'

'তোমার জন্য শত শত মানুষ আজ পথে নেমেছে। পৃথিবী থেকে অরাজকতা দূর করে তুমিই আবার শান্তি এনে দেবে।'

সালাম মেঝেতে বসে পড়ল। কালো বাঘের দেহটা এখন আর নেই। সেখানে সেই বৃদ্ধের প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে। যার সাথে এই বাসায় এসেছিল। কি অদ্ভুত! ঘুণাক্ষরেও বৃদ্ধকে চিনতে পারেনি, বুঝতে পারেনি তাকে শেষ করে দেয়ার জন্যই এই বাসায় নিয়ে এসেছিল। অথচ নিজেই এখন লাশ হয়ে পড়ে আছে।

ছায়াটাকে মুক্তি দেয়ার আগে একটু ভাবতে চায় সালাম। একটা ভুল সিদ্ধান্ত তার পুরো জীবনটা পাল্টে দিতে পারে।

***

মুরশেদ মিয়া দৌড়াতে গিয়ে টের পেলেন, তিনি একা দৌড়াচ্ছেন না। তাকে লক্ষ্য করে দৌড়ে আসছে আরো কিছু মানুষ। এরা কারা? দূর থেকে চেহারা না দেখতে পারলেও বুঝতে পারছেন এরা বয়সে তরুণ, ক্ষিপ্র। তিনি একা এদের সামলাতে পারবেন না। বাসা পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে এদের কেউ না কেউ তাকে ধরে ফেলবে। রাত হয়ে গেছে বলে সাধারন পথচারি এখন অনেক কম। যারা দেখছে তারা বেশ বিস্ময় নিয়ে দেখছে বুড়ো একজন মানুষের দৌড়ানো। হয়তো এই দৌড়ের গল্প তারা অনেকদিন করবে পরিচিতদের কাছে।

এক হাতে কালো বাক্সটা ধরে আছেন, অন্য হাতে লাঠিটা। বাক্সটা নিরাপদ রাখা দরকার। দৌড়াতে দৌড়াতে মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে তাকাচ্ছেন। ওরা আসছে এখনো। দূরত্ব কমছে। হাঁপ ধরে গেছে মুরশেদ মিয়ার। বাসা আর খুব দূরে নয়।

কাল অমাবস্যা। আজ রাতটা পার করতে পারলেই হয়। তারপর ঐ অস্তিত্বকে বিলীন করবেন। বাকি সব সঙ্গিদের ডাকতে হবে। সাহায্য লাগবে। একা এদের সবাইকে সামলাতে পারবেন না।

এই মুহূর্তে পেছনে দৌড়ে আসা ছেলেগুলোর হাতে ধরা পড়া যাবে না। ওরা মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো কালো বাক্সটা পেয়ে যাবে তাহলে।

বাসার সামনের রাস্তাটায় ঢুকে পড়েছেন। আর কিছুদূর গেলেই গেট। গেটের সামনে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। কুদ্দুস! পুরো রাস্তায় আর কেউ নেই।

রাগে গা জ্বলছিল মুরশেদ মিয়ার। শংকরের মতো শিষ্যকে হারিয়েছেন কুদ্দুসের কারনে। জমির ম্যাজিশিয়ানের মতো সহজ-সরল লোকটাও প্রান হারিয়েছে অকারনে। ওর খুব সাহস বেড়েছে। ওকে শায়েস্তা করা দরকার।

বাক্সটা বুকের কাছাকাছি ধরে লাঠিটা উঁচু করে এগিয়ে গেলেন তিনি। কুদ্দুসও প্রস্তুত। তিনি এগিয়ে যেতেই কুদ্দুস তার শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করল। দুই হাত দিয়ে বাতাসে যে ধাক্কাটা দিল, সেই ধাক্কায় প্রায় পড়ে গিয়েছিলেন মুরশেদ মিয়া। কোনমতে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বুলেটের শব্দ কানে এলো। শব্দটা এসেছে তার তিনতলা থেকে। পরপর দু'বার বুলেটের শব্দ এলো। তারপর আবার নীরবতা।

মনজুরের কাজ। ওকে বলা হয়েছিল কোন অবস্থাতেই যেন তিনতলায় ভেতরের দিকে না যায়! আজ নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে ওখানে!

কুদ্দুস এগিয়ে আসছে। ওর মুখে হাসি দেখতে পেলেন তিনি। একই সাথে তিনিও হাসলেন।

কারন সরু রাস্তাটা দিয়ে দ্রুতগতিতে একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। অল্প কিছুক্ষণ আগেই তিনি এই গাড়ির যাত্রী ছিলেন। গাড়িটা এসে সরাসরি আঘাত করল কুদ্দুসকে। হুমড়ি খেয়ে প্রায় দশ হাত উড়ে গিয়ে রাস্তার ওপর পড়ল কুদ্দুস। মুরশেদ মিয়া লাঠির আগা দিয়ে কুদ্দুসের মাথা চেপে ধরলেন। জ্ঞান হারিয়েছে। ওর পেছনে আর সময় নষ্ট করার মানে নেই। ওকে শায়েস্তা করা যাবে পরে।

ড্রাইভিং সীট থেকে ডঃ আরেফিন নেমে এসেছেন।

'এই বাক্সটা তোমার হেফাজতে থাক, তুমি এক্ষুনি পালাও,' মুরশেদ মিয়া কালো বাক্সটা দিতে দিতে বললেন।

'কিন্তু আপনি?'

'বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।'

'আমি আপনাকে রেখে যাবো না।'

'আর এক সেকেন্ড দেরি করবে না,' মুরশেদ মিয়া বললেন।

ডঃ আরেফিন বাক্সটা হাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন

কিছুক্ষণ। তারপর দ্রুত গাড়িতে উঠে গাড়ি ঘুরিয়ে ফেললেন। মুরশেদ মিয়ার পেছনে ধাওয়া করে আসা দলটা অল্পের জন্য গাড়ির নাগাল পেল না। তাদের মধ্যে কয়েকজন কুদ্দুসকে উঠানোর চেষ্টা করছে, কয়েকজন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

***

মুরশেদ মিয়া ধীর পায়ে ঘরে ঢুকেছেন। তারপর হেঁটে করিডোরে দাঁড়িয়ে আছেন এখন। করিডোরের বাতিটা জ্বালালেন। সেই আলোয় ডানদিকের প্রথম ঘরটার কিছু অংশ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। মনজুর একপাশে পড়ে আছে। অচেতন, মৃতও হতে পারে, ভাবলেন। বিজয় পান্ডে'র রক্তাক্ত শরীরটাও দেখা যাচ্ছে। মাথাটা থেতলে গেছে। ওর পাশেই একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটাকে দেখলেন। ছেলেটার চোখেমুখে পাশবিকভাব, চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। ছেলেটার পেছনেই ছায়ার মতো লেপ্টে আছে এই ঘরের আদি বাসিন্দা।

বাক্সটা ডঃ আরেফিনের হাতে দিয়ে তিনি এখন অনেক নির্ভার। হাতের লাঠি উঁচিয়ে ধরলেন তিনি। শান্তি চান না, তিনি চান সমাপ্তি। যে শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্য পুরো জীবনটা পার করেছেন, আজ সেই স্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গিদের একজনের মৃত শরীরটা পাশেই পড়ে আছে। আজ তার দিন। মুখোমুখি হওয়ার।

তিনি মুখোমুখি হলেন।

অধ্যায় ৪০

দুঃস্বপ্ন দেখা আর সেটার মুখোমুখি হওয়া এক কথা নয়। সালাম এই মুহূর্তে তার দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সেই একই রকম কালো আলখেল্লা পড়া একজন মানুষ, হাতে একটা লাঠি। লাঠিটার মাথায় গিল্টি করা একটা সাপের ব্যাদান করা মুখ, দুপাশে শদন্ত বেরিয়ে এসেছে।

দুঃস্বপ্নে সবসময়ই জয় হয় আলখেল্লাধারির। কিন্তু বাস্তবে সেটা হবে না। সালাম দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়াল। তার হাতে অস্ত্র বলতে কিছু নেই। কিন্তু ভয় নেই বুকে।

লোকটা বয়স্ক, মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। এক পা এক পা করে এগুচ্ছে সালামের দিকে। সতর্কভাবে। সালামও তৈরি। দুজন দুজনকে মুখোমুখি করে ঘুরছে, আস্তে আস্তে। বৃত্তাকারে।

মুরশেদ মিয়া ঘরের মাঝামাঝি চলে আসতেই পেছন দিক থেকে তাকে ধরে ফেলল কেউ। অন্ধকারে দেয়ালের সাথে প্রায় মিশে থাকা কালো ছায়াটা সরু দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে তাকে। এক ঝটকায় ওকে ছাড়িয়ে নিলেন। অল্প এতোটুকু সময়ের মধ্যেই দেখলেন সালাম নেই। অথচ একটু আগেও সামনে ছিল। তিনি চারপাশে ঘুরলেন দ্রুত। কোথাও নেই। ওপর দিকে তাকাতেই বুঝলেন সালাম ছাদে উলটো হয়ে বসে আছে। ওর হাত-পা আটকে আছে ছাদের সাথে। ওখান থেকে ঝাপ দিল তার উদ্দেশ্যে।

তিনি কোনমতে সরে গেলেন। তবে পুরোপুরি সরতে পারলেন না। তার ডান পা সালামের নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। সালাম আবার ছাদে উঠে গেছে তরতর করে। ওর দিকে লক্ষ্য রাখাটা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে, এতো দ্রুত চলাফেরা করছে।

পা থেকে রক্ত ঝরছে। টের পেলেন কিন্তু আপাতত তার পুরো মনোযোগ লড়াইয়ের দিকে। আজ অমাবস্যা নয়, তবে সিদ্ধান্ত নিলেন কালকের জন্য অপেক্ষা করার মানে হয় না। দীর্ঘদিন কালো একটা অস্তিত্বকে জিইয়ে রেখেছিলেন, জানতেন, একদিন না একদিন এই ফাঁদে পা

দিতে আসবে তার শিকার। আজ সেই শিকার এসেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কে শিকারি আর কে শিকার তার পার্থক্য করা যাচ্ছে না। সামান্য এদিক-ওদিক হলেও সব ভেস্তে যাবে।

তিনি লাঠিটাকে ঘোরাতে থাকলেন। লাঠিটার আকার অল্প অল্প করে বাড়তে থাকল। লাঠির দুই অগ্রভাগ এখন ধারাল ছুরির ফলা। সেই ফলার সামান্য ছোঁয়া লাগলেও দারুন ক্ষতি হয়ে যাবে। সিঁড়ি বেয়ে অনেকগুলো ছেলে এরমধ্যেই ফ্ল্যাটে ঢুকে গেছে। ওরা সবাই এখন করিডোরে। লাঠির কারনে এগুতে সাহস পাচ্ছে না। ওরা একবার মুরশেদ মিয়ার দিকে তাকাচ্ছে আরেকবার ছাদের ওপর উল্টো হয়ে ঘুরতে থাকা সালামের দিকে তাকাচ্ছে।

সালাম ছাদ থেকে ধীরে ধীরে একপাশ ধরে নেমে এলো। সে এখন লাঠির আওতার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া অস্তিত্বকে মুক্ত করে দেয়ার সময় এসে গেছে। এই কাজটা আরো আগেই করার দরকার ছিল।

যে শেকলে বাঁধা ছায়া শরীরটা সেটা সাধারন কেউ দেখতে পাবে না, তবে সালাম সেটা খুঁজে পেল। হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলল শেকলটা। সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল ছায়া অস্তিত্বটা।

'বলেছিলাম না, তোর সময় ঘনিয়ে এসেছে, আমি তোর হাড়-মাংস সব খাবো,' ছায়াটা এগিয়ে যেতে যেতে বলল।

মুরশেদ মিয়ার লাঠিটা ছায়া শরীরে কোন প্রভাব ফেলতে পারল না। সেটা ছায়ার শরীর ভেদ করে চলে যাচ্ছিল, যেভাবে বাতাস ভেদ করে যায় সেভাবেই। মুরশেদ মিয়া পিছু হটলেন। জমশেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন, প্রচণ্ড শাস্তি। সেই শাস্তিটা ছিল দেহহীন একটা অস্তিত্ব, ছায়ার মতো অস্তিত্বে বন্দিত্ব। তার জাদুর বাঁধনে বন্দি হয়ে সেই অস্তিত্ব দীর্ঘদিন ধরে যন্ত্রণাভোগ করেছে। এবার প্রতিশোধ নেবে।

তবে সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন মুরশেদ মিয়া। তিনি একে একে তার হাতে থাকা সমস্ত জাদুর অস্ত্র ব্যবহার করতে থাকলেন। আগুন, বরফ কিংবা ধোঁয়াতেও ছায়াটাকে কাবু করা গেল না। তিনি পিছু হটছেন আর ঐ ছেলেগুলোর কাছাকাছি হচ্ছেন। ওরাও প্রস্তুত তাকে কাবু করার জন্য।

এই অবস্থায় তাকে রক্ষা করার জন্য কেউ নেই। চোখ বুজে মনে মনে প্রার্থণা করলেন। তারপর চোখ খুললেন। বাইরে প্রচণ্ড শব্দে কোথাও

বজ্রপাত হলো। তিনি দেখলেন তিনতলার ছাদ ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গেল। একরাশ সাদা আলোয় পুরো ঘরটা ধাঁধিয়ে গেল। বিদ্যুতের একটা ঝলক এসে আঘাত করলো ছায়াটাকে। মুহূর্তেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

ভাঙা ছাদ দিয়ে বাইরের আকাশটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এরকম ভীষণ বজ্রপাতের কারন কী? তিনি ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ালেন। ভাঙা ছাদের ঠিক কিনারায় দীর্ঘ এক পুরুষমূর্তি দেখা যাচ্ছে। পরনে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবী। শ্বেতশুভ্র চুল-দাঁড়িতে পুরো মুখ ঢেকে আছে।

একপাশ থেকে দেখলেন সালাম এগিয়ে আসছে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, অনেকটা বন্য কুকুরের মতো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সালামের মাথার দু'পাশে আফ্রিকান গ্যাজেলের মতো শিং বের হয়েছে। লম্বা, বাঁকানো, ধারাল সেই শিং। এই শিং কিসের চিহ্ন তিনি জানেন। কয়েকশ বছর পর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম খুঁজে পেয়েছে 'মৃত্যুর মহান জাদুকর'। অন্যপাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে ছেলেগুলো। ওদের কয়েকজনের হাতে ধারাল ছুরি চোখে পড়ল।

দ্বিমুখী আক্রমণের মাঝখানে পড়ে মুরশেদ মিয়া চোখ বন্ধ করলেন। টের পেলেন তার দেহটা ধীরে ধীরে শুন্যে উঠে যাচ্ছে। চোখ খুলে দেখলেন ভাসতে ভাসতে তিনি উপরে উঠে যাচ্ছেন। ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে সৌম্যদর্শন এক বয়স্ক পুরুষ। নীচে সালাম তার দলবলের ওপর ভর করে ছাদের ভাঙা অংশের দিকে উঠে আসছে। যেকোন সময় তার ভাসমান দেহকে ধরে ফেলবে। কিন্তু কোন ভয় হচ্ছে না মুরশেদ মিয়ার। মনে হচ্ছে তার কোন ক্ষতি হবে না।

ছাদের ভাঙা অংশের কিনারায় পৌছে গেছেন প্রায়। নীচ থেকে প্রচণ্ড বেগে উপরে উঠে আসতে লাগল সালাম। কিন্তু আঘাত করার আগ মুহূর্তে দারুন এক বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো পুরো পৃথিবী।

মুরশেদ মিয়া টের পেলেন তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে সাদা পাঞ্জাবি পরা লোকটা। মনে হচ্ছে বিস্ফোরণের শব্দের সাথে সাথে তার দেহটা আরো অনেক উপরে কোথাও উঠে গেছে।

***

ধীরে ধীরে চারপাশটা পরিস্কার হয়ে এলো মুরশেদ মিয়ার কাছে। ভাঙা ছাদেই দাঁড়িয়ে আছেন। তবে ভাঙা অংশটা থেকে একটু দূরে। নীচ থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে না।

'আমি কোথায়?'

'আপনি আমার সাথে আছেন, চিন্তার কিছু নেই।'

কণ্ঠস্বরটা পরিচিত লাগল মুরশেদ মিয়ার কাছে। শ্বেতশুভ্র চুল-দাড়িতে ঢেকে থাকা মানুষটার চেহারাটা এখন কিছুটা দেখা যাচ্ছে। লোকটার চোখ দুটোতে প্রান নেই। সম্ভবত চোখে দেখেন না। তবে কপালের দাগটা দেখে চিনতে অসুবিধা হলো না।

'ফরিদ সালাহ উদ্দিন!'

'চেনার জন্য ধন্যবাদ।'

'ওরা কোথায়?'

'আপাতত সবগুলোকে শায়েস্তা করেছি। তবে ওরা আবার আসবে। এবার আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে।'

'তাহলে আমরা কী করবো?'

'আপনি আমার সাথে যাবেন।'

'কোথায়?'

'যেখান থেকে সব শুরু।'

ভোরের এখনো অনেক দেরি। ঢাকার রাজপথ ধরে হাঁটতে থাকলেন মুরশেদ মিয়া। সাথে ফরিদ সালাহ উদ্দিন আর তার এক সঙ্গি, নাম মনসুর আলী। দিল্লিতে ফরিদ নামের যে তরুণের সাথে পরিচয় হয়েছিল, কালের আবর্তে সে এখন বৃদ্ধ। চোখেও দেখে না। তবে বিপক্ষ শক্তির সাথে লড়াইয়ে এই অন্ধ জাদুকরই আসল ভরসা।

পরিশিষ্ট

রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত অনেকগুলো শরীর পড়ে আছে মেঝেতে। এরমধ্যে থেকে অল্প একটু নড়ে উঠল একটা শরীর। বেশ কয়েকটা শরীরের নীচ থেকে ধীরে ধীরে বের করে আনল নিজেকে। দাঁড়ানোর শক্তি নেই। দেয়াল ধরে ধরে কোনমতে নিজেকে দাঁড় করালো।

বাইরে থেকে অনেকগুলো আলো এসে পড়ছে ঘরের ভেতরে। ছাদটা অর্ধেকের বেশি ভাঙা। অনেকগুলো গাড়ির শব্দ ভেসে আসছে বাইরে থেকে, এরমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ আলাদা করে চিনতে পারল। বুঝতে পারছে বাইরের ঐ লোকগুলো এখনই ভেতরে চলে আসবে। এতোগুলো রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহের মাঝে তাকে পেলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না।

সিঁড়িতে বুটজুতোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশের হাতে ধরা দেয়া যাবে না। শরীরের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে দেয়াল বেয়ে ছাদের ভাঙা অংশের দিকে উঠতে থাকল। টের পেল যতোটা দুর্বল লেগেছিল, এখন ততোটা লাগছে না। বরং, নিজেকে অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে শক্তিশালী মনে হচ্ছে।

ছাদে ওঠেই সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে উল্টোদিকের বাড়ির উঠোনে গিয়ে পড়ল। তারপর দেয়াল বেয়ে নেমে গেল রাস্তায়। দেখল বেশ কয়েকটা পুলিশের পিক-আপ, অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়ানো। দারুন ব্যস্ততা ওদের মধ্যে।

চুপচাপ হাঁটতে থাকল সালাম। সে এখন নিজের আসল রূপ খুঁজে পেয়েছে, নিজেকে চিনতে পেরেছে। সে হচ্ছে 'মৃত্যুর মহান জাদুকর'।

'মৃত্যুর মহান জাদুকর' কখনো হারে না। আপাতত কিছুটা পিছিয়ে গেছে। কিন্তু এর দ্বিগুণ সে ফিরিয়ে দেবে। অবশ্যই দেবে।

. . .